হরর গল্প সংকলন

পিশাচ বাড়ি

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অনীশ দাস অপু



মুণ্ডুহীন প্রেত-এর মত *পিশাচ বাড়ি* ও একটি চমৎকার হরর-সংকলন। তবে এ বইতে আমি অনুবাদ-লেখা রেখেছি কম, মৌলিক রচনা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি।

আমার বিশ্বাস, তরুণ লেখকদের এ মৌলিক রচনা ভালো লাগবে পাঠকের।

বাকিগুলো বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখা হরর-গল্পের অনুবাদ। রয়েছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, রবার্ট ব্লচ, রোজমেরি টিম্পারলি, লর্ড ডানসেনি প্রমুখের দারুণ সব ভূতের গল্প। সব মিলে এটি একটি অসাধারণ হরর-সংকলন হয়েছে, পড়ার পরে স্বীকার করবেন পাঠক।

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪১৮, সেপ্টেম্বর ২০১১
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬ মোবা : ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল : ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯ ৬৬ মোবা : ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩২০.০০ টাকা

PISHACH BARI
(A Collection of Horror Stories)
by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1Ka Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email : anindya.prokash@yahoo.com

First Published February 2011

Price : Taka 320.00
US $ 12

ISBN 978 984 414 184 1

রাইসুল ভাই, তন্বী ভাবী ও রাত
চাঁদের আলো সত্যি যেন বাঁধ ভেঙেছে
সুখী এ পরিবারে

হরর গল্প সংকলন

পিশাচ বাড়ি

অনুবাদ ও সম্পাদনা : অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

'মুণ্ডুহীন প্রেত'-এর মত 'পিশাচ বাড়ি'ও একটি চমৎকার হরর সংকলন। তবে এ বইতে আমি অনুবাদ লেখা রেখেছি কম, মৌলিক রচনা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এর কারণ সংকলনটি পড়ার সময় আমি বেশ কিছু মৌলিক হরর লেখা পেয়ে যাই। পড়ার পরে ভালোও লাগল। তাই ছেপে দিলাম। আমার বিশ্বাস, তরুণ লেখকদের এ মৌলিক রচনা ভালো লাগবে পাঠকের।

এ সংকলনের দু'একটি গল্পকে ঠিক হরর গল্প বলা যাবে না। রোমাঞ্চ গল্প বলাই শ্রেয়। তবে হরর-এর খানিকটা মিশেল আছে এতে। প্রসঙ্গক্রমে আহমদ আজাদের *'মধুচন্দ্রিমা'* গল্পটির কথা উল্লেখ করতে হয়। খুবই চমৎকার একটি গল্প এটি। গল্পটি পড়ার পরে পাঠক স্বীকার করবেন আহমদ আজাদ একজন শক্তিমান লেখক। তবে আফসোস, লেখার চমৎকার একটি হাত থাকা সত্ত্বেও ইনি প্রায় লেখেনই না বলা যায়। কাজী সরোয়ার হোসেনের *'ড্রাকুলা'* পড়ার সময় মনে হবে হরর গল্প পড়ছি। যদিও এর সমাপ্তি ঘটেছে রহস্য গল্পের আদলে। তবে এটিও বেশ মজার একটি গল্প। রুমানা বৈশাখীর *'কুহক'* ও *'ফাঙ্গাস'* হরর গল্প হিসেবে বেশ ভালোভাবে উতরে গেছে। পড়ার সময় গা শিরশির করে। মোহসীন রেজা বায়রনের *'অদ্ভুত লাশ'*ও আপনাদের ভালো লাগবে বলে আশা করি। শাহেদ ইকবাল হরর গল্প যে খুব ভালো লেখেন তার প্রমাণ পাবেন *'ছায়া মানুষ'* পড়লে। ছমছম করবে গা। গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে কামরুল হাসানের *'অশুভ প্রহর'* পড়ে। এম সাইফুর রহমানের *'সপ্তম সিতিমা'* এবং তোফাজ্জল হোসেনের *'শাহেরজাদী'*ও খুব ভালো হরর গল্প। এগুলো সবই লেখকদের মৌলিক রচনা। বাকিগুলো বিশ্বখ্যাত লেখকদের লেখা হরর গল্পের অনুবাদ এবং Adaption. মিজানুর রহমান কল্লোল অনূদিত রোজমেরী টিম্পারলির *'চোখের আড়াল হলে'* একটি অসাধারণ হরর গল্প। এ গল্পের শেষটা আপনাকে চমকে দেবে। দারুণ চমক পাবেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের *'অপারেশন'* পড়েও। রবার্ট ব্লচের *'ডাইনি'* দারুণ একটি হরর গল্প। এলিয়ট ও ডোনেলের *'বন্ধ ঘরের রহস্য'* আপনাকে রোমাঞ্চিত

করবে। চমক পাবেন ডন উলফসনের *'প্রতিবিম্ব'* পড়ে। ...প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বইয়ের প্রথম গল্পটি আসলে একটি হরর উপন্যাসিকা। এর কাহিনী ধার করা হয়েছে 'Fright Time' নামে বহুল জনপ্রিয় একটি হরর সিরিজ থেকে। যদিও সিরিজটি কিশোরদের জন্য তবে আমার বিশ্বাস *'আঁধারের আতঙ্ক'* ছেলে-বুড়ো সকলের ভালো লাগবে।

সব মিলে এটি একটি অসাধারণ হরর সংকলন হয়েছে, পড়ার পরে স্বীকার করবেন পাঠক। আর আপনাদের ভালো লাগলেই আমার পরিশ্রম স্বার্থক। আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা, জানাতে আমাকে ফোন করতে পারেন।

অনীশ দাস অপু
০১৭১২৬২৪৩৩৬

সূচী

আঁধারের আতঙ্ক

কী যে ভয়ানক অন্ধকার জঙ্গলে! এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো এগোচ্ছি যাতে ডালপালায় ঠোক্কর খেতে না হয়। মাঝে মাঝে পাথরখণ্ড বা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পা বেঁধে যাওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছি।

তবে সবচেয়ে অস্বস্তির ব্যাপার হল আশপাশ থেকে ভেসে আসা ভয়-ধরানো শব্দ। গা ছমছম করে!

'ভয় পাসনে, রাকিব,' চাচাত ভাই রোহান অভয় দেয়ার চেষ্টা করে আমাকে। 'খরগোশ টরগোশ দৌড়ে পালিয়েছে। তারই শব্দ ওটা।'

উঁহুঁ, খরগোশের পায়ের শব্দ নয়। অন্যরকম আওয়াজ। গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করল কথাটা। কিন্তু বললাম, 'এখান থেকে জলদি বেরুতে হবে।'

রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। সপরিবারে এসেছিলাম পাহাড়ে পিকনিক করতে। রোহান আর আমি ঠিক করলাম পাহাড়ের ওধারে কী আছে দেখব। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুই তরুণ দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে পড়েছি সাথে সাথে। জঙ্গলে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই টের পেয়েছি পথের নিশানা গোলমাল করে ফেলেছি। ক্যাম্পে ফেরার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরে মরেছি জঙ্গলে। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি গাছের গুঁড়ির ওপর। কালকেও জঙ্গল থেকে বেরুবার রাস্তা খুঁজেছি অনেক। পাইনি। মনে হয়েছে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরছি। এখন জঙ্গলের মাঝখানে চলে এসেছি ঘুরতে ঘুরতে। ঘন জঙ্গলে সূর্যের আলো ঢোকার সুযোগ প্রায় না বলে এদিকটা রাতের মতোই কালো।

রোহানের ব্যাকপ্যাকে একটা টর্চ আর ম্যাপ আছে। কিন্তু গতকাল ঘনঘন টর্চ জ্বালানোর কারণে ওটার আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। একান্ত প্রয়োজন না হলে টর্চ জ্বালছি না। দুই দাঁতের সারির ফাঁকে টর্চ ধরে ক্ষীণ আলোয় ম্যাপটা দেখার চেষ্টা করছে রোহান। ভয় পায়নি ভান করলেও আমি জানি ও ভেতরে ভেতরে আতঙ্কে সিঁটিয়ে রয়েছে। সেইসাথে হতাশাও গ্রাস করছে আমাদের। 'ম্যাপে বলছে সবুজ দাগ দেয়া জায়গাগুলো হল জঙ্গল,' বলল রোহান। 'আর আমরা এখন সেরকম সবুজ জায়গা অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছি।'

আমি ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম। ম্যাপের সবুজ জায়গাটা যেন গলফ মাঠ। 'ম্যাপ দেখে খুব একটা লাভ হবে না।' মন্তব্য করলাম আমি।

'এই জঙ্গল থেকে বেরুবার রাস্তাটা তো অন্তত খুঁজে পেতে হবে!' চেঁচিয়ে উঠল রোহান, মুখ থেকে টর্চ খসে পড়ল পায়ের কাছে। টর্চ তুলে নিল ও। 'ম্যাপ দেখে লাভ

হবে না বুঝতে পারছিস যখন, নিজেই একটা রাস্তা খুঁজে বার কর্ না।'

সিধে হল ও। টর্চের আলো একটা গাছের ওপর পড়ল। আলোতে ভীষণভাবে জ্বলে উঠল লাল টকটকে একজোড়া চোখ।

'কী ওটা?' আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। আমার গগনবিদারী চিৎকারে লাফিয়ে উঠল রোহান, হাত থেকে পড়ে গেল টর্চ, 'কী? কী?' বলে চেঁচাতে লাগল ও। নিচু হয়ে, হাত বাড়িয়ে টর্চ খুঁজছে।

'ওই যে ওখানে,' হাত তুলে দেখালাম। 'ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু একটা। লক্ষ করছে আমাদেরকে।'

টর্চ খুঁজে পেয়েছে রোহান। আমি যেদিকে হাত বাড়িয়ে আছি, আলো ফেলল সেদিকে। ওখানে ঘন ঝোপ আর গাছের কালো কালো ডাল ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। আলোটা আবার মিটমিটে হয়ে আসছে।

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না,' টর্চে ঝাঁকি দিল রোহান যাতে আলোটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কিছু একটা ছিল ওখানে,' বললাম আমি। 'বিশ্বাস করো।'

'খরগোশ-টরগোশ হতে পারে।'

মন্তব্য করল রোহান। ও যে ভয় পেয়েছে বোঝা গেল গলার স্বরের কাঁপুনিতে।

ডানে-বামে মাথা নাড়লাম আমি। 'না, রোহান ভাইয়া। খরগোশ নয়। অন্য কিছু। বিরাট কোনো প্রাণী।

এমন সময় পেছনের ঝোপে খসখস শব্দ উঠল। লাফিয়ে উঠলাম দুজনেই। চরকির মতো ঘুরল রোহান, শব্দের উৎসমুখে টর্চের আলো ফেলল। আলো আরো ম্লান হয়ে এসেছে। শুধু কাছের গাছের গুঁড়িগুলো সামান্য আলোকিত হল ওই আলোয়। ধীরে ধীরে, বৃত্তাকারে টর্চটাকে ঘোরাল রোহান। কী যেন গাছের আড়াল থেকে স্যাঁৎ করে সরে গেল।

ওটা যা-ই হোক, আকারে বিশাল এবং ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। রোহান টর্চ মেরে দেখতে চাইল। কিন্তু তীব্রগতিতে ছুটে পালাল জিনিসটা। অন্ধকারে চোখ টানটান করে চেয়ে রইলাম আমরা।

কিছুই দেখতে পেলাম না।

'এখান থেকে চলো,' বললাম আমি।

বাম দিকে একটা মরা ডাল ভাঙল সশব্দে, লাফিয়ে উঠলাম আবার! রোহান টর্চ ঘোরাল ওদিকে। কিছু নেই। জানোয়ারটা মনে হয় আমাদের চারপাশে ঘুরছে, হামলা করার সুযোগ খুঁজছে। আমার বুকের ভেতর দমাদম পিটতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে নিভে যাবে টর্চের আলো।

আমি আর রোহান পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম যাতে পেছন থেকে কেউ লাফিয়ে পড়তে না পারে। ওভাবেই বৃত্তাকারে ঘুরলাম আমরা। দেখার চেষ্টা করছি জিনিসটা কী।

'তুমি কি সত্যি ভাবছ ওটা খরগোশ?' ফিসফিস করে বললাম।

'না,' জবাব দিল রোহান। 'খরগোশ না। ওটা কী বুঝতে পারছি না আমি। তবে প্রকাণ্ডদেহী কিছু একটা হবে।'

ঠিক তখন সামনে থেকে ভয়ংকর একটা গর্জন ভেসে এলো। অন্ধকার ফুঁড়ে ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গায়ে। কামড়ে ধরল জিন্স প্যান্টের গোড়ালি। টাল সামলাতে না পেরে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। ওটা লাফিয়ে উঠল আমার বুকে। গলায় কামড় দিতে যাচ্ছে।

দুহাতে জিনিসটাকে চেপে ধরলাম আমি। থোকা থোকা লোমের স্পর্শ পেলাম হাতে। টেনে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলাম। মনে হল ছোট ছোট হাত জাপটে ধরেছে আমার পরনের কাপড়। একজোড়া হাত ধরে আছে জিনসের গোড়ালি। তৃতীয় হাতটা টানছে আমার শার্ট। মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগলাম আমি। জিনিসটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছি। ওটা যাই হোক, খুব শক্তিশালী আর ভয়ংকর মনে হলো।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম আমি।

রোহানের ব্যাকপ্যাকের চেইন খোলার শব্দ পেলাম। কানের পাশে বাড়ি খাচ্ছে জন্তুটার ক্রুদ্ধ গর্জন আর হিসহিসানি। জন্তু নয়, মনে হল মানুষ গোঁ গোঁ করছে। আমার ঘাড়ের ওপর ওটার গরম নিশ্বাস পড়ছে। আমি ওটার একটা কান চেপে ধরলাম। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টানতে লাগলাম। জন্তুটা গুঙিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। টের পেলাম আমার জামা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলছে ওটা।

হঠাৎ জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা। রোহান ম্যাপটাকে গোল করে মুড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জ্বলন্ত ম্যাপটা আমার গায়ের ওপর দোলাতে লাগল। ক্রুদ্ধ একটা গর্জন করে উঠল জন্তুটা। আলগা করল থাবা। তারপর আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে দাঁত মুখ খিঁচাল। শেষে লাফ মেরে নেমে গেল আমার বুকের ওপর থেকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি। দেখলাম বিরাট একটা আকৃতি অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের আঁধারে।

'কী ওটা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শেয়াল।' জবাব দিল রোহান।

'শেয়াল! অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলাম আমি। 'শেয়াল অতবড় হতেই পারে না। আর শেয়াল কখনো মানুষকে হামলা করে?'

'পাগলা শেয়ালে করে,' জ্বলন্ত ম্যাপটা হাতে নিয়ে হাঁটা দিল রোহান। 'তবে অতবড় শেয়াল কোনোদিন দেখিনি আমি। চোখজোড়া জ্বলছিল ওটার। একটা থাবা ছিল না জন্তুটার। ভয়ংকর একটা প্রাণী। তুমি লক্ষ করোনি?'

'লক্ষ করার মতো অবস্থা ছিল না আমার,' বললাম আমি।

ম্যাপের অর্ধেকটা জ্বলে শেষ। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে তুলে নিল রোহান। 'এ জিনিস বেশিক্ষণ জ্বলবে না। তার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

দুই

গাছগাছালির মাঝ দিয়ে চলতে শুরু করল রোহান যেদিকে শেয়ালটা গেছে সেদিক পানে। হাতে ধরে আছে জ্বলন্ত ম্যাপ। ওটার আলোয় পথ দেখছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে গেল কাগজটা, আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিল ওটা। জ্বালল টর্চ। এদিক-ওদিক আলো ফেলল। কয়েক সেকেন্ড জ্বলার পরে নিভে গেল টর্চ।

কী ভীষণ অন্ধকার! আশপাশে কিছু দেখা যায় না। মুখ তুলে ওপরদিকে চাইলাম। মগডালের ফাঁকে কিঞ্চিৎ আকাশ। তারা ফুটেছে আকাশে। কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম সামনে। যা দেখলাম বিশ্বাস হতে চাইল না। বিশাল একটা মাঠের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এখান থেকে তার পরিপূর্ণতা নিয়ে ধরা দিল আকাশ। লাখ লাখ তারা আকাশের সীমানায় জ্বলজ্বল করছে। এত সুন্দর লাগছে! জঙ্গলের বাইরে চলে এসেছি আমরা। চারপাশে চোখ বুলালাম। মাঠটা বেশ বড়। লম্বা ঘাস আর ঝোপে বোঝাই।

'ওটা কী?' আঙুল দিয়ে দেখাল রোহান। তাকালাম ওদিকে। মাঠের দূরপ্রান্তে গাঢ় রঙের একটা অবয়ব দেখা যায়। প্রকাণ্ড কোনো, বোল্ডার? 'পাথর-টাথর হবে হয়তো' বললাম আমি, 'ওটার ওপর উঠে ঘুমানো যাবে। আরামদায়ক না হলেও নিরাপদে অন্তত থাকতে পারব।'

বুদ্ধিটা পছন্দ হল রোহানের। মাঠ ধরে হাঁটা শুরু করে দিলাম। যতই সামনে এগোচ্ছি, বোল্ডারটার চেহারা বদলে গিয়ে বাক্সের আকার ধারণ করতে লাগল। শেষে দেখলাম ওটা বোল্ডার নয়, কাঠের একটা বাড়ি।

'দারুণ!' বাড়িটা দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল রোহান। 'ওখানে এখন ফোন থাকলেই হল। চাচাকে ফোন করে বলে দেব হারিয়ে গেছি আমরা। উনি আমাদেরকে উদ্ধার করতে চলে আসবেন।'

'খাবারও জুটবে নিশ্চয়ই,' বললাম আমি। হাঁটার গতি দ্রুততর হল আমাদের।

একতলা একটা বাড়ি। সামনে বারান্দা আছে। বেশ বড়। তবে বাড়িতে কোনো আলো জ্বলছে না। হয় ওটা খালি নতুবা বাড়ির বাসিন্দারা ঘুমাচ্ছে, ভাবলাম আমি। সকাল চারটে বাজে প্রায়। এখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকার সময়।

বারান্দায় উঠে এলাম আমরা। দরজায় কড়া নাড়ল রোহান। কোনো সাড়া মিলল না। আমার দিকে তাকাল ও। 'কী আর করা' ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। এবার জোরে কড়া নাড়ল রোহান। কোনো জবাব নেই। দরজায় কান পাতলাম। ভেতরে কারো সাড়াশব্দ নেই।

হাতল ধরে মোচড় দিল রোহান। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজা।

'বাড়িতে কেউ আছেন?' হাঁক পাড়ল রোহান। ওর পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলাম আমি। টর্চ জ্বালল রোহান। ঘোলা আলোয় ছোট একটা বসার ঘর আর রান্নাঘর চোখে পড়ল। পেছনদিকে একটা দরজাও আছে। রোহান খিড়কির দরজায় কড়া নাড়ল। 'হ্যালো?' ডাকল ও। কেউ সাড়া দিল না। কবাট খুলল ও ধাক্কা মেরে। আলো ফেলল

ঘরে।

'বাড়িতে কেউ নেই,' বলল রোহান। 'তবে বড় একটা সোফা আছে এ ঘরে। এখানে ঘুমিয়ে নেয়া যাবে, কি বলো?'

খালি বাড়িতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমার। তবে এখানে ঘুমালে কারো অসুবিধে হবার কথা নয়। হয়তো এখানে কেউ থাকে না। পরিত্যক্ত বাড়ি।

রোহান সোফার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল মাথার নিচে হাত রেখে। আমি সোফার আরেক ধাপে গা এগিয়ে দিলাম। শুতে পেরে ভালো লাগছে। ক্লান্ত শরীর আর চলছিল না।

'তুমি দেখেছ ওটা শেয়াল ছিল?' রোহানকে জিজ্ঞেস করলাম। 'ভালুক বা অন্য কিছু নয়?'

হেসে উঠল রোহান। 'তোর কি ধারণা ওটা কার্টুন বই থেকে উঠে আসা কোনো তাসমানিয়ান ডেভিল?'

'বিগফুটও হতে পারে,' হাসলাম আমি।

হাসাহাসি, গল্প চলল খানিকক্ষণ। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল খিড়কির জানালা দিয়ে আসা রোদের স্পর্শে। চারপাশে চোখ বুলালাম। ঘরটার অবস্থা যাচ্ছেতাই। মেঝেতে এক হাঁটু ধুলো আর আবর্জনা। ঘরের বাসিন্দা তার বাড়ির যত্ন নেয় না বোঝা যায়। বসার ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হল। পা টিপে টিপে দরজার ধারে গেলাম। উঁকি দিলাম। এক লোক মাটির তাওয়ার ওপর হাত মেলে আগুন পোহাচ্ছে। লোকটা লম্বা, রোগা, মাথার চুল শাদা, জামার আস্তিন গুটানো। আগুনটা একটা কাঠি দিয়ে উস্কে দেয়ার সময় হাতের দড়ির মতো পাকানো পেশি কিলবিল করে উঠল।

'এই যে, চাচা,' ডাকলাম আমি।

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল সে। তাকাল আমার দিকে। চাউনি দেখে মনে হল না আমাকে দেখে অবাক হয়েছে।

'অঃ! অবশেষে ঘুম ভেঙেছে! এখন যাবার সময় হয়েছে তোমাদের,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। আবার তাওয়ার ওপর হাত মেলে দিল। ধিকি ধিকি জ্বলছে তুষের আগুন।

'আমরা কোথায় এসেছি বুঝতে পারছি না, চাচা,' বললাম আমি। 'জঙ্গলে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আপনার বাড়িতে ফোন আছে? তাহলে আমার বাবাকে ফোন করে খবর দিতে পারতাম।'

মুখ ঘোরাল সে আমার দিকে। নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'এখানে ফোন-টোন নেই, তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

'শিমুলছড়া ক্যাম্পসাইটে পিকনিক করতে এসেছিলাম। আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'ক্যাম্পসাইট এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে।'

'গাড়ি নেই আপনার? বাবা পেট্রলের খরচ দিয়ে দেবেন।'

'আমার গাড়ি নেই,' জানাল সে।

'আশপাশে কোনো ফোনের দোকান আছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হেসে উঠল লোকটা। 'জঙ্গলে ফোনের দোকান পাবে কোথায়?'

তারপর আবার আগুনে হাত সেঁকতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লোকটার আচরণে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। না বলে ঘরে ঢুকেছি বলে হয়তো রেগে গেছে।

'কাল রাতে একটা শিয়াল হামলা করেছিল আমাদের।' তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। 'আপনার ঘরের দরজা খোলা ছিল। আমরা...'

বাধা দিল লোকটা। 'শোনো, খোকা। তোমরা আমার বাড়িতে না-বলে ঢুকেছ তাতে যে আমি মোটেই খুশি হতে পারিনি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এখানে কোনো সঙ্গী চাই না আমার। দিন-তিনেকের মধ্যে একটা সাপ্লাই ট্রাক আসবে এদিকে। ওতে চড়ে তোমরা দূর হয়ে যাবে। ততদিন পর্যন্ত আমার ধারেকাছে আসবে না, আমার কাজেও নাক গলাবে না।'

পকেট থেকে দেশলাই বের করল লোকটা, কান খোঁচাতে লাগল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, ভাবছি কী বলা যায়।

'তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে,' সিধে হল লোকটা। 'যাও, রোহানকে ঘুম থেকে জাগাও। ওকে খেতে আসতে বলো।'

আমি পেছনের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। হঠাৎ কথাটা মনে পড়লঃ আমি তো লোকটাকে রোহানের নাম একবারও বলিনি। নামটা জানল কী করে সে!

তিন

বাসি রুটি আর সিদ্ধ-করা সিম খেতে দিল লোকটা আমাদেরকে। সকালের নাস্তার জন্যে আহামরি কোনো আইটেম নয়। তবে দুদিন প্রায় অনাহারে থাকার পরে এটাই খেতে অমৃতের মতো লাগল। রান্নাঘরের টেবিলে বসে নাস্তা সারলাম আমি আর রোহান। লোকটা তাওয়ার সামনে বসে খেল, একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে।

রোহান লোকটাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল চুপচাপ, তারপর ফিসফিস করল, 'কী হয়েছে ওর?'

জবাবে কাঁধ নাড়লাম শুধু।

'কেমন অদ্ভুত লাগছে না বুড়োকে? জিজ্ঞেস করল রোহান।

রোহানকে বলতে যাচ্ছিলাম লোকটা ওর নাম জানে। যদিও নাম কখনো বলিনি তাকে। কিন্তু না-বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। হয়তো মুখ ফস্কে নাম বলেও ফেলতে পারি। এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা আছে এর?

খাওয়া শেষ করে বাইরে চলে এলাম আমরা কথা বলার জন্যে। রোহান ওর ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। বারান্দা থেকে নেমে মাঠের উদ্দেশে হাঁটা দিলাম।

'বুড়োটা সন্ন্যাসী জাতীয় কিছু হবে বোধহয়,' মন্তব্য করল রোহান।

'নাকি জেল পালানো কোনো আসামি?'

'জানি না। এমন জায়গায় কোনো পলাতক আসামি আশ্রয় নেবে বলে মনে হয় না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে মাঠের মাঝামাঝি চলে এলাম আমরা। 'বেশিদূর যেয়ো না,' সাবধান করে দিলাম রোহানকে। 'বারবার পথ হারাতে চাই না।'

'লোকটার বাড়ি কেমন লাগল তোর?' প্রশ্ন করল রোহান। 'অদ্ভুত না?'

'কী রকম অদ্ভুত?'

'ঘরে কোনো খাট বা বিছানা নেই। বিছানা ছাড়া বাড়ি হয়?'

'বাড়িতে বিছানা থাকতেই হবে এমন কথা কে বলেছে তোমাকে?' বললাম আমি। 'বুড়ো হয়তো সোফায় ঘুমায়। বিছানার চেয়ে কম বড় নয় ওটা।

'তবু ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে। বাড়িটা দেখলেই গা কেমন ছমছম করে।' বলল রোহান। 'বুড়ো বলল তার নাকি কোনো প্রতিবেশী নেই। কিন্তু ওটা কী?'

রোহানের দৃষ্টি অনুসরণ করে জঙ্গলের দিকে তাকালাম আমি। বনভূমির প্রান্তে আরেকটা কুটির। তবে আকারে বুড়োর বাড়ির চেয়ে অনেক ছোট। দ্রুত পা বাড়ালাম দিকে। 'বুড়ো বোধহয় ওখানে ঘুমায়,' বললাম আমি।

কুটিরের সামনে এসে দেখি জানালাহীন একচালা একটা ঘর। কাঠের। একবার চক্কর দিলাম কুটিরটাকে ঘিরে। একটাই দরজা। রোহান দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠকঠক শব্দ করল। কোনো সাড়া নেই। ঠেলা দিতেই খুলে গেল কপাট।

'বাড়িতে কেউ আছেন?' গলার স্বর উঁচু করে জানতে চাইল রোহান। কোনো সাড়া

না পেয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

'কেউ আছে?' পেছন থেকে প্রশ্ন করি আমি।

'নাই,' জবাব দিল রোহান। 'খালি ঘর।'

রোহানের কাঁধের ওপর দিকে উঁকি দিলাম আমি। কুটিরে ঢুকে গেল ও, পেছন পেছন আমিও। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। ছাদের দু-এক জায়গায় কাঠ ভাঙা। ফোকর দিয়ে আলো আসছে। সূর্যের আলোয় চারপাশে ধুলোর পুরু আস্তরণ চোখে পড়ল। নোংরা মেঝে, আঁশটে একটা গন্ধ আসছে ঘরটা থেকে।

'এ ঘরটা কী কাজে ব্যবহার করা হয় ধারণা করতে পারিস?' জিজ্ঞেস করল রোহান, কর্কশ দেয়ালে হাত বোলাচ্ছে।

'গরু-ছাগল রাখার গোয়ালঘর হতে পারে।' বললাম আমি।

'কারাগার হওয়াও বিচিত্র নয়। বুড়ো দুষ্ট ছেলেদের ধরে নিয়ে এসে বন্দি করে রাখে এখানে।'

ব্যাকপ্যাক থেকে টর্চ বের করল রোহান। বারকয়েক হাতের তালুতে বাড়ি মারল টর্চটা দিয়ে। তারপর আলো জ্বালল। মিটমিটে আলোয় দেখলাম আমার বুকসমান উঁচু কাঠের গুঁড়িতে গভীর কাটা দাগ। দেয়ালে আলো ফেলল রোহান। গুঁড়ির ছালবাকল ছড়ে গেছে অনেক জায়গায়।'

'বুনো কোনো প্রাণীর কাণ্ড,' মন্তব্য করল রোহান। 'আঁচড়ে কামড়ে গুঁড়িগুলোর কি দশা করেছে দ্যাখো!'

গুঁড়ির কাটা দাগে থাবার চিহ্ন। 'ঠিক বলেছ,' সায় দিলাম আমি। 'প্রাণীটাকে এ ঘরে আটকে রাখা হয়। আর বন্দি থাকতে নিশ্চয়ই পছন্দ করে না সে।'

হঠাৎ বাতাসের হুংকার ভেসে এল কানে, টের পেলাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা।

'দরজা খুলে রাখ, রাকিব,' চেঁচিয়ে উঠল রোহান। 'আটকে গেলে আর বেরুতে পারব না।'

একলাফে দরজার সামনে চলে এলাম আমি। বন্ধ হবার আগেই চেপে ধরলাম কপাট। তালা আছে দরজায়। পরীক্ষা করে বুঝলাম ভেতর থেকে বন্ধ হয় এ তালা। বড় একটা কমবিনেশন লক, ঝুলছে জংধরা লোহার শেকলের সঙ্গে। রোহান দরজার বাইরে অংশটা দেখল। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। দরজাটা ভেজিয়ে রাখল ও, তালার ওপর টর্চের আলো ফেলল।

'প্রশ্ন হল, কোনো প্রাণীকে এ ঘরে আটকে রাখতে চাইলে ভেতর থেকে তালা মারতে হবে কেন?' আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল রোহান।

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন হেঁয়ালি লাগছে বাইরে যাই চলো।'

হাসল রোহান। 'হেঁয়ালি নাকি ভয় লাগছে?' দরজাটা টান মেরে বন্ধ করে দিল ও, নেভাল টর্চ। 'ভয় কিসের?'

'কেন ভয় লাগছে জানি না।' বললাম আমি। 'তবে এখানে থাকতে সায় দিচ্ছে না মন। দরজা খোলো।'

'শ্শ্শ্শ্', ঠাট্টার সুরে বলল রোহান। 'বাইরে কিসের যেন শব্দ শুনলাম।'

'ইয়ার্কি রাখো, রোহান ভাইয়া। দরজা খোলো।'

হো হো করে হাসল রোহান। অন্ধকারে ওকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছি না আমি। 'আমার মনে হচ্ছে ওখানে ভয়ানক কিছু একটা আছে। আসছে এদিকেই। ওটা আমাদেরকে দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে না।'

'ফাজলামি কোরো না রোহান ভাইয়া,' মিনতি করলাম আমি। 'দরজা খোলো।'

'ওটা এগিয়ে আসছে থাবা বাড়িয়ে। এখনই খুলে ফেলবে দরজা।' গলার স্বর বিকৃত করল রোহান। 'ওটার শিকার হবার জন্যে প্রস্তুত তো তুই?'

'রোহান ভাইয়া, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—' কপাট এক হাতে ধরে রেখেছিল রোহান, হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল দরজা। বন্যার পানির মতো সূর্যরশ্মি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। ধাঁধিয়ে গেল চোখ। ধাক্কার চোটে আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রোহান, আমি চাপা পড়লাম ওর নিচে।

'এখানে হচ্ছেটা কী?' খ্যাকখ্যাক করে উঠল একটা কণ্ঠ। দোরগোড়ায় কালো একটা মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। সেই বুড়ো। 'তোমাদেরকে বলেছিলাম নিজেদের চরকায় তেল দিতে।' চেঁচাল সে। 'ভালো চাও তো আর কখনো এখানে আসবে না।' পিছিয়ে গেল লোকটা। সূর্যের আলোতে তার মুখটা দেখতে পেলাম। লাল টকটকে। রাগে ফুঁসছে। ঘাড়ের শিরাগুলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বারবার মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে। 'এখন থেকে তোমরা আগের বাড়িতেই থাকবে।' লম্বা হাতটা উঁচিয়ে হুমকি দিল সে।

আমার বুক ধড়ফড় করছে। রোহান আমার পায়ের ওপর বসে আছে। ওর ব্যাকপ্যাক খোঁচা মারছে ঘাড়ে।

'গায়ের ওপর থেকে ওঠো,' যন্ত্রণাকাতর গলায় বললাম আমি।

'বেরোও।' বিস্ফোরণের মতো শোনাল বুড়োর কণ্ঠ। লাফ মেরে সিধে হলাম দুজনে। তারপর পড়িমড়ি করে দৌড় দিলাম দরজা লক্ষ্য করে। বুড়োকে পাশ কাটিয়ে ছুটলাম কুটিরের দিকে।

চার

সেদিন কুটির ছেড়ে আর বেরুলাম না আমরা। পেছনের ঘরেই বসে রইলাম চুপচাপ। তবে একটু পরপর উঁকি মেরে দেখেছি বুড়ো পায়চারি করছে অথবা একঠায় জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। কারো জন্য অপেক্ষা করছে?

সন্ধ্যার আগে খুব খিদে পেয়ে গেল দুজনের। সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে আর কিছু পড়েনি পেটে।

'বুড়োকে খাবারের কথা বলো না,' বললাম আমি।

'না, তুই বল্।'

'রোহান ভাইয়া, আমার খুব খিদে পেয়েছে। আর বয়সে তুমি বড়। তুমিই বলো।'

'মাত্র দুমাসের বড়। তাতে কিছু এসে যায় না।' বলল রোহান। 'লোকটা মনে হয় তোকে বেশি পছন্দ করে। বলেছে সে আমাকে। তোর ব্যবহারে সন্তুষ্ট সে।'

'ওই লোক কাউকে পছন্দ করতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না।' বললাম আমি। 'ঠিক আছে। এত করে বলছ যখন আমিই যাব।'

'ভেরি গুড,' আমার পিঠে চাপড়ে দিল রোহান। 'এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো কথা।'

দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। বুড়ো টেবিলে বসে আছে। চায়ের কাপ হাতে। কাপের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি। ধীরপায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম টেবিলের পাশে। বুড়ো মুখ তুলে চাইল না পর্যন্ত। হয়তো লক্ষ্যই করেনি আমাকে কিংবা দেখেও না-দেখার ভান করছে। গলাখাঁকারি দিলাম। ঝট করে মুখ তুলল সে। এমনভাবে তাকাল যেন আমাকে চেনেই না। তারপর গরগর করে উঠল। 'অঃ তুমি!'

'চাচা,' বললাম আমি, 'আমাদের খিদে পেয়েছে। আপনি যদি কিছু—'

হাত তুলে থামতে ইশারা করল লোকটা আমাকে। তাকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত লাগছে। আলোতে, এত কাছ থেকে বুড়োকে লক্ষ করিনি এর আগে। দেখলাম চোখের নিচে গাঢ় কালির রেখা আর মণির পাশের শাদা অংশ টকটকে লাল।

'আলমারিতে কিছু আছে কি না দ্যাখো,' বলল সে। 'দেরাজে কতগুলো কৌটা পাবে। খুলে দ্যাখো কী আছে।'

আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোকটার দিকে পেছন ফিরতে কেমন ভয়-ভয় লাগছিল। আলমারিতে বেশ কতগুলো কৌটা। তাতে শুঁটকি, চাল, ডাল, মরিচ, লবণ ইত্যাদি রাখা। আমি চাল আর ডালের দুটো কৌটা নামালাম দেরাজ থেকে।

'খাওয়া যাবে?' কৌটা উঁচু করে দেখালাম।

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল বুড়ো, তারপর মাথা দোলাল।

স্টোভে এনামেলের কড়াই চাপালাম। খিচুড়ি রাঁধব। খিচুড়ি রান্না করা খুব সোজা। চাল-ডাল ধুয়ে একসাথে কড়াইতে চাপিয়ে দিলেই হল। রান্নার আয়োজন করছি, লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'আপনাকে কী নামে ডাকব?' কড়াইতে চাল-ডাল ধুয়ে চাপিয়ে দিলাম।

'আমাকে কোনো নামে ডাকতে হবে না,' রাগী গলায় বলল বুড়ো।

'দুঃখিত,' বললাম আমি। 'আমরা পথ ভুলে এখানে এসে পড়ায় আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করুন, এখানে থাকার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই। রাস্তার হদিশ পেলেই চলে যাব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো। চোখ ফেরাল চায়ের কাপে। 'লোকে আমাকে গাঙ্গুয়া বলে ডাকত। তবে বহুদিন এ নামে কেউ ডাকে না আমাকে।'

'এখানে কবে থেকে আছেন?'

কটমট করে তাকাল বুড়ো আমার দিকে। তারপর সিধে হল। চালের কৌটাটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলাম। প্রয়োজন পড়লে ব্যবহার করব।

'এখানে কদ্দিন আছি তা জেনে তোমার কোনো লাভ নেই,' বলল সে। 'যত কম জানবে ততই তোমাদের জন্য মঙ্গল।' বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বুড়ো।

চাল-ডাল ফুটে গেছে। তেল, লবণ আর মরিচ দিলাম। একটু পর বেশ সুগন্ধ বেরুতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম হয়ে এসেছে রান্না। ভাগাভাগি করে খিচুড়ি খেলাম দুজনে।

'বুড়োর আচরণ মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার।' খেতে খেতে বললাম আমি।

'কেমন রহস্যজনক। আর ভীতিকর।'

'লোকটাকে তোর পলাতক আসামি বলে মনে হচ্ছে, তাই না?' বলল রোহান।

'হওয়া বিচিত্র নয়। ফাঁসির আসামি। জেল ভেঙে বান্দরবানের এই গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।'

'কিংবা লোকটা পাগল বৈজ্ঞানিক,' বলল রোহান। 'গোপন কোনো গবেষণা করছে—' বলে হেসে ফেলল রোহান।

তবে হাসিটা মুহূর্তে মুছে গেল দড়াম করে দরজা খুলে যেতে। লাফিয়ে উঠলাম আমরা। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে গাঙ্গুয়া। 'খুব মজা হচ্ছে, না?'

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'বেশ। বেশ। মজায় থাকাই ভালো। যাকগে শোনো। আমি বেরুচ্ছি। কাল সকালের আগে ফিরব না। আর আমি যাবার পরে দরজা বন্ধ করে দেবে।'

বুড়ো পা বাড়াল বাইরে। লক্ষ করলাম লণ্ঠন জাতীয় কিছু নিল না সে সঙ্গে। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। রাতের আঁধারে পথ চলবে কী করে? কয়েক মুহূর্ত পরে আবার দরজা খুলে উঁকি দিল গাঙ্গুয়া। 'খবরদার দরজা খুলবে না। যা-ই দেখো বা শব্দ শোনো, ভুলেও দরজা খুলবে না। ছিটকিনি লাগিয়ে বসে থাকবে ভেতরে। বোঝা গেছে?'

আমরা মাথা ঝাঁকালাম। কিন্তু বুড়োর বলার ভঙ্গিটা মোটেই পছন্দ হল না। তার কণ্ঠে এমন অশুভ কিছু একটা ছিল যে শিরশির করে উঠল গা।

পাঁচ

বুড়ো চলে যাবার পরপরই যেন ঝপ করে নেমে এল আঁধার। সামনের ঘরে লণ্ঠন জ্বেলে দিলাম। পেছনের ঘরে আরেকটা লণ্ঠন পেয়ে জ্বালালাম ওটাও। ঘর যতটা আলোকিত রাখা যায়! দরজা বা জানালার ধারে কাছেও গেলাম না কেউ। শীত লাগছিল। তাওয়ায় আগুন জ্বেলে বসলাম আরাম করে। কাঠের বাড়ি বাতাসের ধাক্কায় মাঝে মাঝে আর্তনাদ ছাড়ছিল। আর ভয়ে লাফিয়ে উঠছিলাম আমরা। শেষে আমি বললাম, 'আসলে বেহুদা ভয় পাচ্ছি আমরা। অদ্ভুত বুড়োকে অশুভ কিছু ভেবে এভাবে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকার কোনো মানে নেই। বাইরে এমন কিছু নেই যে আমাদের আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হবে।'

'ঠিক বলেছিস,' সায় দিল রোহান। 'বুড়োকে ভয় পাবার কিছু নেই।'

এসব কথা বলছি আসলে মনের ভয় তাড়ানোর জন্যে, দুজনেই তা ভালো করে জানি। যদিও ভয়ের চোটে আমাদের অবস্থা কেরোসিন। ভয় পাইনি দেখাতে উঠে দাঁড়ালাম আমি। হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিলাম ঘরের ভেতর। তারপর জিজ্ঞেস করলাম রোহানকে, 'গাঙ্গুয়া রাতে কী করতে বেরিয়েছে, বল্ তো?'

'নেকড়ের মতো চাঁদের দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়তে,' খেঁকিয়ে উঠল রোহান।

'এতই জানার শখ জানালা খুলে দ্যাখ্ না।'

রোহান আগুনের সামনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে। ও যে ভয়ে কাবু হয়ে গেছে তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। তবে ওর চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলাম আমি। 'আচ্ছা, দেখছি,' বলে এগিয়ে গেলাম জানালার ধারে।

জানালাটা বেশ উঁচুতে। চেয়ার নিয়ে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে কালিগোলা অন্ধকার। জানালার কাচে আমার প্রতিবিম্ব। কিন্তু আমার চেহারা অমন লাগছে কেন? চোখজোড়া লাল আর জ্বলজ্বল করছে। ওটা কি সত্যি আমি?

আঁতকে উঠলাম ভীষণভাবে। চেয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলাম ভুলেই গেছিলাম। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলাম ডিগবাজি খেয়ে,প্রথমে একটা বইয়ের আলমারিতে, তারপর ছোট একটা টেবিল উল্টে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়লাম মেঝেতে। দড়াম করে শব্দ হতেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রোহান।

আমি জবাব দিলাম না। চিৎ হয়ে পড়ে আছি। তবে দৃষ্টি জানালায়। স্যাঁৎ করে ওখানে থেকে সরে গেল শিংঅলা একটা মুখ। হরিণ! কিন্তু এখানে হরিণ আসবে কোত্থেকে?

রোহান আমার হতে ধলে টেনে তুলল। বারবার জানতে চাইল কী হয়েছে আমি কিছু বললাম না। বান্দরবানের জঙ্গলে শিংঅলা হরিণ আছে বলে শুনিনি। রোহানকে বললেও বিশ্বাস করবে না। বুক ধড়ফড় করছে। জ্বলন্ত চোখজোড়ার কথা ভুলতে পারছি না। কার চোখ ছিল ওগুলো?

ছয়

ধাতস্থ হতে সময় লাগল। একটু সুস্থির হয়ে বইয়ের আলমারি আর টেবিল যেখানে যেটা ছিল, ঠিকঠাক করে রাখলাম। বই-টই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। ওগুলো তুলে রাখতে গিয়ে একটা অ্যালবাম চোখে পড়ল। অনেক পুরনো ফটো অ্যালবাম। পৃষ্ঠা ছেঁড়া। ভেতরে অল্প কয়েকটা শাদা-কালো ছবি। হলুদ হয়ে এসেছে। গাঙ্গুয়ার ছবি। হাতে রাইফেল। আরেকটা ছবিতে মৃত ভল্লুকসহ দেখা যাচ্ছে বুড়োকে। তবে ছবিগুলো তার তরুণ বয়সের। আরো কয়েকটি ছবি দেখলাম। সবগুলোই শিকারের।

'বুড়োর এখানে বাস করার কারণ এতক্ষণে খুঁজে পাওয়া গেল', বলল রোহান, 'লোকটা আসলে শিকারি। আর শিকার করার জন্যে জঙ্গলই হচ্ছে প্রকৃত জায়গা।'

'কিন্তু লোকটা শিকারি হলে তার কাছে রাইফেল নেই কেন?' ব্যাখ্যা চাইলাম আমি। বাড়িতে কোনো অস্ত্রও তো চোখে পড়ল না।'

'বুড়োর রাইফেল নেই কেন তা বলতে পারব না,' বলল রোহান। 'হয়তো অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। হয়তো আজ সে শিকারেই বেরিয়েছে।'

একটা ছবিতে কিশোর গাঙ্গুয়াকে দেখাগেল আদিবাসী কয়েকটা ছেলের সঙ্গে মৃত কতগুলো খরগোশ নিয়ে বসে আছে। আরেক ছবিতে একটা মরা বনবেড়ালের থাবা উঁচিয়ে দেখাচ্ছে গাঙ্গুয়া।

একটা ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রোহান। ছবিটার দিকে তাকিয়ে ঘাড়ের ছোট ছোট চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। গাঙ্গুয়া একটা শেয়াল ঝুলিয়ে রেখেছে হাতে। শেয়ালটার একটা থাবা নেই।

'আমাকে যে শেয়ালটা হামলা করেছিল তারও একটা পা ছিল না,' বলার সময় গলা কেঁপে গেল আমার।

'এ দিয়ে তুই কী বোঝাতে চাইছিস?' জিজ্ঞেস করল রোহান। 'বলতে চাইছিস মৃত শেয়ালটি জ্যান্ত হয়ে তোর ওপর হামলা করেছিল? যত্তোসব উদ্ভট চিন্তা। তোকে যে শেয়ালটা আক্রমণ করেছিল সেটা এটার চেয়ে বড়। আর এ ছবিটা কমপক্ষে ত্রিশ বছর আগের। ব্যাপারটা কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া কিছু নয়।'

'হতে পারে,' বললাম আমি। 'তবে গাঙ্গুয়া সম্পর্কে একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। আমরা যখন প্রথম এখানে এলাম সে তোমার নামটা বলেছিল আমাকে—অথচ তোমার নাম আমি তাকে বলিনি।'

'মানে?'

'বুড়ো বলেছিল 'রোহানকে জাগাও গে,' 'আমি তোমার নাম বলিনি। কিন্তু সে নামটা জানল কী করে?'

একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল রোহান, তারপর বলল, 'তুই হয়তো বুড়োকে আমার নাম বলেছিস। এখন মনে করতে পারছিস না।'

'বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছি আমি,' বললাম আমি। 'আমি নিশ্চিত তোমার নাম বলিনি। তোমার নাম জানার তার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে জানল কী করে?'

আমি যা ভাবছি শুনলে রোহান হাসবে। আমাকে পাগল ঠাওরাবে। তবু আমাকে বলতেই হবে। বললাম, 'হেসো না। তবে আমি একটা কথা ভাবছি। যে শেয়ালটা আমাকে হামলা করেছিল সে হয়তো তোমার নাম শুনেছে।'

রোহান চোখ গোল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল। 'তোর মাথার স্ক্রু ঠিক আছে তো, রাকিব? তুই বলতে চাইছিস শেয়ালটা এসে বুড়োর কানে কানে আমার নাম বলে গেছে? হাঃ হাঃ হাঃ। আর বুড়োও শেয়ালের ভাষা বোঝে? হোঃ হোঃ হোঃ।

আমার খুব রাগ হল। রোহানকে তো চিনি। এ ব্যাপারটা নিয়ে সারাজীবন খেপিয়ে মারবে আমাকে। মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'শেয়ালটা নিজেই যদি গাঙ্গুয়া হয়ে থাকে?'

হাসি থেমে রোহানের। চোখজোড়া দশ টাকা দামের রসগোল্লার মতো করে বলল, 'শেয়ালটা! গাঙ্গুয়া? এসব চিন্তা কোত্থেকে আসে মাথায়? কমিকস পড়ে পড়ে মাথাটা গেছে দেখছি।'

'ইয়ার্কি রাখো।' দাবড়ে উঠলাম আমি। 'সিরিয়াসভাবে ব্যাপারটাকে নিয়ে ভাবো একবার। গাঙ্গুয়া রাতের বেলা বাড়ির বাইরে যায় কেন?'

'কেন যায় জানি না।' চেচিঁয়ে উঠল রোহান। 'তবে সে নিশ্চিত মায়ানেকড়ে জাতীয় কিছু নয়।'

'বুড়োর বিছানা নেই কেন?' তর্ক করলাম আমি। 'তার কি রাতে ঘুমাবার প্রয়োজন নেই? তাছাড়া শিকারি হলে তার বন্দুক নেই কেন?'

'তা আমি কী করে জনব?' বলল রোহান। 'তুই জানলে বল্ না।'

'বেশ। বলছি,' বললাম আমি। 'ধরো, গাঙ্গুয়া যেসব প্রাণী শিকার করেছে তার জন্যে যদি সে অভিশপ্ত হয়ে পড়ে?'

'অভিশপ্ত?'

'হ্যাঁ,' বলে চললাম আমি। 'এমন কি হতে পারে না অভিশাপের কারণে রাতের বেলা গাঙ্গুয়ার রুপান্তার ঘটে পশুতে ? সেইসব পশু, যাদেরকে সে হত্যা করেছে? হয়তো এ অভিশাপের মাধ্যমে পশুরা তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে?'

'তার মানে ওই শেয়ালটা ছিল গাঙ্গুয়া নিজে?' ঠাট্টার সুরে বলল রোহান। 'আসলে হরর ছবি দেখে দেখে সত্যি তোর মাথাটা গেছে।'

'তোমার কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব মনে হতে পারে,' গম্ভীর গলায় বললাম আমি। 'তবে পৃথিবীতে ব্যাখ্যার অতীত অনেক ঘটনাই ঘটে। আর

আমার বারবার মনে হচ্ছে গাঙ্গুয়া মানুষ নয়। ভয়ানক কিছু একটা আছে ওর মধ্যে—আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চুপ হয়ে রইল রোহান কয়েকমুহূর্ত। তারপর বলল, 'তুই যা ভাবছিস তা যদি সত্যি হয় তাহলে ওটা হরর ছবিকেও হার মানাবে।'

মাটির তাওয়া খুঁচিয়ে নিয়ে আবার আগুন পোহাতে বসল ও। হাতের লোহার শিক দিয়ে খুঁচিয়ে দিতে লাগল আগুন। আমি ফটোগুলো গুছিয়ে অ্যালবামে রেখে দিলাম। বসলাম রোহানের পেছনে, একটা চেয়ারে। রোহান আগুনের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে খিকখিক করে হাসছে। বোঝাই যায় আমার কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমার মন বলছিল ভয়ংকর, অশুভ কিছু একটা আছে গাঙ্গুয়ার মধ্যে। এমন কিছু একটা, যা আমাদের জন্যে ভবিষ্যতে ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। জেগে দেখি চেয়ারেই বসে আছি। সামনের দরজার তালায় শব্দ হল। তাওয়ার সামনে বসে ঘুমাচ্ছে রোহান। আগুন নিভে গেছে অনেক আগেই।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল গাঙ্গুয়া। শ্রান্ত লাগছে তাকে। কিছুই বলল না সে, একবার খালি বুকশেলফ আর ছোট টেবিলের ওপর চোখ বুলাল। ও দুটোর ওপর কাল রাতে ডিগবাজি খেয়ে পড়েছিলাম আমি। অবশ্য সাজিয়ে রেখেছি জায়গা মতোই।

'রাতটা কেমন কাটল?' ভাব জমানোর গলায় জানতে চাইলাম আমি। ঘোঁতঘোঁত করে কী যেন বলল বুড়ো, বুঝতে পারলাম না। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

দিনের বেশির ভাগ সময় সামনের বারান্দায়, একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল গাঙ্গুয়া। জানালা দিয়ে লোকটাকে লক্ষ করে চললাম আমরা। ঘুমের মধ্যে মাঝে মধ্যে মাছি তাড়াচ্ছে।

বাড়িতে করার কিছু নেই। তাই গল্প করেই কাটিয়ে দিলাম অলস সময়। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল জঙ্গলে আটকা পড়ে আছি। বাবা-মা নিশ্চয়ই পাগলের মতো খুঁজছে আমাদেরকে। ওদেরকে বলে আসিনি জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছি। খোদা জানে আর কোনোদিন ওদের সঙ্গে দেখা হবে কি না।

গাঙ্গুয়াকে নিয়েই আলোচনা বেশিরভাগ। গাঙ্গুয়া সম্পর্কে যেসব কথা রোহানকে বলেছি আমি, সেগুলো মানতে তো রাজিই নয়, উল্টো ঠাট্টা করছে আমাকে নিয়ে।

'আচ্ছা,' বললাম আমি, 'যদি আমি গাঙ্গুয়াকে নিয়ে আজগুবি চিন্তা করেই থাকি তাহলে তুমিই বলো সারারাত জঙ্গলে সে কী করে?'

'জানি না আমি,' সরল স্বীকারোক্তি রোহানের। 'তবে বাইরে হাজারটা কাজ থাকতে পারে তার। হয়তো নিশাচর সে। রাতে জঙ্গল ঘুরে দেখে। কিংবা নির্জনতা ভালোবাসে বলে অন্য কোথাও গিয়ে লেখালেখি করে। শিকারিরা ভালো লেখক হয়, জানিসই তো।'

রোহনের যুক্তি একদিক থেকে ঠিকই আছে। রাতের বেলাও মানুষের কত কী কাজ থাকতে পারে।

একটা মাছি ভনভন করে উড়েছিল মাথার ওপর, ওটাকে খপ করে ধরার চেষ্টা করলাম।

'সাবধান', বলল রোহান।

'কেন?'

'মাছিটাকে মারিস না যেন। তাহলে মৃত মাছির অভিশাপ পড়বে তোর ওপর। হাঃ হাঃ হাঃ।'

মাছি মারলে তুই শেষে মাছি হয়ে যাবি। তখন তোকে গাঙ্গুয়া ফড়িং তাড়া করবে খেয়ে ফেলার জন্যে। হিঃ হিঃ হিঃ!' শরীর দুলিয়ে খুব হাসতে লাগল রোহান।

দুপুরের লাঞ্চ সারলাম বুড়োর আলমারিতে রাখা শুকনো গরুর মাংসের ঝোল রেঁধে। খেতে খেতে রোহান বলল, 'আমাদের এখন কী করা উচিত বল্ তো?'

'কী?'

'লোকটা কী করে জানতে চাইলে ওর পিছু নেয়া উচিত।'

'কিন্তু আমাদের তো বাইরে যাওয়া নিষেধ', বললাম আমি।

'লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ব', বুদ্ধি বাতলাল রোহান। 'আর বুড়ো ফিরে আসার আগে আগেই চলে আসব। ও জানতেই পারবে না।'

রোহানের বুদ্ধি মন্দ নয়। কিন্তু আমার কেমন ভয়-ভয় লাগল। রাতের বেলা এই ঘর ছেড়ে জঙ্গলে বেরুবার কথা ভাবলেই বুক শুকিয়ে আসে।

'আমরা অন্ধকারে পথ চলব কী করে? টর্চও তো নেই।' বললাম আমি।

রোহান পকেট থেকে একটা মোমবাতি আর দেশলাই বের করল। 'এ দিয়ে কাজ চালাব। রান্না ঘরে পেয়েছি।'

'কিন্তু আবার যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি', দ্বিধা যাচ্ছে না আমার।

'আরে', বলল রোহান। 'আমরা জঙ্গলে ঢুকব না তো। মাঠে যাব। পথ হারাব কীভাবে?'

সূর্য অস্ত যাবার ঘণ্টাখানেক আগে ঘুম ভাঙল বুড়োর। একা একা খাবার খেল। আমাদেরর সঙ্গে কথা বলল না। আমরাও ওকে এড়িয়ে চললাম। খাওয়া শেষে খানিক পায়চারি করল সে। অসন্তোষভরে কী যেন বিড়বিড় করছে। সন্ধ্যা হবার পরপর আমাদের ঘরে ঢুকল বুড়ো।

'এখানেই থাকো', দরজা বন্ধ করতে করতে বলল সে। 'আর কোনো ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করবে না।'

দরজায় ছিটকিনি লাগাল না সে। এমনি ভেজিয়ে রাখল কপাট। মাঠের দিকে চলেছে গাঙ্গুয়া। লোকটা অন্ধকারে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যেতে আমরা দরজা খুললাম। তাড়াতাড়ি চলে এলাম সামনের বারান্দায়। তারপর দূর থেকে ওকে অনুসরণ করার জন্যে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

আমরা ঝোপঝাড়ের আড়াল ধরে চলেছি যাতে গাঙ্গুয়া পেছন ফিরলেও দেখে না ফেলে।

'বুড়ো বোধহয় ওই পুরনো কুঁড়েতে যাচ্ছে,' মন্তব্য করলাম আমি। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রোহান।

কুঁড়েটা মাঠের শেষপ্রান্তে। তারপর জঙ্গল। গাঙ্গুয়া একবার জঙ্গলে ঢুকলে ওকে হারিয়ে ফেলব আমরা। আর ওই গহিন জঙ্গলে ওর পিছু নেয়ার কোনো খায়েশ আমার নেই।

গাঙ্গুয়া কুঁড়ের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি আর রোহান একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে ওর কাণ্ড দেখছি। ভেতরে ঢুকে গেল বুড়ো। অনেকক্ষণ গেল, বেরুল না।

'ব্যাপার কী?' ফিসফিস করল রোহান, 'বুড়ো ভেতরে কী করছে? চলো তো

দেখি।'

আমার বুক ঢিবঢিব করছে। তবু বললাম, 'চলো।'

আকাশ একচিলতে চাঁদ উঠেছে। তাতে নিঃসীম আঁধার দূর হয়েছে সামান্যই। আমরা টিপে টিপে একচালাটার পেছন দিকে চলে এলাম। বুড়ো দরজা খোলা রাখলেও এখান থেকে দেখতে পাবে না আমাদেরকে।

'বুড়ো ভেতরে কী করছে বলো তো?' ফিসফিস করলাম আমি।

খিকখিক হাসল রোহান। 'বোধ হয় ছবি ডেভেলপ করছে।'

নিঃশব্দে হাসলাম আমি, 'হয়তো অন্ধকারে কানামাছি খেলছে।'

এবার রোহানের ঠাট্টা করার পালা। 'হয়তো–'

ওর কথা শেষ হল না, ঘর থেকে ভয়ংকর একটা গর্জন ভেসে এল। লাফিয়ে উঠলাম আমরা।

'কিসের শব্দ!' ভয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে রোহানের।

আবার পিলে চমকানো হুঙ্কার, কিছু একটা বাড়ি খেল কুঁড়ের দেয়ালে।

'ওই ঘরে যে প্রাণীটা বন্দি থাকে ওটাই গর্জন করছে বোধহয়', কাঁপা গলায় বলল রোহান। 'বুড়ো জানোয়ারটাকে ছেড়ে দিয়েছে। নিজেও ফাঁদে আটকা পড়েছে।' আমি কিছু বলার আগেই রোহান দৌড় দিল কুঁড়ের দরজা লক্ষ করে। আমি ওর পিছু নিলাম। রোহান দরজা খোলার চেষ্টা করর।

'করছ কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি।

'বুড়োকে বের করে নিয়ে আসব', কপাট ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে রোহান। 'জানোয়ারটা ওকে ছিঁড়ে খাবে।'

'কিন্তু যদি–' একটা সন্দেহের কথা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলাম। নাহ্, তা কী করে হয়।

একছুটে জঙ্গলে ঢুকল রোহান। ফিরে এল গদার মতো একটা গাছের ডাল নিয়ে।

'দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে', বলল ও।

'কিন্তু ভেতরে ঢুকে কী করবে?' ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে আমার শরীরে। 'জন্তুটা যদি তোমাকে আক্রমণ করে বসে?'

'করুক। কিন্তু বুড়োকে এভাবে মরতে দিতে পারি না।' বলে মোটা ডালটা দিয়ে দরজার ওপর বাড়ি মারতে লাগল রোহান। ভেতর থেকে মরণঘাতী আর্তনাদ করে উঠল কে যেন, তারপ আছড়ে পড়ল দরজায়।

'জন্তুটা বেরিয়ে আসতে চাইছে', বলল রোহান। 'দরজা খুলে দিলেই ওটা চলে যাবে। তখন গাঙ্গুয়াক উদ্ধার করব আমরা।'

রোহান দরজার কবজার মধ্যে ডাল ঢুকিয়ে প্রচণ্ড চাড় দিল। জংধরা কবজা খুলে এল কপাট থেকে। দরজার ওপাশের অংশ কাত হয়ে গেল বাইরের দিকে। ঠিক তখন ভেতর থেকে দড়াম শব্দে কিছু একটা আছড়ে পড়ল কপাটের গায়ে। মনে হল দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওটা। এবার নিচের কবজা ছুটিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রোহান। কপাট আলগা হয়ে গেছে বলে কবজা এবং ফ্রেম থেকে ছিটকে গেল

কপাট। শুধু ভেতরের শেকলের গায়ে ঝুলে রইল কোনোমতে। আমরা লাফিয়ে সরে গেলাম। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ তুলে ঘর থেকে যে জন্তুটা বেরিয়ে এল তা একটা শাদা বাঘ। শাদা বাঘ আমি টিভিতে দেখেছি শুধু। ইংরেজিতে বলে আলবিনো। খুবই দুর্লভ জাতির জানোয়ার। সীতেশ বাবু নামে এক শিকারির ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় এ বাঘ আছে বলে পত্রিকায় পড়েছি। এই প্রথম সামনাসামনি দেখলাম। বাঘটা কী বিশাল! বিকট গর্জন ছেড়ে আমাদের কয়েক হাত দূরে এসে দাঁড়াল। শূন্যে খাড়া করে রেখেছে লেজ, টকটকে লাল চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। শরীরটা গুটিয়ে আনছে বাঘ, ঝাঁপ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। আমি ঝড়ের বেগে কুঁড়ের ভেতর ঢুকে পড়লাম, রোহান দরজাটা টান মেরে ফ্রেমে আটকে ফেলল। ঠিক তখন বাঘটা লাফ মারল দরজা লক্ষ করে। ধাক্কার চোটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রোহান। কাঠের গায়ে বাঘের থাবা আঁচড়ানোর শব্দ পেলাম। কিছুতেই বাঘটাকে ভেতরে ঢুকতে দেব না। রোহানও আমার সঙ্গী হল। ও-ও সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরে রাখল দরজা।

‘গাছের ডালটা’, গুঙিয়ে উঠল রোহান, ‘তোর পায়ের কাছে পড়ে আছে ডালটা। ওটা দিয়ে দরজা বন্ধ কর্।’

আমি পিঠ দিয়ে চেপে ধরে রেখেছি দরজা। ফলে উবু হতে কষ্ট হল না। ঝুঁকে, পায়ের কাছ থেকে তুলে নিলাম গাছের ডাল। তারপর দরজার আড়ায় একটা প্রান্ত ঢুকিয়ে অন্যধারটা ভেজা মাটিতে গেড়ে ফেললাম। এখন বাইরে থেকে সজোরে ধাক্কা এলেও দরজা খুলে যাবার ভয় নেই। সাবধানে দরজার কাছ থেকে সরে এলাম। বাঘটা পাগলের মতো দরজা খামচাচ্ছে, থাবা মারছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছে না।

ঘরের ভেতরে দারুণ অন্ধকার। কিছুই ঠাহর হচ্ছে না চোখে। হঠাৎ ফস করে শব্দ হল। রোহান দেশলাই জ্বালিয়ে। আলোতে ওর চেহারা দেখা গেল। জ্বলন্ত কাঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল রোহান। ‘তুই ঠিক আছিস তো?’ জিজ্ঞেস করল ও। জবাবে মাথা ঝাঁকালাম। আর তখুনি নিভে গেল দেশলাই।

কয়েক সেকেন্ড পরে আরেকটা কাঠি জ্বালল রোহান, তারপর জ্বেলে দিল মোমবাতি। মোমের ম্লান আলোয় ঘর সামান্যই আলোকিত হল। রোহান চোখ বড় বড় করে বলল, ‘আরে, গাঙ্গুয়া কই?’

আমি চট করে পাশে একবার চোখ বুলালাম। আমরা ছাড়া অন্য কেউই নেই এ ঘরে।

আট

সারারাত বাঘ চক্কর দিল কুঁড়েটাকে ঘিরে। ভেতরে ঢোকার রাস্তা খুঁজল। মাঝে মাঝে ঝাঁকি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল দরজা। বাঘটা থাবা বসাচ্ছে কপাটে। কিন্তু গাছের ডালটা ঠ্যাঙা হিসেবে ভালোভাবেই রক্ষা করছে দরজা।

বাঘটা কখনো বা নখ দিয়ে আঁচড় দিল কাঠে, ককনো আবার লাফিয়ে ইঠল ছাদে। ছাদ থেকে ধুলো খসে পড়ল আমাদের ওপর।

ঘণ্টাখানেক পরে নিভে গেল মোমবাতি। নিরন্দ্র আঁধারে ডুবে গেলাম আমরা। 'গাঙ্গুয়া এখানে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই,' বলল রোহান। 'তবে কোনো ফাঁকে সটকে পড়েছে। ভেগেছে জঙ্গলে।'

'না', বললাম আমি। 'সে এখানেই ছিল।'

'এসে থাকলে কোথায় গেল? তুই নিশ্চয়ই বলবি না গাঙ্গুয়া শাদা বাঘ হয়ে গেছে।' বাঘটা আবার লাফ মেরে উঠেছে ছাদে। কাঠে থাবা ঘষার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেলাম।

'হতেও পারে,' বললাম আমি। গাঙ্গুয়া একটা শাদা বাঘ হত্যা করেছে। সে ছবিও দেখেছ অ্যালবামে।'

'শোন্, রাকিব। মানুষ চাইলেই পশুতে রূপান্তর ঘটাতে পারে না।'

'তুমি কী করে জানো?'

'পারে না তাই জানি', বলল রোহান। 'টিভিতে 'ম্যানিম্যাল' সিরিজটা দেখেছিস। আর ওই সিরিজ দেখেই তোর মাথায় এসব উদ্ভট চিন্তা ঢুকেছে।'

'শুধু ম্যানিম্যালেই মানুষ থেকে পশুতে রূপান্তর দেখায় না,' প্রতিবাদ করলাম আমি। 'এরকম আরো অনেক ছবি দেখেছি আমি। গল্প পড়েছি। এসব সত্যি না হলে এদের নিয়ে গল্প আর ছবি বানায় কেন লোকে?'

'সান্তা ক্লসকে নিয়েও তো অনেক গল্প লেখা হয়েছে, ছবি করেছে,' বলল রোহান, 'তাই বলে সান্তা ক্লস তো আর সত্যি নয়।'

ভোরের আলোর প্রথম রশ্মি গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে ঢুকল। ছাদের ওপর বাঘটা গরগর করে উঠল। টের পেলাম ছাদ থেকে নেমে যাচ্ছে জন্তুটা। তারপর অনেকক্ষণ ওটার কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। সকাল হয়েছে। চনমনে রোদে উদ্ভাসিত প্রকৃতি। ভাঙা ছাদের ফুটো দিয়ে বন্যার মতো সোনালি আলো ঢুকছে। ফর্সা হয়ে গেছে চারদিক।

রোহান দরজার আড়কাঠ খুলে ফেলল। ভেতরের দিকে হেলে গেল কপাট। রোহান হাত দিয়ে ধরে রাখল ওটা। উঁকি দিল বাইরে। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা এপাশে দাঁড়া করিয়ে রাখল। বেরিয়ে এল বাইরে, উজ্জ্বল সূর্যালোকে। আকাশটা ঝকঝকে নীল। তীব্র আলোয় ঝলসে গেল চোখ। চোখ হাত চাপা দিলাম। আলোটা চোখ সয়ে আসতে তাকালাম চারপাশে। নেই বাঘটা। চলে গেছে।

'চল্, রাকিব,' বলল রোহান, 'গাঙ্গুয়া আসার আগে ওর বাড়িতে ফিরতে হবে, তাহলে সে বুঝতে পারবে না আমরা বাইরে গিয়েছিলাম।' বলে মাঠ ধরে ছুটল

রোহান। গাঙ্গুয়া ঠিকই জানে আমরা বাইরে গিয়েছিলাম, মনে মনে বললাম আমি। কিন্তু রোহানকে একথা বলে লাভ হবে না। আমি ওর পেছন পেছন দৌড়ালাম।

বুড়োর ঘর যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম তেমনটিই আছে। গাঙ্গুয়া ফেরেনি রাতে। অনেকক্ষণ বসে থাকলাম তার জন্যে। বুড়োর ফেরার কোনো লক্ষণ না দেখে নাস্তা সেরে নিলাম। আমরা দুজনেই ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। নাস্তা খেয়ে খানিক গড়িয়ে নিলাম। ঘুম থেকে ওঠার পরেও দেখি ফেলেনি গাঙ্গুয়া। এবার বুড়োর জন্য চিন্তায় পড়ে গেল রোহান।

'বাঘটা গাঙ্গুয়াকে খেয়ে ফেলেনি তো?' উদ্বেগ ওর কণ্ঠে।

'উদ্ধার করতে গিয়ে বুড়োমানুষটাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিইনি তো আবার?'

'বাঘ গাঙ্গুয়ার উপর হামলা চালায়নি সে-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি',বললাম আমি।

'লোকটার খোঁজ নেয়া দরকার', বলল রোহান। 'কোথায়ও আহত হয়ে পড়েটড়ে আছে কিনা!' সামনের দরজায় হেঁটে গেল ও, তাকাল মাঠের দিকে। কিন্তু বাইরে বেরুনোটাও ঝুঁকিপূর্ণ। বাঘটা আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। তবু...' মাথা চুলকাল রোহান, কী করবে সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। শেষে বলল, 'নাহ্, বাঘের ভয়ে ঘরে বন্দি হয়ে থাকা উচিত হচ্ছে না। বুড়োমানুষটার খোঁজ নেয়া দরকার।'

রোহানের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না জানি। তাই কিছু বললাম না। দুপুর নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম বুড়োর সন্ধানে। কাঠের কুঁড়েঘরের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। বিশাল মাঠ পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে গেল। রোহানই ওকে প্রথম দেখতে পেল।

একটা ঝোপের নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছে গাঙ্গুয়া। স্থির। সারা গায়ে কাদা, গাছের ছাল-বাকল, পাতা ইত্যাদি।

'বাঘটা নির্ঘাত হামলা করেছে বুড়োর ওপর', রোহান গাঙ্গুয়ার পাশে বসল হাঁটু গেড়ে।

'কিন্তু আহত হবার কোনো চিহ্ন তো দেখছি না', বললাম আমি। 'গায়ে রক্তের দাগ নেই।' বুড়োর গা ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। যেন হামাগুড়ি দিয়ে এসেছে ঝোপঝাড়ের মাঝদিয়ে।

গাঙ্গুয়াকে ধরে ঝাঁকি দিলাম। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। বুঝতে পারলাম না। চোখ বুজে আছে। ওকে ধরে খাড়া করলাম, হাত তুলে দিলাম আমাদের কাঁধে। তারপর প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে এগোলাম তার বাড়ির দিকে। বুড়ো বিড়বিড় করতে লাগল আর মাঝে মাঝে খক খক কাশল।

গাঙ্গুয়ার গায়ের ওজন কম। ফলে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে তেমন কষ্ট হলো না। বুড়োকে লম্বা সোফার ওপর শুইয়ে দিলাম। একটা কম্বল দিয়ে মুড়ে দিলাম গা। চা বানালাম। কিন্তু খেতে পারল না গাঙ্গুয়া। বেশিরভাগ চা পড়ে গেল কষ বেয়ে।

পেছনের ঘরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম গাঙ্গুয়াকে নিয়ে। ঘুমাচ্ছে সে এখন। সামনের ঘরে চলে এলাম আমি আর রোহান। 'আচ্ছা, রোহান ভাই', রান্নাঘরের টেবিলে বসে

মরিচ-লবণ দিয়ে সেদ্ধ করা শিম খেতে খেতে বললাম আমি, 'ওই শাদা বাঘটা যদি গাঙ্গুয়া নিজে না হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ব্যাখ্যা করো বুড়োর কী হয়েছে। সে কী করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল?'

'জানি না', জবাব দিল রোহান। 'হয়তো বুড়ো ওই কুঁড়ের ধারেকাছেও যায়নি।'

'গিয়েছে', চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'তুমি নিজে ওকে ঘরে ঢুকতে দেখেছ।'

'আস্তে!' চাপা গলায় ধমক দিল রোহান। চট করে দরজার দিকে তাকাল একবার। ঘুমাচ্ছে বুড়ো। নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার। 'আমরা কিন্তু অনেক দূর থেকে গাঙ্গুয়াকে দেখেছিলাম,' মৃদুকণ্ঠে বলল রোহান।, 'মনে হয়েছে সে ঘরে ঢুকছে। হয়তো পেছন দিক থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে।'

'উঁহুঁ', তোমার কথা মানতে পারলাম না। আমরা অনেক কাছ থেকে দেখেছি গাঙ্গুয়াকে। মোটেই অনেক দূর থেকে নয়।'

'কিন্তু তোর আজগুবি ব্যাখ্যাও আমি মেনে নিতে পারছি না। গাঙ্গুয়া বাঘ হয়ে যায়নি।'

'তাহলে বাঘটা কি হাওয়া থেকে এল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হয়তো বাঘটা আগেই ঢুকেছে', একমুহূর্ত ভেবে বলল রোহান। 'দেয়ালে ওটার থাবার দাগ দেখেছি আমরা। পরিত্যক্ত কুঁড়েটা শাদা বাঘের আস্তানা হওয়া বিচিত্র নয়। এজন্যেই গাঙ্গুয়া ওদিকে আমাদের বাড়াতে নিষেধ করেছে।'

'তোমার ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হচ্ছে না, রোহান ভাইয়া। বাদ দাও।'

'কিন্তু তুই যে ব্যাখ্যা দিতে চাইছিস তা এককথায় অসম্ভব।' রেগে গেল রোহান।

এ নিয়ে আর তর্ক করতে মন চাইল না। দরজা খুললাম আমি। তাকালাম আকাশের দিকে। কী সুন্দর নির্মেঘ আকাশ! কয়েকটা চিল উড়ছে শূন্যে। প্রকাণ্ড মাঠটা ধুধু করছে লম্বা ঘাসের ঝোপ আর আগাছার ঝাড় নিয়ে। ঝলমলে সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে সবুজ ঘাস। দেখে মনটা ভরে গেল। অথচ আঁধার ঘনালেই কেমন ভৌতিক হয়ে ওঠে চারপাশ। মনে পড়ল ছোটবেলায় ছায়া দেখলেই ভয় পেতাম আমি। জানালার পর্দায় গাছের ডালের আন্দোলিত ছায়াকে দেখলেই মনে হতো ভূতুড়ে হাত, নখ বাগিয়ে ধরতে আসছে আমাকে।

রোহান ঠিকই বলেছে আমার মনটা বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ। আঁধারকে ভয় পাই বলে খালি উল্টোপাল্টা চিন্তা করি। অন্ধকার আসলে যে-কোনো জিনিসকে ভীতিকর করে তুলতে পারে। রাতের বেলা গাছের ছায়াকে মনে হয় ভূত, বুড়োমানুষকে মনে হয় দানব। গাঙ্গুয়ার মতো নিঃসঙ্গ লোককে ভাবি পিশাচ। নাহ্, এসব উদ্ভট চিন্তা আর করব না। রোহানের কাছে আর হাসির খোরাক হতে চাই না।

নয়

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তবু ঘুম ভাঙছে না গাঙ্গুয়ার। নাক ডাকছে আরো জোরে জোরে। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছে সে।

'লোকটা মনে হয় সাংঘাতিক পরিশ্রান্ত', বলল রোহান।

'বুড়ো ঠিক আছে তো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'মনে হয় ঠিকই আছে', জবাব দিল রোহান। 'আর ঠিক না থাকলে কী করার আছে আমাদের?'

রোহান ঠিকই বলেছে। বুড়ো ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। তবে অসুখ-টসুক বাধিয়ে না বসলেই হল। তাহলে আবার উল্টো ঝামেলায় পড়ে যাব।

'বুড়োর জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করি', বলল রোহান। 'ঘুম থেকে জেগে উঠে নিশ্চয়ই খেতে চাইবে ও।'

রান্নাঘরে গেলাম আমরা। আলমারি খুঁজে কিছু নুডুলস পেলাম। নুডুলস রান্না করা খিচুড়ির চেয়েও সোজা। হাঁসের ডিমও আছে কয়েকটা। নুডলস রান্না হয়ে এলে তার মধ্যে ডিম ফেটিয়ে ছেড়ে দিলেই হল।

সাঁঝের আঁধার নামল ঝপ করে। বাতি জ্বেলে দিল রোহান। জানালার দিকে তাকাতেই গা ছমছম করে উঠল কেন যেন। আর অন্ধকার হলেই আমার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা ভর করতে থাকে। নিজেকে শাসালাম। উল্টোপাল্টা চিন্তা করা যাবে না। কিন্তু রাত যত গাঢ় হচ্ছে অস্বস্তি একটা অনুভূতি ততই জেঁকে বসছে মনে। মনে হচ্ছে ভয়াবহ কোনো ঘটনা ঘটতে চলেছে শীঘ্রি।

নুডুলস চুলোয় চড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। পোড়া গন্ধ নাকে আসতে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি প্যানটা নামিয়ে ফেললাম। রোহান গন্ধ শুঁকল নুডুলসের। 'নাহ্, তেমন পোড়েনি। খাওয়া যাবে।'

পাশের ঘর থেকে গাঙ্গুয়ার নাসিকাগর্জন ভেসে এল। এত জোরে নাক ডাকে মানুষ!

'এ লোকের কোনো পড়শী নেই কেন এখন বেশ বুঝতে পারছি', বলল রোহান, 'এত জোরে নাক ডাকলে আশেপাশে কেউ থাকতে পারে!' সে এক বাটি নুডুলস নিয়ে রওনা হয়ে গেল পেছনের ঘরে।

'কী করছ?' পেছন থেকে ডাকলাম আমি।

'বুড়ো নাক ডেকে পাঁজর ভেঙে ফেলার আগেই ওকে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি', বলল রোহান। 'খাবার রেডি!' হাঁক ছাড়ল ও।

'দাঁড়াও', বাধা দিলাম আমি।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল রোহান, 'আবার সেই উদ্ভট গল্প বলতে যাস নে যেন। এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। এবার ক্ষ্যামা দে।'

পাশের ঘর থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ ভেসে এল।

'দরজা খুলো না', আকুতি করলাম আমি। 'আমার কেমন ভয় লাগছে।'

'ঠাট্টা করছিস?' হাসল রোহান। 'নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস না? ওরকম নাম ডাকতে থাকলে ছাদ ভেঙে পড়বে যে। লোকটাকে জাগাতেই হবে।'

দরজা খুলল রোহন। অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে। কয়েক সেকেন্ড পরে আমি পা বাড়ালাম ওদিকে। অজানা ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে। উঁকি দেলাম। রোহান চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে আছে সোফার দিকে। ভেতরে ঢুকলাম আমি। রোহান ঘুরল। ভয়ে মুখ শাদা হয়ে গেছে ওর, চোখ বিস্ফারিত। মুখ হাঁ। ইশারা করল সোফার দিকে। গাঙ্গুয়া শুয়ে আছে সোফায়। তার শাদা চুল কী জাদুবলে কালো হয়ে গেছে। নাক কুঁচকে যাচ্ছে। ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বড় বড় দাঁত। গোঙাচ্ছে গাঙ্গুয়া।

বালিশের ওপর মাথা দিয়ে শুয়েছে গাঙ্গুয়া।

কিন্তু কম্বলের আড়াল থেকে পা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পাজোড়া যেন লম্বা হতে শুরু করল আমাদের চোখের সামনে। কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল পা। তবে মানুষের পা নয়। থাবার মতো দেখতে, তাতে বড় বড় ধারালো নখ। '

জমে বরফ হয়ে গেলাম দুজনেই। বিস্ময় এবং আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছি। গাঙ্গুয়ার মুখের দিকে তাকালাম আবার। মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে, ফুলে উঠেছে। কানজোড়া লাল টকটকে।

রোহানের হাত খামচে ধরলাম। এক ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম দরজা। হতভম্বের মত চলে এরাম ঘর থেকে। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম দরজা। হতভম্বের মত চলে এলাম সামনের ঘরে।

হটাৎ পেছনের ঘরের দরজাটা আর্তনাদ করে উঠল ভেতর থেকে ধাক্কা খেয়ে। মড়াৎ শব্দে ফাটল ধরল মাঝখানে। কাঠের ছিলকা চারপাশে ছিটকে গেল তীরবেগে। আমি লুকিয়ে পড়লাম একটা টেবিলের পেছনে। তাকিয়ে দেখি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে প্রকাণ্ডদেহী একটা কালো ভল্লুক। রোহান আমার সঙ্গে একই টেবিলের নিচে সেঁধিয়েছে। টের পেলাম থরথর করে কাঁপতে লেগেছে ও।

'বেশ', ফিসফিস করলাম আমি, 'এবার এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দাও আমাকে।'

ভল্লুকটার এক থাবায় গাঙ্গুয়ার জামার ছেঁড়া আস্তিন আটকে ছিল। টান মেরে ফেলে দিল সে কাপড়টা। ভল্লুকটা এবার আমাদের দিকে পা বাড়াল। এবার ফাঁদে পড়েছি আমরা! আর রক্ষা নেই।

কেরোসিনের বাতিটা আমাদের টেবিলের পেছনেই জ্বলছিল। জানতাম ভল্লুক আগুন ভয় পায়। আমি বাতিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভল্লুকটা এই প্রথম দেখতে পেল আমাকে। 'করছিস কী তুই?' টেবিলের নিচ থেকে চেঁচাল রোহান।

আমি বাতিটা সামনে ধরে নাড়তে লাগলাম। ভেবেছিলাম আগুন দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে জানোয়রটা। কিন্তু ওটা বীরদর্পে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। আমি জ্বলন্ত

বাতিটা ভল্লুকের পায়ের ওপর ছুড়ে মারলাম। মেঝেতে কতগুলো কাগজ আর বই পড়ে ছিল, ভাল্লুকটা ভেতর ঢোকার সময় শেলফ থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে; ওগুলোতে দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। গর্জে উঠল ভল্লুক, পিছিয়ে গেল।

'চলে এসো', রোহানের হাত ধরে টান দিলাম আমি। দুজনে ছুটলাম সদর দরজার দিকে। দরজা খুলে ফেললাম একটানে। প্রথম বেরুল রোহান, তারপর আমি। ভল্লুকটা হিংস্র গর্জন ছাড়ল শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে। আমি চট করে বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম দরজায়।

'পালাও!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'জানোয়ারটা আমাদের ধরতে আসছে!'

দশ

বারান্দা থেকে সবেগে নেমে এলাম আমরা, ছুটলাম মাঠের দিকে। শুনলাম প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে সদর দরজা। কাঠের বারান্দায় থপথপ শব্দ। ছুটে আসছে হিংস্র জানোয়ার।

জান বাজি রেখে দৌড়াচ্ছি আমরা। কিন্তু জানি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতি ভাল্লুকের। কোনোমতে জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারলেই হল। ওখানে লুকোতে হবে।

দৌড়াতে দৌড়াতে পেছন ফিরে চাইলাম বারবার। এতে দৌড়ের গতি মন্থর হল। রোহান আমার থেকে অন্তত বিশ গজ সামনে এগিয়ে। ভাল্লুকটা ধরলে আমাকেই ধরবে।

ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট পাথরখণ্ড লাফ মেরে পেরিয়ে যাচ্ছি। কোনোভাবে আছাড় খেলে দেখতে হবে না, ভল্লুকটার শিকার হবো পরক্ষণে। ঘাস আর ঝোপ মাড়িয়ে ভয়ানক গতিতে ছুটে আসছে ওটা। ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ করে এগিয়ে আসছে ক্রমে। আমাকে ধরে ধরে অবস্থা। তবে আমিও জঙ্গলের ধার চলে এসেছি।

স্যাঁৎ করে জঙ্গলে ঢুকে গেল রোহান। ওকে আর দেখতে পেলাম না। তবে ভল্লুকের ছুটন্ত পদশব্দ শুনছি। শুকনো ডাল, পাতা মাড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি ঝট করে সেঁধিয়ে গেলাম গাছগাছালির আড়ালে। এদিকে ঘন জঙ্গল। গাছগুলো সার বেঁধে দাঁড়ানো। ভল্লুকের মতো বিশালদেহী প্রাণী এত অল্প জায়গায় নড়াচড়া করতে পারবে কি না সন্দেহ।

কিন্তু আমাকে নিরাশ করে জানোয়ারটা ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। ঠাসঠুস শব্দে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে ছুটে আসতে লাগল মৃত্যুদূত। যেন একটা ট্যাঙ্ক ধাওয়া করেছে আমাকে। ওটার হাত থেকে নিস্তার নেই কিছুতেই।

হঠাৎ কুলকুল শব্দ ভেসে এল কানে। ঝর্ণা-টর্ণা হবে বোধহয়। ছুটলাম ওদিকে। ঝর্ণা নয়, চওড়া একটা খাড়ি। রোহান খাড়ির ওপাশে। আমাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল, 'এদিকে চলে আয় জলদি! বেশি গভীর নয় পানি। বোল্ডারের পাশ দিয়ে আসবি।'

অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। ভালো করে তাকাতে পাথরের বড় একটা বোল্ডার চোখে পড়ল। পানি বাধা পেয়ে ওটার পাশ দিয়ে সশব্দে ছুটে যাচ্ছে। ওদিকে ভল্লুকের গর্জন কাছিয়ে আসছে। আমি চট করে নেমে পড়লাম পানিতে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি স্রোত। স্রোতের টানে আরেকটু হলে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। টলমল পায়ে এগোলাম কয়েক কদম। আমার উরু পর্যন্ত উঠে এল পানি। পায়ের নিচে আলগা পাথর। পাথরে পা ফস্কে যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। হিমশীতল পানি এখন আমার কোমর ছুঁয়েছে। হঠাৎ ভল্লুকটার গর্জন থেমে গেল। পেছন ফিরে তাকালাম। খাড়ির কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে জানোয়ারটা। একটা থাবা ডোবাল পানিতে, তারপর খাড়ির তীরে হাঁটল কয়েক কদম। পানিতে নামার প্রস্তুতি

নিচ্ছে বোধহয়।

'চলে আয় জলদি!' খাড়ির ওপাশ থেকে চোঁচাল রোহান। 'পেছন ফিরবি না। ভল্লুকটা কী করছে বলব তোকে।'

আবার একটা কদম ফেললাম আমি। হঠাৎ তীব্র একটা ঢেউ ধাক্কা মারল আমাকে। ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম আমি। ডুবে গেলাম পানির নিচে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে আবার ভেসে উঠলাম ভুশ করে। স্রোতের টানে বোল্ডারটার ধারে চলে এলাম। আঁকড়ে ধরলাম ওটাকে। অনেক কষ্টে সিধে হলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানিতে চুবুনি খেয়ে অবস্থা কাহিল।

'আসতে থাক! থামিস না!' তাড়া দিল রোহান। 'জানোয়ারটা পানিতে নামছে।'

আমি পাথরটা ছেড়ে দিলাম, টলতে টলতে এগোলাম তীরের দিকে। তীব্র স্রোত বারবার আমাকে ভাসিয়ে নিতে চাইল।

'আয়। আয়!' হাত নেড়ে ডাকছে আমাকে রোহান। 'আর একটু। তীরের প্রায় কাছে চলে এসেছিস তুই!'

হঠাৎ ঝপাং শব্দ! পেছন ফিরে দেখি স্রোতের টানে তাল সামলাতে না পেরে পানিতে পড়ে গেছে ভল্লুক। ভাটির দিকে চলে যাচ্ছিল ভাসতে ভাসতে, চট করে পানির ওপর মাথা উঁচিয়ে থাকা একটা পাথরখণ্ড আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। স্রোতের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ড যুদ্ধ করে স্থির হল। পানি মুছতে মুছতে গা ঝাড়া দিতে লাগল।

'ওদিকে তাকিয়ে আছিস কেন, গাধা!' ধমকে উঠল রোহান। 'এদিকে দ্যাখ্।' ওর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম। দেখি পানিতে নেমে এসেছে রোহান, লম্বা একটা ডাল ধরে আছে। হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। 'উঠে আয়! উঠে আয়!'

আমি আরো কয়েক কদম এগোলাম, তারপর ধরে ফেললাম রোহানের বাড়ানো হাতটা। আমার হাত মুঠিতে চেপে ধরল রোহান টান মারল। দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম কর্দমাক্ত তীরে।

পেছনে ফিরে তাকালাম। ভল্লুকটা বড় বোল্ডারের কাছে চলে এসেছে। আমার দিকে চোখে চোখ পড়তে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠল। আগুন ঝরছে চোখ থেকে। 'এখন কী করবে?' রোহানের সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে প্রশ্ন করলাম আমি। পের জঙ্গলে ঢুকেছি আমরা।

'গাছে চড়ব', বলল রোহান। 'ভল্লুক গাছে উঠতে পারে না। যে-কোনো একটা গাছে উঠে পড়্। জলদি!'

এদিকে গাছগুলো বেশিরভাগ লম্বা। হাত বাড়িয়ে ডাল ধরা যায় না। ওদিকে ভল্লুকটা তীরে উঠে এসেছে। ঝোপঝাড় ভেঙে আসছে এদিকেই। এক্ষুনি কোনো গাছে উঠে পড়তে হবে আমাদেরকে।

'ওই গাছটায় ওঠ্!' একটা সেগুন গাছ দেখাল আমাকে রোহান। মাটি থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে ওটার মোটা মোটা ডাল। রোহান লাফ দিল। ধরে ফেলল ডাল। তারপর শরীরটা একবার দুলিয়ে দক্ষ অ্যাক্রোব্যাটদের এতো উঠে পড়ল ডালে।

ভল্লুকটা অনেক কাছে চলে এসেছে। ওটার ধ্বংসযজ্ঞের শব্দ পরিষ্কার শোনা

যাচ্ছে। রোহান মগডালে চড়ে বসল। আমি লাফ মেরে একটা ডাল ধরতে চাইলাম। কিন্তু ফস্কে গেল হাত। দড়াম করে পড়ে গেলাম মাটিতে। আমার পেছনের ঝোপ নড়ছে। চলে এসেছে মৃত্যুদূত।

আবার লাফ দিলাম। এবার আর ফস্কাল না ডাল। শক্তহাতে ধরে ঝুলে রইলাম। ভল্লুকটাকে এক সেকেন্ড পরেই দেখতে পেলাম। আমার গাছটার ঠিক নিচে। আমাকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে অবাক হয়েছে জানোয়ারটা। চার হাত পায়ে চক্কর দিল গাছটাকে ঘিরে, গন্ধ শুঁকছে। কোথায় গেছে ঠাহর করতে চাইছে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে হাতজোড়া। শরীর ভয়ে পাথর।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইল ভল্লুক। লাল টকটকে চোখজোড়া খুঁজছে আমাকে। অবশেষে দেখতে পেল ওটা আমাকে। কুঁকড়ে গেলাম আমি। ব্যালান্স রক্ষার জন্যে জড়িয়ে ধরলাম গুঁড়ি, কিন্তু একটা পা পিছলে গেল ডাল থেকে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, চট করে মাথার ওপরের একটা ডাল ধরে ফেললাম। অন্য হাত দিয়ে আরেকটা ডাল, ঝুলতে লাগলাম শূন্যে, ভল্লুকটার ঠিক মাথার ওপর। ওটা আমাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। এত কাছে যেন ওটার গরম নিশ্বাস পুড়িয়ে দিল গায়ের চামড়া। এবার আর রক্ষা নেই।

এবার আমি শেষ।

রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল জানোয়ারটা। ঘন ঘন ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ছে, লম্বা লম্বা নখ বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চাইছে। কিন্তু আমি তার নাগালের বাইরে। আর এ কারণে আরো বেশি রাগ ভাল্লুকের। বারবার লাফ মারছে। ধরতে পারছে না আমাকে।

মুখ তুলে চাইলাম ওপর পানে। ভয়ে মুখ শাদা হয়ে গেছে রোহানের, মগডালে বসে চেয়ে আছে আমার দিকে। 'ঝুলে থাক্।' আতঙ্কিত গলায় বলল রোহান।

ভল্লুকটা রাগের চোটে লাফিয়ে পড়ছে গাছের কাণ্ডের ওপর, ধাক্কার চোটে থরথর করে কেঁপে উঠছে গাছ, আমি যে ডালে ঝুলে আছি ওটা সেইসাথে ঝাঁকি খাচ্ছে। আমি ডালটাকে চার হাতপায়ে জড়িয়ে ধরে আছি।

লাফালাফি হঠাৎ থামাল ভল্লুক। গাছটাকে ঘিরে আবার চক্কর দিতে শুরু করল, গন্ধ শুঁকছে।

'হারামজাদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাল ছেড়ে দিয়েছে!' রোহানের উল্লসিত গলা শোনা গেল ওপর থেকে।

স্বস্তিবোধ করলাম। হাসি ফুটল মুখে। ভল্লুকটা চলে যাচ্ছে, চাইল একবার আমাদের দিকে।

'ভুয়া!' ডাক ছাড়ল রোহান।

'ওই গেলি!' চেঁচালাম আমি।

না, গেল না ভল্লুক। বসে পড়ল মাটিতে। জ্বলন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। গাছের সামনে এসে দাঁড়াল আবার। তারপর প্রকাণ্ড দুই থাবায় জড়িয়ে ধরল গুঁড়ি।

রোহানের দিকে তাকালাম আমি। ওর চেহারায় আতঙ্ক।

গুঁড়ি ধরে ঝাঁকি দিল ভল্লুক। ভয়ানক দুলে উঠল আমি যে ডালটা ধরে আছি, সেটা। ডালটাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম আমি। গুঁড়ি ধরে প্রবল শক্তিতে ঝাঁকাতে শুরু করল ভল্লুক। আমার ডালটাও এবার দোল খেতে শুরু করল ঝাঁকির চোটে। মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। হাতে ভীষণ ব্যথা। ধরে রাখতে পারছি না অবলম্বন। একটু পরেই ঝাঁকির চোটে পিছলে যেতে লাগলাম আমি।

নিচে তাকালাম। আগুন-চোখে আমাকে দেখছে ভল্লুক। সেইসঙ্গে গাছ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। মনে হল হাসছে ওটা আমার বেসামাল দশা দেখে। পৈশাচিক হাসি।

ডাল থেকে পিছলে যাচ্ছি আমি। সমস্ত শরীর ব্যথায় কাতর। হাতজোড়া থরথর করে কাঁপছে। আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না ডাল। এক পলকের জন্যে রোহানের দিকে তাকালম। মগডালটা প্রাণপণে চেপে ধরে রেখেছে ও। ঝাঁকি খাচ্ছে ও-ও। চেহারায় স্পষ্ট ভয়।

ডাল থেকে পিছলে যাচ্ছে আমার হাত। 'বাঁচাও!' রোহানের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম। 'আমি পড়ে যাচ্ছি।'

কিন্তু রোহান আমাকে বাঁচাবে কী করে? ও নিজে বাঁচলে তো!

এগার

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আমি। হাতদুটোতে যেন আগুন ধরে গেছে। বনবন ঘুরছে মাথা। অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি আমি।

ভল্লুকটার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনলাম। নাকি শিকার হাতে পেয়ে বিজয়-উল্লাসে চিৎকার করছে? ভয়ে চোখ মেলতে পারছি না। কান ঝনঝন করছে। হঠাৎ মনে হল কে যেন আলো ফেলল আমার চোখের ওপর। তারপর কার যেন চিৎকার শুনলাম। দূর থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ। ঠিক তখন ডালটা পুরোপুরি হাত ফস্কে গেল আমার। দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। হুশ করে বাতাস বেরিয়ে গেল বুক থেকে। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম। তবে চোখ মেললাম না। অপেক্ষা করছি ভল্লুকটার ধারালো থাবা আমার বুক ফালাফালা করে দেবে। কাঁধ খামচে ধরল আমাকে ভল্লুক। গুঙিয়ে উঠলাম আমি।

'তুমি ঠিক আছ তো?' ভেসে এল মনুষ্যকণ্ঠ। চোখ মেললাম। ভল্লুক নয়, বনরক্ষীর পোশাক পরা এক লোক ঝুঁকে আছে আমার ওপর। হাতে টর্চ। উঠে বসতে গেলাম, গুঙিয়ে উঠলাম ব্যথায়। লোকটা আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। তাকিয়ে দেখি বনরক্ষীর পোশাক পরা আরো কয়েকজন লোক। কারো কারো হাতে রাইফেল। দুজন রোহানকে গাছ থেকে নামতে সাহায্য করছে। এমন সময় আমার বাবাকে দেখলাম। হাতে রাইফেল। বলতে ভুলে গেছি বাবা এ অঞ্চলের চিফ ফরেস্ট অফিসার।

'তোদের কোথায় না খুঁজেছি', হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি। 'এভাবে না বলে কেউ বেরোয়!'

'সরি, বাবা।' মুখ নিচু করে ফেললাম আমি। 'আমরা জঙ্গলে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

এমন সময় এক বনরক্ষী ছুটতে ছুটতে এল। বাবাকে বলল, 'স্যার, আপনি যে ভল্লুকটাকে গুলি করেছেন ওটার পিছু নিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু ...একবার আসবেন দেখতে?'

বাবা আমার দিকে ফিরলেন। 'এতবড় ভল্লুক অঞ্চলে এই প্রথম দেখেছি। ভাগ্যিস, ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম। নইরে কী যে হত।' শিউরে উঠলেন বাবা।

বাবা আর বনরক্ষীদের পেছন পেছন এগোলাম। টর্চের আলো ফেলে হাঁটছে সবাই। ভল্লুক নয়, একটা গাছের নিচে শুয়ে থাকতে দেখলাম গাঙ্গুয়াকে। সারা গা রক্তে মাখামাখি।

'ভল্লুকটার পিছু নিয়েছিলাম আমরা', বলল আগের বনরক্ষী। 'তীর বেগে ছুটছিল ওটা আহত হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু এদিকে এসে ভল্লুকটার আর সন্ধান পাইনি।'

বাবা ঝুঁকলেন নিঃসাড় গাঙ্গুয়ার ওপর। বিড়বিড় করে বললেন, 'গুলি করেছে কেউ লোকটাকে। কই, আমি ছাড়া আর কাউকে তো গুলি করতে শুনিনি।' সিধে হলেন তিনি। 'এ লোককে চেনো তোমরা? দেখেছ কখনো'

বনরক্ষীরা এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। দেখেনি কেউ গাঙ্গুয়াকে। 'লোকটা মারা

গেছে।' বললেন বাবা। 'পুলিশে খবর দাও। কোনো পলাতক খুনির কাণ্ড হয়তো। আর তোমরা ভল্লুকটার খোঁজ নাও। আহত ভল্লুক ভয়ংকর হয়।'

বাবার নির্দেশে কয়েকজন রক্ষী বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গের।

আমি রোহানের দিকে তাকালাম। ও ফিসফিস করে বলল, 'চাচাকে আসল সত্যটা খুলে বলো। গোপন কোরো না।'

আমি বাবার দিকে তাকালাম। গভীর শ্বাস নিয়ে বললাম, 'বাবা, আহত ভল্লুক খোঁজার দরকার নেই। কারণ ইতিমধ্যে তুমি তার খোঁজ পেয়ে গেছ...।'

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল মার্ক। দৃশ্যটা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। মুখটি মড়ার মতো সাদা, চোখ আর থুতনির নিচে কালো রঙের পোঁচ। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল চকচকে কালো একটা টুপির মতো লাগছে। হাসার সময় ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘণ্টাখানেক আগে লাগানো একজোড়া শ্বদন্ত।

'মার্ক, রেডি হয়ে নাও,' একটা কণ্ঠ ভেসে এল দোরগোড়া থেকে। 'ওরা এসে পড়বে এখুনি।'

আয়নার সামনে থেকে ঘুরল মার্ক। তাকাল প্রধান সহকারী এলিয়টের দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। এলিয়টের সুদর্শন চেহারাটা মেকআপ নেওয়ার ফলে এ মুহূর্তে বিকৃত দেখাচ্ছে। তবে পিশাচবাড়িতে আসা মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতে তারা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। কিন্তু মার্কের কালো পোশাক পরা প্যাঁকাটি শরীর আর শুকনো মুখটার দিকে একবারের বেশি কেউ তাকায় না।

পিশাচবাড়ির ভারী ওককাঠের পাল্লাজোড়া ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে যেতে ওদিকে মনোযোগ ফেরাল মার্ক। স্পিকারে বেজে উঠেছে পরিচিত যন্ত্রসংগীত। হরর ছবির মিউজিক ট্র্যাকের মতো, শুনলেই শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজল নামতে থাকে মার্কের। ঘরের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। দর্শনার্থীরা এখনই ঢুকবে ভিতরে। শুরু করবে ট্যুর।

একে একে ওরা পা রাখল এন্ট্রান্স হল-এ, চেহারায় ফুটে আছে নার্ভাস ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, লাউডস্পিকারে ভেসে এল বজ্রনিনাদ। লাফিয়ে উঠল সবাই। তারপর এলিয়ট মসৃণ গলায় পিশাচবাড়ি দেখার জন্য স্বাগত জানাল সকলকে, সতর্ক করে দিল ঘরগুলোর অন্ধকার ছায়া আর ওঁৎ পেতে থাকা আতঙ্কের ব্যাপারে। মার্ক ঈর্ষা নিয়ে লক্ষ করল মেয়েগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে এলিয়টের দিকে। তারপর কান ফাটানো, কর্কশ একটা চিৎকার শোনা যেতে রেডি হয়ে গেল মার্ক। এবার ওর বলার পালা।

'এদিক দিয়ে আসুন, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ,' কণ্ঠে যতটা সম্ভবত থমথমে ভাব ফুটিয়ে তুলল মার্ক। 'আমার সঙ্গে সিটিংরুমে চলুন।' দর্শকরা ওর দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল একবার, তারপর সদর দরজার দিকে পা বাড়াল। হাতে

ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে দলটার পেছনে থাকল মার্ক।

সিটিংরুমে সবার আগে গটগট করে ঢুকে পড়ল এক স্বর্ণকেশী। প্রায় সাথে সাথে সে এমন গগনবিদারী চিৎকার দিল, বাকিদের আত্মা কেঁপে গেল। আড়ষ্ট হাসি ফুটল তাদের ঠোঁটে, চোখে ভয়। দরজা বন্ধ করে দিল মার্ক। দর্শনার্থীদের পেছন পেছন অন্ধকার সিটিংরুমে ঢুকল। এখানে চেয়ার এবং সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মোমের লাশ। স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত তাদের শরীর। কী ভয়ংকর চেহারা একেক জনের!

মার্ক লাশগুলোর দিকে না-তাকানোর চেষ্টা করল। ওগুলো ওর কলজে শুকিয়ে দেয়। এক রোগা তরুণ, ঘাড়ে গোটা চারেক আঘাতের চিহ্ন, চিৎ হয়ে পড়ে আছে সোফায়। মুখখানা মৃত্যুযন্ত্রণায় বীভৎস দেখাচ্ছে। এদের দিকে না-তাকাতে চাইলেও চোখ বারবার ওদিকেই চলে যেতে চায়। মার্ক জোর করে দর্শকদের দিকে নজর ফেরাল। বিকট চেহারার সব লাশ দেখে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছে বলে শুনেছে মার্ক। আজ সেরকম কোনো ঘটনা না। শুধু একটি মেয়ে ভয়ানক আঁতকে উঠল কাঁধে মার্কের আঙুলের টোকায়। মার্ক তাকে সামনে বাড়তে বলছে।

পিশাচবাড়ির পরের অংশ লাইব্রেরি। লাইব্রেরির দরজা খোলার সময় উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল মার্কের। দরজা খুলে দর্শকদের ইঙ্গিত করল ভিতরে ঢুকে পড়তে। উঁকি দিল লাইব্রেরি ট্যুর গাইড লিসার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিসা। ভারী ও কালো মেকআপের কারণে ভয়ঙ্কর লাগছে চোখজোড়া। লিপস্টিক পরা লাল টকটকে ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। তারপর, বেড়ালের মতো, লিসা আঁধারের মাঝে যেন পিছলে চলে এল মার্কের পাশে। 'আজ রাতে পার্টি আছে, মার্ক,' ফিসফিস করল সে কানের কাছে মুখ এনে। 'কিছুক্ষণ পরেই...দেরি কোরো না।'

লিসার গায়ের ভারী পারফিউমের গন্ধে মার্কের বুক শুকিয়ে এল, পাঁজরের গায়ে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মেয়েটা কামনামদির দৃষ্টি ফোটাল বাদামি চোখে, দীর্ঘ একটা সময় তাকিয়ে রইল মার্কের দিকে, তারপর লাইব্রেরির আঁধারে মিশে গেল যেখানে মোমের তৈরি পাঠকরা চেহারায় তীব্র আতঙ্কের মুখোশ এঁটে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

দলের শেষ দর্শক লাইব্রেরিতে ঢোকার পরে মার্ক অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্ধ করে দিল দরজা। লিসাকে আর দেখা যাচ্ছে না। উত্তেজনায় মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে উঠল। পিশাচবাড়িতে অল্প ক'দিন হল কাজ করছে মার্ক, অন্যান্য গাইডরা ওকে পাত্তাই দিতে চায় না, সেই তাদের সঙ্গে আজ আর কিছুক্ষণ বাদে পার্টি— ভাবা যায়!

আজকের দিনটি যেন অসহ্য ধীর গতির— ফুরোতেই চায় না। দর্শকদের একেকটি দল সিটিংরুম থেকে লাইব্রেরিতে যাচ্ছে, লিসার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে

মার্কের। প্রতিবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মেয়েটা, যেন পার্টি কখন শুরু হবে সেজন্য ওরও তর সইছে না।

রাত ৮:৪৫। আলোকিত ডায়ালে সময় দেখল মার্ক। বিনোদন পার্ক বন্ধ হবার এখনও পনেরো মিনিট বাকি। আরেকটি দল সম্ভবত আসবে পিশাচবাড়ি দেখতে। তারপর নিভে যাবে স্পটলাইট, বিল্ডিং-এর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আজকের দিনের জন্য, গাইডরা বাড়ি ফিরবে। মিস্টার হিলারের চোখ এড়িয়ে গাইডরা কীভাবে পার্টি দেবে মাথায় ঢুকছে না মার্কের। পিশাচবাড়ির কঠিন ম্যানেজার এ লোক, তার নজর ফাঁকি দিয়ে কারও এদিক-সেদিক কিছু করার জো নেই।

দর্শনার্থীদের শেষ দলটা ওককাঠের দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছে এন্ট্রান্স হল-এ, ঠিক আগে আগে এলিয়ট একপাশে টেনে নিল মার্ককে। 'লিসা তোমাকে পার্টির কথা বলেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

মুচকি হেসে মাথা দোলাল মার্ক, এই প্রথমবার এলিয়টকে ভালো লাগল তার।

'হিলার যেন তোমাকে দেখতে না পায়,' নিচু গলা এলিয়টের। 'এই শেষ দলটাকে সিটিংরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়বে। হিলার প্রতিরাতে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে বের হয়, মোমের মূর্তিগুলোর কেউ কোনো ক্ষতি করল কিনা পরীক্ষা করে দেখে। সে চলে যাবার পরে আমরা সবাই বেরিয়ে আসব।'

মার্ক জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কোথায় ওরা মিলিত হবে, দরজা খোলার শব্দে চট করে নিজের জায়গায় ফিরে গেল এলিয়ট। শেষবারের মতো বেজে উঠল ভৌতিক সংগীত, মার্কের শিরদাঁড়া বেয়ে আবার বরফ-জল নামল। হঠাৎ মনে হল আজ রাতটা শুধু মজার নাও হতে পারে। পার্টিতে যাওয়া মানে চাকরির ঝুঁকি নেওয়া। লিসার চোখ আর পারফিউমের কথা মনে পড়তে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মার্ক। লিসার জন্য যে-কোনো ঝুঁকি নেওয়া যায়।

সিটিংরুমে শেষ দলটাকে নিয়ে দুরুদুরু বুকে ঢুকল মার্ক। এ দলের লোকজন যা দেখছে তাতেই চেঁচিয়ে ঘর ফাটাচ্ছে। লাইব্রেরির দরজা যখন খুলল মার্ক, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। দেখল লিসা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে ঠোঁটে মদির হাসি এঁকে। শেষ লোকটা লাইব্রেরিতে ঢোকার পরে লিসা চলে এল মার্কের কাছে, ওর গালে আঙুল ছোঁয়াল। 'বেশিক্ষণ লাগবে না,' ফিসফিস করল সে। তারপর লাইব্রেরির আঁধারে মিশে গেল।

মার্কের হাঁটুজোড়া দুর্বল ঠেকল, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। লাইব্রেরি এবং সিটিংরুমের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, ঘরের অন্ধকার কোণগুলোতে ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল। সাধারণত রাতের এ সময়টাতে সে দর্শকদের শেষ দলটার সাথে বেরিয়ে পড়ে পিশাচবাড়ি থেকে, হাঁটা দেয় বাড়ির উদ্দেশে। মনে পড়ল বাসায় ফিরতে দেরি হবার কথা জানাবার এখন আর সুযোগ নেই। মা চিন্তা

করবেন। এখন আর সুযোগ নেই। মা চিন্তা করবেন। কিন্তু কোনোকিছুর জন্য পার্টি মিস করতে পারবে না মার্ক।

সিটিংরুমটা রেইলিং দিয়ে ঘেরা, যাতে দর্শক হাত বাড়িয়ে মোমের মূর্তি ছুঁতে না পারে। মার্ক রেইলিং টপকাল। দেখল দুই মোমের মহিলার আতঙ্কিত চেহারা থেকে ইঞ্চি কয়েক দূরে আছে সে। গায়ে কাঁটা দিল মার্কের, ওগুলোর ছায়ার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। ফ্ল্যাশলাইটের সরু আলোর রেখায় আলোকিত হয়ে উঠল মখমলের পর্দা। এটা মূর্তিগুলোর ব্যাকড্রপ হিসাবে কাজ করে। এ পর্দার পেছনে কী আছে তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি মার্ক। আজ দেখবে কী আছে। ইতস্তত ভঙ্গিতে সে পর্দার একটা কোণ তুলে আলো ফেলল। দ্রুত কী একটা ছুটে গেল মেঝে দিয়ে। লাফ মেরে পিছিয়ে এল মার্ক, এদিক-ওদিক তাকাল। লুকানোর জায়গা খুঁজছে। পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়ার মতো তেমন জায়গা নেই। এমন সময় সদর দরজা খোলার শব্দ শুনল মার্ক। ঝট করে পর্দার আড়ালে চলে গেল সে এবং সুইচ টেপার শব্দে পাথরের মূর্তির মতো জমে গেল। আলোয় ভেসে গেছে ঘর।

ঘড়ি দেখল মার্ক। ন'টা বাজে। নিশ্চয় হিলার, পিশাচবাড়ি বন্ধ করার আগে রাতের টহল দিতে এসেছে। মাথাটা সামান্য কাত করে পর্দার সরু একটা ফাঁক দিয়ে তাকাল মার্ক। ম্যানেজার কার্পেটে মোড়া প্যাসেজ ধরে হাঁটছে, সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করছে প্রতিটি মূর্তি, উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আসবাবের পেছনদিকটা। মোমের মূর্তির মতোই স্থির হয়ে রইল মার্ক যতক্ষণ পর্যন্ত না হিলার তার টহল শেষ করল। শেষে বাতি নেভাল সে, চলে গেল লাইব্রেরিতে।

অন্ধকারে সেই সড়সড় শব্দটা আবার শুনতে পেল মার্ক। যেন ইঁদুর ছুটে যাচ্ছে মেঝে দিয়ে। পায়ে ওটার শরীরের স্পর্শ পেল সে। বহুকষ্টে উদ্‌গত চিৎকারটা ঠেকিয়ে রাখল মার্ক, একটানে পর্দা সরাল, তারপর দৌড় দিল। অন্ধকারে একটা মূর্তির গায়ে হোঁচট খেয়ে কাঁপা হাতে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল মার্ক, পেতলের রেইলিং-এর কাছে মূর্তিগুলোর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। এখানে বসল মার্ক। নিভিয়ে দিল আলো। এখন ওর কাজ অপেক্ষা করা। হিলার তার টহল শেষ করে কখন ফিরে যাবে আর তারপর পার্টি শুরু হবে সে অপেক্ষার প্রহর গোনা।

অন্ধকারে মনে মনে হাসল মার্ক, লিসা পাশের ঘরেই আঁধারে লুকিয়ে আছে ভেবে। লিসাও হয়তো মার্কের কথাই ভাবছে। লাইব্রেরিঘরের দরজা খুলে লিসার কাছে চলে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে মার্কের। হিলারের কাজ এতক্ষণে শেষ হয়ে যাবার কথা। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে থামিয়ে রাখল। মার্ক ঠিক করেছে অপেক্ষা করবে। এলিয়ট, লিসা কিংবা গাইডদের অন্য কেউ সময় হলেই এ-ঘর থেকে ওকে ডেকে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া মার্ককে বসে থাকতেই হবে। কারণ ওদের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হবে বলেনি ওকে কেউ।

মিনিটগুলো ঘণ্টার মতো লাগল মার্কের কাছে। উত্তেজনা বাড়ছে। চিন্তা করল, হিলার পিশাচবাড়ির কোন্ জায়গাটায় এ মুহূর্তে থাকতে পারে। দোতলার কাজ শেষ করে মাটির নিচের জেলখানার মতো সেলারটাতে হয়তো উঁকি দিচ্ছে। আবার ঘড়ির দিকে তাকাল মার্ক। পোনে দশটা। শিউরে উঠল সে হিম বাতাসে। এয়ার কুলার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনেছে রাতের বেলা গোটা বিল্ডিংকে বরফ-ঠাণ্ডা করে রাখা হয়, যাতে মোমের মূর্তিগুলো শক্ত থাকে।

সিধে হল মার্ক, সিটিংরুমের লাল কার্পেটে মোড়া সরু প্যাসেজে পায়চারি করতে লাগল। এলিয়ট আর লিসার কথা ভাবছে। ঘরের তাপমাত্রা দ্রুত নামছে, বাড়ছে ঠাণ্ডা। কালো জ্যাকেটের কলার টেনে দিল মার্ক। রাত দশটার সময় সিদ্ধান্ত নিল এন্ট্রান্স হল-এ যাবে সে, এলিয়ট নিশ্চয় ওখানে আছে।

দরজা খুলল মার্ক। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ছোট ঘরটিতে। আশা করছে যে-কোনো মুহূর্তে হুম করে লাফ মেরে ওর সামনে চলে আসবে এলিয়ট। কিন্তু ঘর সম্পূর্ণ খালি। কালো, প্যানেল করা দেয়ালের কোথাও লুকোবার জায়গা নেই। ভয় লাগল মার্কের, হেঁটে গেল দুইপাল্লার দরজার দিকে। এ দরজা দিয়ে দর্শকরা ঢোকে। দুটি পাল্লাতেই তালা মারা। ধাক্কা দিল মার্ক। খুলল না। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা হাত থাবা বসাল মার্কের কলজেতে, একছুটে সিটিংরুম থেকে ঢুকে পড়ল লাইব্রেরিতে, হিলার আশপাশে থাকতে পারে, সে শঙ্কা আর কাজ করছে না মনে।

'লিসা!' অন্ধকারে হাঁক ছাড়ল মার্ক। কণ্ঠটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল ওর কাছে। তারপর ঘরের মখমলের মতো মসৃণ আঁধারে ডুবে গেল। ভয়ের আরেকটা ধাক্কা দাঁড়া করিয়ে রাখল মার্ককে। হয় এলিয়ট এবং লিসা ওকে নিয়ে খেলছে, নতুবা ওদের কথা বুঝতে ভুল করেছে সে। আতঙ্কিত মার্ক মনে করার চেষ্টা করল ওরা কী বলেছিল। ওর পরিষ্কার মনে পড়ছে লিসা আজ রাতে পার্টির কথা বলেছিল আর এলিয়ট বলেছিল হিলার চলে না-যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে।

ঘরের মোমের মূর্তিগুলোর উপরে আলো ফেলল মার্ক। বীভৎস মুখগুলো দেখছে, এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী মহিলার চেহারায় স্থির হল। ওটা লিসা। মোমের মুখখানায় একই রকম টলটলে বাদামি চোখ আর লাল টকটকে অধর। তবে ঠোঁটের উপরে চারটে সাদা কাটা দাগ। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় মুখখানা ভীষণ জ্যান্ত মনে হল, যেন ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঠোঁট বেঁকে গেছে বিদ্রূপাত্মক হাসির ভঙ্গিতে। ভয়ানক চমকে গেল মার্ক। আলো সরিয়ে নিল ভৌতিক মুখের উপর থেকে, লাইব্রেরির দরজা দিয়ে একছুটে ঢুকে পড়ল ডাইনিংরুমে।

'এলিয়ট! লিসা!' কাঁপা গলায় ডাকল সে। কোনও জবাব নেই। আছে শুধু খালি পিশাচবাড়ির গভীর নীরবতা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে কয়েকজন। হাঁ হয়ে আছে মুখ, বিষাক্ত খাবার খাওয়ার যন্ত্রণায় অস্থির।

ছুটতে শুরু করল মার্ক, দ্রুত থেকে দ্রুততর হল গতি, দোতলায় বেডরুমে চলে এল। এখানেও শুধু মৃত্যু আর হত্যার বিকট দৃশ্য। একেকটি ঘরের দরজা খুলছে মার্ক ক্ষীণ আশা নিয়ে, ওকে পার্টির কোনো গাইড উল্লসিত অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু প্রতিটি ঘর খালি। এখন শুধু নিচতলার জেলখানাটা দেখা বাকি।

নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল মার্ক, প্রতি পদক্ষেপে পুরনো কাঠের তক্তা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে আপত্তি জানাল। শেষ আশা জেলখানার দরজার সামনে চলে এল মার্ক। কিন্তু দরজা খুলতে শুধু নিকষ আঁধার ওকে ভেংচি কাটল।

প্রচণ্ড রাগে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে মার্কের। ওকে আচ্ছা বুদ্ধু বানিয়েছে এলিয়ট এবং লিসা। আজ রাতে পার্টি-ফার্টি কিচ্ছু নেই। ওকে পিশাচবাড়িতে একা ফেলে রেখে যাবার বুদ্ধি করেছিল ওরা। পরিকল্পনা সফল হয়েছে। এ মুহূর্তে হয়তো একসাথেই রয়েছে দুজনে, মার্কের বোকা বনে যাবার কথা ভেবে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। লাল কার্পেট বিছানো রাস্তায় আলো ফেলল মার্ক। সোজা জেলখানার দিকে চলে গেছে। ওর দুপাশে নির্যাতিত লাশের সারি। ওদিকে তাকাল না মার্ক। সে শুধু বাইরে যাবার দরজাটা খুঁজছে। এখান থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

কার্পেট বিছানো রাস্তার শেষ মাথায় চলে এল মার্ক, কতগুলো লাল পর্দার সামনে এসে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে রাস্তা। একটানে পর্দা সরিয়ে ফেলল মার্ক। পর্দার পেছনে একটা দরজা। এ দরজা খুলে পিশাচবাড়ির বাইরে যাওয়া যায়। জোরে দরজায় ধাক্কা দিল মার্ক। একটুও নড়ল না দরজা। দমাদম ঘুসি মারল, কাঁধ দিয়ে ঠেলা দিল। কোনও লাভ হল না। বন্ধই রইল দরজা। অবশেষে ভয়ংকর সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল মার্ক : আজ রাতের মতো সে বন্দি পিশাচবাড়িতে।

আবার দরজায় ঘুসি মারল মার্ক। ব্যথার চোটে আর্তচিৎকার ছাড়ল। নানা দুশ্চিন্তা কালো বাদুড়ের মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল মস্তিষ্কে। পিশাচবাড়ির কোন্ ঘরে সে রাতটা কাটাবে বুঝতে পারছে না। একেকটা ঘরের কথা মনে পড়ে আর শিউরে ওঠে। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘর হল এই জেলখানা। খুন হয়ে যাবার ভয়ে ভীত প্রাণীর মতো সে জেলখানার কার্পেট মোড়ানো রাস্তা দিয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে বেডরুমে যাবে।

মাঝামাঝি পথ পেরিয়েছে মার্ক, আঁধার ভেদ করে ওর সামনে থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ভয়ে হিম হয়ে গেল গা। কান খাড়া করল মার্ক। দ্বিতীয়বার শব্দটা শুনতে পেল। ইঁদুর-টিদুর হবে হয়তো, নিজেকে সান্ত্বনা দিল মার্ক, কিন্তু মস্তিষ্কের একটা অংশ এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হল না। কোনো মানুষ করেছে শব্দটা, পায়ের আওয়াজের মতো, অন্ধকারে ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

ছুটল মার্ক, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে ডানে-বামে, চকিতে তাকাচ্ছে মোমের

বিকট মূর্তিগুলোর দিকে। একটা মূর্তি দেখে চমকে গেল— এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী, গাঢ় বাদামি চোখ, লাল টুকটকে অধর। জেলখানায় এ মূর্তি আগে দেখেনি ও। এটাকে না সে কয়েক মিনিট আগে লাইব্রেরিতে দেখে এসেছে?

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছে মার্ক, কাঁপা পায়ে কয়েক কদম ওঠার পরে হোঁচট খেল। মাথাটা দারুণ জোরে বাড়ি খেল এক জল্লাদের লোহার মূর্তির সাথে। সিঁড়িতে কয়েক মুহূর্ত চিৎ হয়ে পড়ে রইল মার্ক, নড়াচড়ার শক্তি নেই। বোঁ বোঁ ঘুরছে মাথা। এমন সময় পায়ের শব্দ আবার শুনতে পেল ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে হাঁটু মুড়ে বসল মার্ক, পাগলের মতো খুঁজছে ফ্ল্যাশলাইট। পড়ে যাবার সময় কোথাও ছিটকে গেছে ওটা, আলোও নিভে গেছে। অন্ধকারে খামোকাই হাতড়ে বেড়াল মার্ক।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ক্রমে কাছিয়ে আসছে। মার্ক টলতে টলতে সিধে হল, দৌড়াল দোতলার ঘরগুলোর দিকে। হলওয়ের শেষ মাথায়, দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাঁপাচ্ছে বেদম। মখমলের মতো ঘন অন্ধকার আর কবরের মতো নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে শ্বাস নিয়মিত হয়ে এল মার্কের। কল্পনা, মনকে বোঝাল ও, আসলে সে এতক্ষণ কল্পনা করেছে। কোথাও কেউ নেই তো! আর ঠিক তখন দোতলার হলওয়েতে প্রতিধ্বনি তুলল পায়ের আওয়াজ। মার্ককে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে, ধীরে এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, আঁধার ভেদ করে।

গলা দিয়ে উঠে আসা চিৎকারটাকে গিলে ফেলল মার্ক, সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ের গতিতে নামতে শুরু করল, যাচ্ছে ডাইনিংরুমের দিকে। পায়ের শব্দটা দ্রুত হল। অনুসরণকারীও এবার ছুটছে। প্যাসেজে মোড় নিতে ভুলে গিয়েছিল মার্ক, প্রচণ্ড বাড়ি খেল তামার রেইলিং-এ। ব্যথায় ফুসফুসের সমস্ত বাতাস যেন বেরিয়ে গেল, ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসা আর্তনাদ বিশাল শূন্যঘরে প্রতিধ্বনি তুলল। টলমল পায়ে পিছিয়ে এল মার্ক, চোখে সর্ষেফুল দেখছে। এমন সময় হাসির শব্দটা শুনতে পেল— নিচু গলায়, খনখনে ভৌতিক হাসি— বেরিয়ে এল আঁধার ফুঁড়ে। আতঙ্কের স্রোত ওকে অবশ করে ফেলছে, তবু দরজার দিকে ছুটল সে। ঐ দরজা ডাইনিংরুমকে আলাদা করে ফেলেছে লাইব্রেরি থেকে। এক ধাক্কায় দরজা খুলে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ল মার্ক, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'লিসা!'

ওর কণ্ঠ ওকে ব্যঙ্গ করতেই যেন ফিরে এল প্রতিধ্বনি হয়ে। সিটিংরুমের দরজার দিকে অনুমান করে ছুটল মার্ক, কিন্তু ওখানে পৌঁছার আগেই লাইব্রেরিতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। অটল ও অশুভ পায়ের আওয়াজ, ওকে খুঁজছে অন্ধকারে। দরজার পাল্লা হাতড়াচ্ছে মার্ক, ঘাড়ের কাছে ফোঁস করে তপ্ত নিশ্বাস ফেলল কেউ। তারপর, পেছনের অন্ধকারে, খনখনে গলার হাসি শোনা গেল। মুখ হাঁ করেছে মার্ক, চিৎকার দেবে, ধারালো কিছু একটা বিদ্যুৎবেগে ঢুকে গেল ওর ঘাড়ে,

দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল মার্ক পিশাচবাড়ির আরেক শিকার হয়ে।

পরদিন বিকেলে লিসা লাইব্রেরিঘরে ঢুকল রুটিন কাজটা করতে। মার্ক কখন আসবে, তর সইছে না ওর। কাল রাতে ছেলেটা কীরকম ভয় পেয়েছে জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে। লাইব্রেরির মোমের মূর্তিগুলোর গায়ে টর্চের আলো ফেলল লিসা। লক্ষ করল স্বর্ণকেশী মহিলা তার আগের জায়গায় নেই, মেঝেতে একটা শরীরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ হয়ে এল লিসার। সে নিশ্চিত ওখানে এর আগে কেউ ছিল না।

সামনে পা বাড়াল লিসা, ঝুঁকল। স্বর্ণকেশীকে ঠেলে সরিয়ে দিল। মোমের একটা মূর্তি। এক তরুণের। মুখটা আতঙ্কে বিকৃত। লিসা ভয়ে চিৎকার দিতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। চেহারাটা অবিকল মার্কের মতো। হাত বাড়াল লিসা। ছুঁল মুখখানা। ঠাণ্ডা মোমের স্পর্শ পেল হাতে।

মূল : জে.বি. স্ট্যাম্পারের 'হাউজ অভ হররস''

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

ছায়ামানুষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার প্রফেসর ড. আলী রিয়াজ ইংরেজি নববর্ষে একটি বই উপহার পেলেন। বইয়ের নাম 'বিলিভ ইট অর নট', লেখক রবার্ট এল রিপ্লে। কেউ কাউকে কিছু উপহার দিলে তাকে থ্যাংকস্ দিতে হয়। এটা সামাজিক নিয়ম। তিনিও নিয়ম রক্ষার জন্যে উপহারদাতাকে থ্যাংকস্ দিলেন। কিন্তু তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বইটি যে দিয়েছে, সে তাঁর ছাত্র। তিনি সারাজীবন তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন, পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু নেই, এখানে যা ঘটে সবই লৌকিক। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর শিক্ষা ছাত্রদের অন্তরে বসে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর এই ধারণা ঠিক নয়। তাঁর শিক্ষা এদের অন্তরে বসেনি, বসলে এই বই কিনত না। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল এ ধরনের বই এরা তাঁকেও উপহার দিচ্ছে।

তিনি মন খারাপ করে বাসায় ফিরলেন। বাসায় ফিরে দেখলেন, তাঁর ছোট মেয়ে মাইশা তাঁর জন্যে রসুনের আচার পাঠিয়েছে। একদম টাটকা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন ভালো হয়ে গেল। মনে হল তাঁর মতো সুখী কেউ নেই। তিনি মনে মনে সবাইকে মাফ করে দিলেন। সকালের সেই ছাত্রকেও মাফ করে দিলেন।

রাতে বিছানায় শুয়ে তাঁর মনে হল আজ আর ঘুম আসবে না। খালি খালি শুয়ে থেকে কী লাভ? তিনি আবার বাতি জ্বালালেন। কিছু একটা পড়া যায়। কী পড়বেন? জুওলজি? তাতে ঘুম আরও থিতিয়ে যেতে পারে। তিনি ভেবেচিন্তে 'বিলিভ ইট অর নট' বের করলেন। মন দিলেন প্রথম গল্পে। গল্পের নাম 'ইন্টারভিউ দিয়ে রাজা'।

ইসমাইল সাহেব একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছেন। তাঁর সমস্যাটি এত অদ্ভুত যে কাউকে বলার সাহস পাচ্ছেন না। বললেই লোকজন তাঁকে পাগল ঠাউরাবে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে। আবার না-বলেও শান্তি পাচ্ছেন না। ছটফট করছেন। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা বলতে গেলে না-ঘুমিয়েই আছেন।

রাহেলা কয়েকবার জানতে চেয়েছেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

ইসমাইল সাহেব জবাব দেননি। হেসে এড়িয়ে গেছেন। কখনও বলেছেন, 'কিছু হয়নি।'

তাঁর এই জবাব থেকে রাহেলার সন্দেহ আরও বেড়েছে। রাহেলাও বুঝেছেন,

কিছু একটা হয়েছে। ভেবেছেন, অফিসের ঝামেলা-টামেলা হবে। তাই আর কিছু জানতে চাননি।

ইসমাইল সাহেবের সমস্যা শুরু হয় ২৮ নভেম্বর থেকে। দিনটা ছিল শনিবার। শনিবারে তিনি ঠাটারিবাজার যান। সংসারের এটা-ওটা কেনেন। সেদিনও গেলেন। কিছু কিনে-টিনে ফেরার পথে রিকশায় চড়তে গিয়ে খেয়াল হল চোখে চশমা নেই।

তাঁর আর রিকশায় চড়া হল না। তিনি আবার বাজারের মধ্যে ঢুকলেন। মনে করার চেষ্টা করলেন কোথায় কোথায় ঘুরেছেন। আজ তেমন কেনাকাটা করেননি। যা করার এক দোকান থেকেই করেছেন। ইসমাইল সাহেব সেই দোকানের সামনে এসে হাজির হলেন।

এই সময় একটা কাণ্ড হল। তিনি টের পেলেন কে যেন তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চোখে ভালো দেখা যায় না। এর মধ্যেই যেটুকু দেখলেন, তাঁর গা শিরশির করে উঠল। তিনি কাকে দেখলেন?

চোখের ভুল, নিশ্চয়ই চোখের ভুল। ইসমাইল সাহেব নিজেকে বোঝালেন। তাঁর বয়স হয়েছে। তার উপর চোখে নেই চশমা। কী দেখতে কী দেখেছেন তার ঠিক নেই। এই তো সেদিন এক ফেরিওয়ালাকে মোশতাক ভাই মনে করেছিলেন। তিনি সামনে এগুলেন।

দোকানটি তাঁর চেনা। বয়স্ক দোকানদার তাঁকে দেখে এগিয়ে এল। একগাল হেসে বলল, 'আর কিছু লাগবে?'

তিনি মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারছেন এই দোকানে চশমা ফেলে যাননি। গেলে দোকানদার প্রথমেই চশমা বের করত। এত কথা বলত না। তবুও ইতস্তত করে বললেন, 'আমি কি চশমা ফেলে গেছি?'

শুনে দোকানদার আকাশ থেকে পড়ল। 'সে কী! একটু আগে যে নিয়ে গেলেন!'

ইসমাইল সাহেবের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। 'কী বলছেন আপনি?'

দোকানদার নিজেও কম অবাক হল না। বিস্ফারিত চোখে বলল, 'তার মানে আপনি...?'

ইসমাইল সাহেব বসে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। শরীর ঘোলাচ্ছে। তিনি যে এখান থেকে চশমা নিয়ে যাননি, এটা ঠিক। আবার সেইসাথে এ-ও ঠিক যে এই দোকানদার মিথ্যা বলছে না। চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাঁর চোখের সামনে একটু আগে দেখা সেই আকৃতি ভেসে উঠল।

তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করলেন। নিজেকে বোঝালেন, কোথাও কোনো ভুল হয়েছে। দোকানদার একজনকে দেখতে গিয়ে আরেকজনকে দেখেছে। ভুল করে তাঁর চশমা দিয়ে দিয়েছে অন্য কাউকে। সেই লোক যখন টের পাবে, তখন ফেরত দিয়ে যাবে। এত আপসেট হবার কিছু নেই। তিনি আবার দোকান থেকে বের

হলেন।

প্রফেসর আলী রিয়াজ হাই তুললেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। রাতও কম হয়নি। একটা চল্লিশ। তিনি 'বিলিভ ইট অর নট' বন্ধ করলেন। এবার ঘুমানো উচিত।

তিনি বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। বইটা মন্দ না। পড়তে ভালোই লাগে। পড়তে পড়তে একসময় ঘুম চলে আসে। আজ পড়লেন তুরস্কের এক অদ্ভুত মন্দিরের গল্প-যে মন্দিরের মূর্তিগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি রোজ রাতে একটু একটু পড়েন। দুতিন পাতা পড়লেই ঘুম চলে আসে। ঘুম আনার ভালো বুদ্ধি বের হয়েছে।

আজ ২৯ তারিখ, রবিবার। ইসমাইল সাহেব সকাল সকাল নাস্তা করলেন। নাস্তা করে অফিসে রওনা হলেন। তাঁর অফিস বাসা থেকে বেশিদূরে নয়। রিকশায় গেলে তিন টাকা লাগে। ইসমাইল সাহেবের তা-ও লাগে না। অফিসের স্টাফবাস আছে। তিনি বাস ধরার জন্যে রাস্তার মাথায় এসে দাঁড়ালেন।

আটটা পঞ্চাশে বাস আসার কথা। একসময় ন'টা বাজল। সাড়ে ন'টা বাজল। ইসমাইল সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন। অফিসে আজ মেলা কাজ। একগাদা চিঠি টাইপ করতে হবে, সিটিঙের ওয়ার্কিং পেপার বানাতে হবে। ব্যাংকেও যেতে হবে। মেয়ের অ্যাডমিশনের জন্যে টাকা লাগবে। তিনি আবার ঘড়ি দেখলেন। বাস কি বিকল হয়ে গেছে? নাকি ট্র্যাফিক জ্যাম? তিনি এখন কী করবেন? রিকশায় চলে যাবেন? রিকশা কই?

ইসমাইল সাহেব অফিসে পৌঁছুলেন দশটা দশ মিনিটে। এত দেরি তাঁর কখনও হয় না। ভেবেছিলেন, বড় সাহেব ডেকে পাঠাবেন, ধমক-টমক দেবেন। কিন্তু তেমন কিছু হল না। কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না। কেবল ডেসপ্যাচ সেকশনের সিদ্দিক মিয়া একগাল হেসে বলল, 'কী ভাই, হয়ে গেল?'

তিনি সিদ্দিক মিয়ার কথার মাথামুণ্ডু বুঝলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু সিদ্দিক মিয়া আর কিছু বলল না, নিজের কাজে চলে গেল। ইসমাইল সাহেব নিজেও তাঁর কাজে মন দিলেন।

সাড়ে দশটায় তাঁর একটা ফোন এল। তিনি অবাক হয়ে ফোন ধরতে গেলেন। ঢাকা শহরে তাঁকে ফোন করার মতো কেউ নেই। তবে কি ঢাকার বাইরে থেকে এসেছে?

'হ্যালো!'

ওপাশে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল। 'ইসমাইল সাহেব বলছেন?'

ইসমাইল সাহেব ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিনি এই মহিলার গলা চিনতে পারছেন না। একবার ভাবলেন রং নাম্বার। কিন্তু দেখলেন, টেলিফোন নাম্বার মিলে যাচ্ছে। মহিলা বলছেন, তিনি ইসমাইল হোসেনকে চান। ইসমাইল সাহেব আমতা আমতা

করে বললেন, 'আমি আপনার ঠিক...।'

মহিলা অবাক হয়ে বললেন, 'এসব কী বলছ তুমি!'

ইসমাইল সাহেব আরও অবাক হয়ে কিছু বলতে গেলন। কিন্তু তার আগেই লাইন কেটে গেল। আর ফোন এল না।

তিনি ভাবলেন কেউ মহিলাকে ভুল নাম্বার দিয়েছে। হয়তো আগে এই নাম্বার অন্য কারও ছিল। এখন বদলে গেছে। হয়তো সেই নাম্বারে ইসমাইল হোসেন নামেও কেউ একজন ছিল। আগাগোড়া সবটুকুই কাকতালীয়।

সাড়ে এগারোটার দিকে তাঁর কাজের চাপ কমে গেল। তিনি অফিস থেকে বেরুলেন। রিকশাও পেয়ে গেলেন। রিকশাওয়ালা জানতে চাইল, 'কোথায় যাবেন?'

তিনি বললেন, 'মতিঝিল।'

রিকশা এসে হাজির হল মতিঝিলের একটা ব্যাংকের সামনে। তিনি রিকশা থেকে নামলেন। ব্যাংকের লোকজন তাঁকে দেখে অবাক হল। স্টাফ অফিসার মীর মনোয়ার আলী জানতে চাইল, 'কিছু ফেলে গেছেন?'

ইসমাইল সাহেব বিরক্ত হলেন, 'কিছু ফেলে যাব কেন?'

'তাহলে?'

'টাকা তুলতে এসেছি।'

মীর মনোয়ার আলীর চোখ কপালে উঠল। 'একটু আগে না টাকা তুললেন?'

ইসমাইল সাহেব চমকে উঠলেন। তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল।

'কী বলছেন আপনি!'

উত্তরে মনোয়ার আলী কী যেন বলল। কিন্তু ইসমাইল সাহেবের কানে গেল না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। তিনি প্রাণপণে নিজেকে বোঝালেন, এরা যা বলছে, তা ঠিক নয়। এরা ভুল দেখেছে। এদের এ ভুল ভাঙিয়ে দেয়া দরকার।

তিনি কাউন্টারে গিয়ে চেক জমা দিলেন। টোকন নিয়ে বের হলেন রাস্তায়। চেক ক্যাশ হতে সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে এক কাপ চা খাওয়া যায়। তিনি রাস্তার উল্টোদিকে একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলেন।'

নতুন রেস্তোরাঁ, আগে কখনও আসা হয়নি। কিন্তু ইসমাইল সাহেব লক্ষ করলেন, রেস্তোরাঁর লোকজন তাঁকে অতিরিক্ত খাতির করছে। চেয়ার-টেয়ার মুছে দিচ্ছে, গ্লাস ধুয়ে দিচ্ছে। এমন ভাব করছে, যেন তিনি পুরনো কাস্টমার। এর অর্থ কী?

বিল দিতে গিয়ে ইসমাইল সাহেব দেখলেন, ম্যানেজার একটা খাতা বের করল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'আগেরগুলোও দেবেন?'

তিনি ভাবলেন কথাগুলো অন্য কাউকে বলছে। কিন্তু খাতা দেখে তাঁর আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। দেখলেন, খাতায় তাঁর নাম-ধাম লেখা। ডানে কয়েকদিনের

হিসাবপত্র। সব মিলিয়ে একশো তিরাশি টাকা পাওনা।

তিনি ঠিক করলেন, উত্তেজিত হবেন না। আশ্চর্যও হবেন না। এমন ভাব করবেন যেন কিছু হয়নি। ভাব করাটাই আসল। তারপর একসময় দেখা যাবে সব এমনি এমনি ঠিক হয়ে গেছে।

ঢাকা শহরে কম করে হলেও তিন হাজার ইসমাইল হোসেন আছে। তিনি এই রেস্টুরেন্টে আসেন না দেখে ওরাও আসবে না, তা তো হয় না। তিনি যেমন নয়া পল্টনে থাকেন, তারাও কেউ কেউ নয়া পল্টনে থাকতে পারে। কিন্তু চেহারা? চেহারা কেন মিলবে?

তিনি ম্যানেজারকে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন। আমি এই হোটেলে আগে কখনও আসিনি। এই প্রথম।'

ম্যানেজারের চোখ কপালে উঠে গেল। সে হাতটাত নেড়ে কিছু একটা বলতে গেল। কিন্তু ইসমাইল সাহেব দাঁড়ালেন না, চায়ের দাম কাউন্টারে রেখে বেরিয়ে এলেন। নষ্ট করার মতো সময় তাঁর নেই।

ব্যাংকে গিয়ে জানলেন, তাঁর চেক ফেরত এসেছে। অ্যাকাউন্টে নাকি টাকা নেই। তিনি খেপে গেলেন। অ্যাকাউন্টে টাকা নেই মানে? ফাজলামো নাকি?

'টাকা নেই মানে টাকা নেই,' সিনিয়র অফিসার নূরুদ্দিন বিরক্তমুখে বলল, 'টাকা থাকলে চেক ফেরত যায় নাকি?'

ইসমাইল সাহেব তাঁর পাসবইটা নূরুদ্দিনের মুখের উপর নাড়লেন। বললেন, 'এটা দেখেন। দেখে বলেন, আমার এই টাকা কোথায় গেল?'

নূরুদ্দিন পাসবই দেখল। দেখে কী সব হিসাব করল। মোটা একটা লেজার খুলে তার সাথে মিলাল। তারপর কাউন্টার থেকে একটা পুরানো চেক এনে এগিয়ে দিল ইসমাইল সাহেবের দিকে।

'কী এটা?' ইসমাইল সাহেব জানতে চাইলেন।

'আপনিই বলেন।'

ইসমাইল সাহেব হাত বাড়িয়ে চেকটা নিলেন। দেখলেন, চেকের গায়ে তাঁরই দস্তখত। তারিখটাও আজকের। টাকার অঙ্ক সেই কাঁপুনি থামাতে পারলেন না।

'এই টাকা কখন তোলা হল?' তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন।

নূরুদ্দিনের ভুরু কুঁচকে গেল। 'আপনি জানেন না?'

'না।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'ঠাট্টা করব কেন?'

নূরুদ্দিন সোজা হয়ে বসল। 'আপনি কখন টাকা তুলেছেন, তা আপনি জানেন না?'

'আমি টাকা তুলিনি।'

'কে তুলেছে?'

'জানি না।'

নূরুদ্দিন তর্জনী তুলে কাউন্টার দেখাল। 'কাউন্টারে যান। কে তুলেছে, জেনে আসুন।'

ইসমাইল সাহেব কাউন্টারে গেলেন না। পা টেনে টেনে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। তাঁর মাথা খালি-খালি লাগছে। মনে হচ্ছে বমি-টমি হবে। বমি হলে অবশ্য মন্দ হয় না। ওই হোটেলের চা বেরিয়ে যাবে। এসব জিনিস যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, ততই মঙ্গল।

তিনি এখন কী করবেন? থানায় খবর দেবেন? থানায় খবর দিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। ব্যাংকভর্তি লোক সাক্ষ্য দেবে, তারা তাঁকে টাকা তুলে নিয়ে যেতে দেখেছে। চেকের স্বাক্ষরও মিলে যাবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

কোনো সন্দেহ নেই এই শহরে আরেকজন ইসমাইল হোসেন আছেন। সেই ইসমাইল হোসেনের চোখে আছে এই ইসমাইল হোসেনের চশমা। তিনি রীতিমতো বাজার করছেন, অফিস করছেন, নাস্তা করছেন, ব্যাংক থেকে টাকাও তুলছেন। কিন্তু তাঁর টাইমটেবিল আলাদা। তিনি এগিয়ে আছেন অন্যজনের চেয়ে— বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ছেন আগে, অফিসে চলে যাচ্ছেন আগে, ব্যাংক থেকে টাকাও তুলছেন আগে। অন্যজন গাড়ি ফেল করে পিছিয়ে পড়ছেন। টাকা না পেয়ে ফেরত আসছেন ব্যাংক থেকে।

ইসমাইল সাহেব বুঝতে পারছেন না এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা কীভাবে ঘটছে। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? নাকি একটা কল্পনা? তিনি কি পাগল হয়ে গেছেন? পাগল হওয়ার আগে নাকি মানুষের মেমোরি গোলমাল হয়ে যায়। এটা কি তারই লক্ষণ? কিছু কিছু হেলুসিনেটিং ড্রাগ আছে, খেলে সবকিছু ডাবল দেখা যায়। তিনি কি নিজের অজান্তে তেমন কোনো ড্রাগ নিয়ে ফেলেছেন?

ইসমাইল সাহেব একরাশ চিন্তা নিয়ে অফিসে ফিরে এলেন। বসলেন নিজের টেবিলে। তাঁকে দেখে সিদ্দিক মিয়া এগিয়ে এল। অবাক হয়ে বলল, 'কোথা গিয়েছিলেন?'

'ব্যাংকে।'

'সকালেই না একবার গেলেন?'

ইসমাইল সাহেব একটা নিশ্বাস ফেললেন। এই লোকের সাথে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিছু কিছু লোক আছে, যাদের জন্ম হয়েছে সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে। সিদ্দিক মিয়া তাদের একজন। এই লোকের কৌতূহল নিবারণ করা আর

কুকুরের লেজ সোজা করা সমান কথা। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'সকালে গেলে আর দুপুরে যাওয়া যাবে না—এমন কোনো নিয়ম আছে?'

সিদ্দিক মিয়া একেবারে চুপসে গেল। নিজের কাজে যেতে যেতে বলল, 'তা নেই, তা নেই।'

লোকটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ইসমাইল সাহেবের মনে হল তিনি ভুল করেছেন। লোকটাকে সবকিছু খুলে বললেই ভালো হত। তার কাছে জানা যেত সকালবেলার সেই ইসমাইল সাহেব দেখতে কেমন, লম্বা না বেঁটে, চোখে চশমা আছে কি নেই ইত্যাদি। লোকটার সাথে কথা-টথা হয়েছে কিনা তা-ও জানা যেত। আবার ভাবলেন, না বলে ভালোই করেছেন। এসব জিনিস যত কম বলা যায়, ততই মঙ্গল। কে জানে, হয়তো এরা উল্টো তাঁকেই নকল ইসমাইল সাহেব ভেবে বসে আছে।

তিনি কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করলেন। মন বসছে না। বাসায় চলে যেতে ইচ্ছে করছে। তিনি ঘড়িতে সময় দেখলেন। মাত্র সোয়া একটা। এত তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়া যাবে না। গিয়েই বা কী করবেন? মেয়ের অ্যাডমিশনের জন্যে টাকা লাগবে। টাকা ছাড়া হাজির হবেন কোন্ মুখে?

ইসমাইল সাহেব ঠিক করলেন তিনি বাসায় যাবেন না। আগে থানায় যাবেন। থানায় গিয়ে সব খুলে বলবেন। বলা যায় না, বিশ্বাস করতেও পারে। কত অদ্ভুত কেস নিয়ে তাদের কারবার। এমনও হতে পারে তাঁর কাছে যা আজগুবি, ওদের কাছে তা জলবৎ তরলং।

ফেরার পথেও তিনি বাস ফেল করলেন। তাঁর রাগ লাগা উচিত, কিন্তু লাগছে না। মনে হচ্ছে ভালোই হয়েছে। তাঁকে অন্য জায়গায় নামতে দেখে অফিসের লোকজন অবাক হত। তাদের মধ্যে কানাঘুষা হত। কেউ কেউ জেনেও ফেলত তিনি কোথায় যাচ্ছেন। সেটা ঠিক হত না। দুই নম্বর ইসমাইল সাহেবের চর সবখানে ঘুরছে। যে লোক অন্যের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা মারতে পারে, সে চাইলে সব পারে।

মতিঝিল থানার ওসি সেকান্দার আলী কমকথার মানুষ। হাসেন আরও কম। আজ নিয়ম ভঙ্গ করে হাসলেন। হেসে জানতে চাইলেন, 'আপনার ডাক নাম কী?'

ইসমাইল সাহেব যারপরনাই হতাশ হলেন। তাঁর ধারণা ছিল এরা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর এই ধারণা ঠিক নয়। প্রশ্ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

তিনি বিরস গলায় বললেন, 'ডাকনাম দিয়ে কী হবে?'

সেকান্দার আলী বিরক্ত হলেন। 'ডাকনাম আছে কিনা বলুন।'

তিনি একবার ভাবলেন, মুখের উপর বলে দেন, 'নাই'। কিন্তু মত পাল্টালেন। কুইনাইন গেলার মত করে বললেন, 'আছে। বকুল।'

'কোন্ স্কুলে লেখাপড়া করেছেন?'

ইসমাইল সাহেব আরও মুষড়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারছেন, এরা তাঁর মুখ থেকে 'হেমায়েতপুর' জাতীয় কোন্ উত্তর বের করতে চাইছে। তিনি বললেন, 'খিলগাঁও সরকারি হাইস্কুল।'

'মেট্রিক কোন্ সালে?'

'১৯৬৩ সালে।'

এরপর যা হবার তাই হল। সেকান্দার আলী খপ্ করে ইসমাইল সাহেবের জামা খামচে ধরলেন। ইসমাইল সাহেব জানতেন, এরকম কিছু ঘটবেই। আগে হোক, পরে হোক তাঁর জামা খামচে ধরা হবে। অথবা চুল। হুঙ্কার দিয়ে বলা হবে, 'শা-আ-আ-লা, বিটলামি করার জায়গা পাও না। পুলিশের সাথে ফাজলামি?'

কিন্তু সেরকম কিছু হল না। তার পরিবর্তে যা হল, তা আরও ভয়াবহ। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে যাওয়ার চেয়েও ভয়াবহ। সেকান্দার আলী তাঁর জামার আস্তিন খামচে ধরে বললেন, 'শা-আ-লা, এখনও চিনতে পারছিস না?'

ইসমাইল সাহেব সরুচোখে তাকালেন। তিনি লোকটাকে চিনতে পারছেন না। জামার আস্তিন খামচে ধরায় তাঁর কষ্ট হচ্ছে, শ্বাস নিতে পারছেন না। যে লোক তাঁকে 'তুই' করে বলছে, তাকে 'আপনি' করে বলারও কোনো মানে হয় না। তিনি চিঁ-চিঁ করে বললেন, 'জামা ছেড়ে দে।'

সেকান্দার আলী জামা ছেড়ে দিয়ে বললেস, 'চিনতে পারছিস না, আমি সেকু।'

ইসমাইল সাহেবের বয়স হয়েছে। কোনো জিনিস বেশিক্ষণ মনে থাকে না। তবু তিনি সেকুকে চিনতে পারলেন। চিনতে পেরে অবাক হয়ে গেলেন। পুলিশের চাকরিতে গেলে মানুষের চর্বি বাড়ে শুনেছেন। সেকুর এই হাল কেন?

'তোর এই হাল কেন?'

'যমের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।' সেকান্দার আলী হাসলেন।

'কী হয়েছিল?'

'লিভার সিরোসিস,' সেকান্দার আলী হাত কলিংবেলের দিকে এগিয়ে গেল। 'কী খাবি বল? ঠাণ্ডা না গরম?'

'কিচ্ছু লাগবে না,' ইসমাইল সাহেবের মন হালকা হয়ে গেল, 'তুই শুধু আমাকে বুদ্ধি দে, কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।'

কিন্তু সেকান্দার আলীও কোনো বুদ্ধি দিতে পারলেন না। চিন্তিত মুখে বললেন, 'বুঝতে পারছি, কুয়ায় পড়েছিস। যা বললি, বিশ্বাস করাও মুশকিল। তুই না হয়ে অন্য কেউ হলে সোজা হেমায়েতপুর দেখিয়ে দিতাম।'

'এখন বিশ্বাস করছিস?'

'হ্যাঁ, করছি।'

'মুখ দেখে বোঝা যায় না।'

'মুখ দেখে বুঝবি না। এই লাইনে দশ বছর থাকলে আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আমার বিশ বছর চলছে।'

'এখন কী করব তাহলে?'

'মা-র কাছে যা।'

'ঠাট্টা করছিস?'

'ঠাট্টা করব কেন?'

'মা-র কাছে গিয়ে কী করব?'

'জানতে চাইবি, তোর কোনো জমজ-টমজ ছিল কিনা।'

'মা বেঁচে নেই।'

'বাবা?'

'বাবাও নেই।'

'খালা?'

'খালা আছে।'

'খালার কাছে যা।'

'খালার কাছে যাব কেন?' ইসমাইল সাহেব বিরক্ত হলেন। 'আমি তো জানি আমার কোনো যমজ নেই।'

সেকান্দার আলী হাসলেন। 'কখন থেকে জানিস?'

'কখন থেকে মানে?'

'তোর জন্মের সময় থেকে জানিস?'

'না।'

'কতদিন আগে থেকে জানিস?'

'চার বছর।' ইসমাইল সাহেব ভেবেচিন্তে বললেন, 'তার আগের কথা মনে নেই।'

'ওই সময় থেকে দেখলি তোর কোনো যমজ নেই, তাই না?'

ইসমাইল সাহেব কিছু বললেন না। তিনি বুঝতে পারছেন এরপর সেকান্দার আলী কী বলবে।

সেকান্দার আলী আরও দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। সঙ্গে সিগারেট।

'এখন বুঝতে পারছিস, তোর জানার ফাঁক কোথায়?'

ইসমাইল সাহেব চুপ করে থাকলেন। তাঁর মাথা ভারী ভারী লাগছে। মনে হচ্ছে ওজন বেড়ে গেছে।

'চা খা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' সেকান্দার আলী চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। নিজেও নিলেন।

'ওই লোক আমার যমজ ভাই হলে,' ইসমাইল সাহেব শেষ চেষ্টা করলেন। 'আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলবে কেন?'

'সেটা পরের প্রশ্ন। আগে প্রথম প্রশ্নের উত্তর বের কর্।'

প্রথম প্রশ্নের উত্তর বের করা সহজ হল না। মধুবাগ গিয়ে জানা গেল খালা ঢাকায় নেই। খালুর সাথে গেছে শ্রীপুর। কখন আসবে তার ঠিক নেই। ইসমাইল সাহেব ঠিক করলেন, আগামীকাল শ্রীপুর যাবেন।

তিনি বাসায় গিয়ে বড়সড় একটা ধাক্কা খেলেন। দেখলেন আলনায় তাঁর অফিসের পাঞ্জাবি ঝুলছে। পাঞ্জাবির পকেটে চশমা। দেখে তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। তিনি ভূতগ্রস্তের মতো নিজের দিকে তাকালেন। দেখলেন, নিজের গায়েও অফিসের পাঞ্জাবি। এর মানে কী?

তাঁর শরীর আরও ঠাণ্ডা করে দিয়ে রাহেলা বললেন, 'অফিসে থেকে এসে কোথায় গিয়েছিলে?'

ইসমাইল সাহেব প্রাণপণে বলতে চাইলেন, 'অফিস থেকে যে এসেছিল, সে আমি নই— অন্য কেউ।' কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। তাঁর মনে হতে লাগল ওই পাঞ্জাবির মালিক আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

রাতে শোবার সময় রাহেলা জানতে চাইলেন, 'টাকা তুলেছ?'

ইসমাইল সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'তুলেছি।'

রাহেলা আর কিছু বললেন না। একটু পরেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ পাওয়া গেল। ইসমাইল সাহেব পাশ ফিরলেন। আজ রাতে তাঁর আর ঘুম হবে না।

তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে ওই টাকাগুলো কোত্থেকে এল?

আলী রিয়াজের চোখে ঘুম নেই। তিনি আজ পড়ছেন 'কঙ্কালের রাজ্য শাসন'। মৃত্যুর পরও রাজ্য শাসন করেছিলেন এক রাজা। সৈন্য নিয়ে অতিক্রম করেছিলেন ১৫০০ মাইল পথ। এ ঘটনা ঘটেছিল ২৮৩ সালের রোমে।

পড়তে পড়তে আলী রিয়াজ ঘড়ি দেখলেন। দুটো বেজে চল্লিশ। অন্যদিন এতক্ষণে ঘুম চলে আসে। আজ কেন যেন আসছে না।

সেকান্দার আলী ধাঁধায় পড়ে গেলেন।

তাঁর হাতে একটা রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট তৈরি করেছে খান আরিফুর রহমান। লোকটা তাঁর শালা হয়। শালা-দুলাভাইয়ের মধ্যে একপ্রকার ঠাট্টার সম্পর্ক থাকে। এই রিপোর্টটাও সেরকম ঠাট্টা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি রিপোর্টটা আরও একবার পড়লেন। এই নিয়ে চতুর্থবার। তাঁর নিজের উপরই অসম্ভব রাগ লাগছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই চেকের দস্তখত ইসমাইল সাহেবেরই— অন্য কারও নয়।

তার মানে ইসমাইল সাহেব নিজেই নিজের টাকা ব্যাংক থেকে মেরে দিয়েছেন। নিজেই নিজের চশমা দোকান থেকে নিয়ে গেছেন। তারপর থানায় এসে আলিফলায়লার গল্প ফেঁদেছেন; উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর বুদ্ধি করেছেন।

সেকান্দার আলী দুম করে টেবিলে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন। দুই নম্বর, সব দুই নম্বর। দুনিয়াটাই হয়ে গেছে দুই নম্বর। তা না হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপোর্টের রিপোর্ট এরকম হবে কেন? তিনি বিরক্তির সাথে একটা সিগারেট ধরালেন। এই লোকের কাছে রিপোর্ট চাওয়াই উচিত হয়নি।

লিজা অবাক হয়ে গেল।

স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওটা কে? বাবা না? লিজা দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল।

'বাবা?'

ইসমাইল সাহেব হাসলেন। ছেলেমানুষি হাসি।

'তোর সাথে ক্লাস করতে এলাম, মা।'

লিজার কানে সেই গলা বেজে উঠল। শৈশবে স্কুলে পড়ার সময় রোজ অফিস পালিয়ে বাবা এসে হাজির হত। ছেলেমানুষি গলায় বলত, 'তোর সাথে ক্লাস করতে এলাম, মা।'

লিজা আনন্দ চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারল না। গলায় কৃত্রিম রাগ নিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই অফিস থেকে চলে এসেছ?'

'তাতে কী?'

'লোকে দেখলে কী বলবে? আমি কি স্কুলে পড়ি?'

'স্কুলই তো,' ইসমাইল সাহেব বললেন। 'বিদেশে এটাও...

'হয়েছে। যাও, অফিসে যাও।'

'তোর ক্লাস শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাসায় যাবি না?'

'যাব।'

'চল্, তোকে বাসায় দিয়ে যাই।'

লিজা একমুহূর্ত ভাবল। 'ঠিক আছে, চলো।'

প্রফেসব আলী রিয়াজ বইয়ের মাঝামাঝি চলে এসেছেন। আজ পড়ছেন মিশরীয়

মমির অভিশাপের গল্প। প্রাচীন মিশরের ফারাও তুতেনখামেনের অভিশাপে অনেকের জীবন কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তার গল্প। ফারাও তুতেনখামেনের সমাধি আছে লাকসোর-এর কাছে। সেই সমাধির গায়ে লেখা আছে 'যারা ফারাওদের ঘুম নষ্ট করবে, মৃত্যু তাদের অনিবার্য।' এই রহস্যময় সমাধি তৈরি হয়েছিল তিন হাজার বছর আগে। এরপর থেকে যারা এই সমাধিতে প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন দুঃখ। উনিশ শতকের শেষদিকে আর্থার উইগল নামের এক লোক ফারাওয়ের কফিন দিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে। কফিনটি পাওয়ার পরপরই আর্থারের বন্দুক থেকে গুলি ছিটকে আসে। সেই গুলিতে তার একটি হাত জখম হয়। কফিনবাহী জাহাজটিও ধ্বংস হয়ে যায়। কফিনটি উদ্ধার করে যে বাড়িতে রাখা হয়, সেই বাড়িতে লাগে আগুন। এক ফটোগ্রাফার কফিনের ছবি তুলেছিলেন। তিনি আত্মহত্যা করেন। এসব ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে চাননি লর্ড কারনারভন। তিনি ছিলেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। তিনি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সমাধির দরজা খুলে ফেলেন। এরপর দুমাসের মধ্যে কায়রোর এক হোটেলে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

আলী রিয়াজের ইচ্ছে হল হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হাসেন। বুজরুকি, সব বুজরুকি। পাঠক ঠকিয়ে পয়সা আদায়ের ফিকির। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সবগুলোই দুর্ঘটনা কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যু। কায়দা করে সাজিয়ে রহস্য বানানো হয়েছে।

সিদ্দিক মিয়ার মনে হল চোখে ভুল দেখছে। সে চোখ পিটপিট করল। কিন্তু লাভ হল না। দৃশ্য যা ছিল তাই থাকল।

সে দেখল সিদ্ধেশ্বরীর মোড়ে একটি রিকশা। রিকশায় একজোড়া নারীপুরুষ। পুরুষটির বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, মেয়েটির বাইশ-তেইশ। রিকশা এগিয়ে আসছে।

সিদ্দিক মিয়া একটা ঢোক গিলল। তার গলা শুকিয়ে আসছে। কেমন ভয়-ভয়ও লাগছে। ওই পুরুষলোকটি তার চেনা। চেনা লোকের জন্যে কারও ভয় থাকে না। কিন্তু সিদ্দিক মিয়ার ভয় লাগছে। অজানা ভয়।

রিকশায় ওই লোকটা কে? ইসমাইল সাহেব? ইসমাইল সাহেব কোথায় যাচ্ছেন? সঙ্গে ওই মেয়েটি কে? যদি এই লোক ইসমাইল সাহেব হন, তাহলে অফিসে যাকে দেখে এসেছে, তিনি কে?

ভাবতে ভাবতেই সিদ্দিক মিয়া হেসে ফেলল। কি যা-তা ভাবছে? তার যদি জরুরি কাজ থাকে, অন্যের থাকতে পারে না? একশোবার পারে। ইসমাইল সাহেবও হয়তো কোনো জরুরি কাজে বেরিয়েছেন।

সিদ্দিক মিয়া পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা হাত নাড়ল। কিন্তু ইসমাইল সাহেব খেয়াল করলেন না। তিনি মেয়েটির সাথে বিরতিহীন কথা বলে চলেছেন।

সেকান্দার আলী থানায় ছিলেন না। তদন্তের কাজে গিয়েছিলেন কাকরাইল। ফিরে এসে ইসমাইল সাহেবের ফোন পেলেন।

'হ্যালো!'

'আবার বেরুবি?' ইসমাইল সাহেব জানতে চাইলেন।

'না, কেন?'

'আমি আসছি।' সেকান্দার আলীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ইসমাইল সাহেব ফোন রেখে দিলেন।

'স্যার?' দরজায় সেপাইয়ের গলা শোনা গেল।

চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন সেকান্দার আলী। চোখ না খুলেই জানতে চাইলেন, 'কী?

'এক লোক দেখা করতে চায়।'

সেকান্দার আলী যারপরনাই বিরক্ত হলেন। 'কোথেকে এসেছে?'

'দিলকুশা থেকে।'

সেকান্দার আলীর বুকের রক্ত ছলকে উঠল। দিলকুশা থেকে! ইসমাইল সাহেবের অফিসও তো দিলকুশায়। তিনি ঘড়ি দেখলেন। এত তাড়াতাড়ি কোনোভাবেই পৌঁছানোর কথা নয়। তবে কি...?

'চেহারা কেমন?'

সেপাই চেহারার বর্ণনা দিল। সেকান্দার আলীর মুখ একটু একটু করে ঝুলে পড়তে লাগল। ইসমাইল সাহেবের সাথে চেহারাও মিলে যাচ্ছে! তিনি এখন কী করবেন? লোকটাকে ডাকবেন? যদি দুই নম্বর ইসমাইল সাহেব হয়...

'ডাকো।' তিনি যেন মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন।

দরজায় একটা আকৃতি এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে সেকান্দার আলীর সমস্ত উৎসাহ দপ করে নিভে গেল। না, ইসমাইল সাহেব নয়-অন্য কেউ। তবে ইসমাইল সাহেবের সাথে বয়সের মিল আছে। পোশাকেও মিল আছে।

'আপনি?'

'জ্বি, আমার নাম মীর মনোয়ার আলী।'

সেকান্দার আলী বলতে চাইলেন, 'আমার কাছে কী দরকার?' কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। এবার মনে পড়ছে। স্টাফ অফিসার। একে পাঠানোর জন্যে ব্যাংকে ফোন করেছিলেন।

'সোনালি ব্যাংক থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

সেকান্দার আলী চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। 'বসুন।'

মীর মনোয়ার আলীর সাথে কথা বলতে বলতেই আবার ফোন এল। কেন যেন

সেকান্দার আলীর মনে হল এই ফোন ইসমাইল সাহেবের। তাঁর মন আশঙ্কায় কেঁপে গেল।

'কী হল? আসবি না?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে,' ইসমাইল সাহেবের গলা ভেঙে গেল।

সেকান্দার আলী সোজা হয়ে বসলেন। 'কী হয়েছে?'

'মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

ওপাশ থেকে কোনো উত্তর এল না। সেকান্দার আলীর মনে হল ইসমাইল সাহেব কাঁদছেন।

লিজার চোখে যেন পলক পড়ছে না। সে হাঁ হয়ে পাখিগুলো দেখছে। কেমন উজ্জ্বল সোনালি পাখা, রঙিন ঠোঁট। গোলাপি পা। দেখলে মনে হয় আসল পাখি। বারবার হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ঢাকার মধ্যেই এমন সুন্দর জায়গা আছে, ওর জানা ছিল না।

'কি, কেমন লাগে?' ইসমাইল সাহেব জানতে চাইলেন।

লিজা কিছু বলল না। আড়চোখে একবার ঘড়ি দেখল। ওর ইচ্ছে করছে এখানেই থেকে যেতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। রাত হয়ে যাচ্ছে। ওদের ফিরতে হবে। বাবা যদিও সাথে আছে, কিন্তু মা চিন্তা করবে। মাকে তো আর বলে আসা হয়নি।

সেকান্দার আলী বুঝতে পারছেন না তিনি কার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁর চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ইসমাইল সাহেব বলছেন, তিনি অফিস থেকে সোজা থানায় এসেছেন, অন্য কোথাও যাননি। ইসমাইল সাহেবের স্ত্রী বলছেন, ইসমাইল সাহেব অফিস থেকে প্রথমে বাসায় এসেছেন, তারপর অন্য কোথাও গেছেন। সিদ্দিক মিয়া বলছেন, তিনি বিকেল তিনটায় ইসমাইল সাহেবকে একটি মেয়ের সাথে সিদ্ধেশ্বরীর মোড়ে রিকশায় দেখেছেন। ইসমাইল সাহেব বলছেন, তিনি ওই সময় অফিসে বড় সাহেবের কামরায় ছিলেন। মীর মনোয়ার আলী বলছেন, তিনি ইসমাইল সাহেবকে সেদিন দুবার ব্যাংকে আসতে দেখেছেন। ইসমাইল সাহেব বলছেন, তিনি সেদিন একবারই ব্যাংকে গিয়েছিলেন। ঠাটারিবাজারের দোকানদার বলছে, ইসমাইল সাহেব তার কাছ থেকে চশমা ফেরত নিয়ে গেছেন। ইসমাইল সাহেব বলছেন, তিনি চশমা ফেরত নেননি। 'ক্যাফে মতিঝিল'-এর ম্যানেজার বলছেন, ইসমাইল সাহেব নিয়মিত ওই রেস্টুরেন্টে নাশতা করেন। ইসমাইল সাহেব বলছেন, তিনি আগে কখনও সেই রেস্টুরেন্টে যাননি।

এই গোলকধাঁধার দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে— এক. ইসমাইল সাহেব মিথ্যে

বলছেন; দুই. এই লোকগুলো মিথ্যে বলছে। একদিকে এতগুলো লোক, অন্যদিকে ইসমাইল সাহেব একা। অতএব ইসমাইল সাহেবেরই মিথ্যে বলার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সত্যিই কি তিনি মিথ্যে বলছেন?

সেকান্দার আলীর চোখের সামনে একটি মুখ ভেসে উঠল। সেই মুখে শিশুর সারল্য। ঠোঁটে বোকা-বোকা হাসি। সেকান্দার আলী অসহায় বোধ করলেন। লোকটাকে তিনি শৈশব থেকে চেনেন। এই লোক মিথ্যে বলবে, এটা তার শত্রুও বিশ্বাস করবে না। আবার সত্য বললে যা নয়, তাই বিশ্বাস করতে হবে। তিনি কোন্দিকে যাবেন?

সেকান্দার আলী ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। ধরা যাক, ইসমাইল সাহেব মিথ্যে বলছেন না; যা বলছেন, সত্যি বলছেন। এই শহরে, যেভাবেই হোক আরেকজন ইসমাইল সাহেব এসে হাজির হয়েছেন। সেক্ষেত্রে এই ভয়ংকর ঘটনা কী কী কারণে ঘটতে পারে?

তিনি মনে মনে সম্ভাবনাগুলো সাজিয়ে ফেললেন। তারপর শুরু করলেন পরীক্ষা। প্রথমেই হাত দিলেন যমজের ব্যাপারে। যদি ইসমাইল সাহেবের কোনো যমজ ভাই থাকে, তাহলে এমন ঘটনার সম্ভাবনা বাতিল করতে হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইসমাইল সাহেবের কোনো ভাই-ই ছিল না।

দুই নম্বরে আসে ছদ্মবেশ। নিখুঁত ছদ্মবেশ নিলে নকল ইসমাইল সাহেব বানানো পানির মতো সহজ। কিন্তু গলা? গলা কি এমন নিখুঁত হবে যে তাঁর স্ত্রীও ধরতে পারবে না? এটা অসম্ভব। স্বাক্ষর দিয়েও বড়জোর সাধারণের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে ফাঁকি দেবে কী করে?

সবচেয়ে বড় কথা, কেউ বিনাকারণে ছদ্মবেশ নেয় না। একটা মোটিভ থাকতে হয়। এখানে ছদ্মবেশ নেয়ার মোটিভ কী? ব্যাংক থেকে টাকা তোলা? তাহলে সেই টাকা ফেরত দেয়া হল কেন?

তিন নম্বরে আসে ক্লোনিং। ক্লোনিং নিয়ে গোটা দুনিয়ায় হৈ-চৈ চলছে। এটা দিয়ে নাকি মানুষ, গরু, ভেড়া সব ক্লোন করা যায়। কোনো এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী (নামটা তাঁর মনে নেই, উইল-টুইল কিছু হবে) দলবল নিয়ে একটি বয়স্ক ভেড়ার ডিএনএ থেকে অবিকল একটি মেষশিশুর জন্ম দিয়েছেন। ইসমাইল সাহেবের ঘটনা শুনে সেকান্দার আলীর মনেও প্রশ্ন জেগেছিল এটা কি সেই ক্লোনিং? তিনি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে প্রফেসর আলী রিয়াজের কাছে গিয়েছিলেন। আলী রিয়াজ তাঁর প্রতিবেশী। মাসখানেক আগে রিটায়ার করেছেন। সেকান্দার আলীর কথা শুনে তিনি তো হেসেই খুন। একজন বয়স্ক মানুষ থেকে আরেকজন বয়স্ক মানুষ ক্লোন করা যায় না—এটা তিনি সেকান্দার আলীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেকান্দার আলী নিজেও কম লজ্জা পাননি। কত ভুল ধারণা যে মানুষের থাকে!

চেহারার মিল নিয়েও একই কথা বলা যায়। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দুজন লোকের চেহারার মিল থাকতেই পারে। তারমানে এই নয় যে, তাদের নাম, ধাম, পিতার নাম, বয়স, পোশাক সব মিলে যাবে। এমনকি হাতের লেখাও।

সেকান্দার আলী পায়চারি থামিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে, তারমধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে। তিনি এখন সেই 'কিন্তু'টা দেখতে পাচ্ছেন। যারা ইসমাইল সাহেবকে দেখেছে, তারা সবাই একজনকেই দেখেছে। একই সময়ে দুজন ইসমাইল সাহেব কেউ দেখেনি। কেউ বলছে, সে ইসমাইল সাহেবকে অমুক জায়গায় দেখেছে। ইসমাইল সাহেব প্রতিবাদ করে বলছেন, না, তিনি তখন অন্য জায়গায় ছিলেন। কিন্তু একই সময়ে ইসমাইল সাহেবকে দু-জায়গায় দেখেছে, এমন দুজন লোকও কি পাওয়া যাবে? যাবে না। তাহলে কি দাঁড়াল? দুজন ইসমাইল সাহেবের গল্প একটা গাঁজাখুরি, বানোয়াট গল্প।

সেকান্দার আলী সিগারেট টানছেন, কিন্তু মজা পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে বিড়ালের গু খাচ্ছেন। তাঁর একজনের কথা মনে পড়ছে। আজমল হুদা— ইসমাইল সাহেবের অফিসের এমডি। ইসমাইল সাহেব বলছেন, তিনি মঙ্গলবার বেলা তিনটায় আজমল হুদা সাহেবের কামরায় ছিলেন। সিদ্দিক মিয়া বলছেন, তিনি ওই সময় ইসমাইল সাহেবকে সিদ্ধেশ্বরীর মোড়ে রিকশায় দেখেছেন। এটা যদি ঠিক হয়, তাহলে সিদ্দিক মিয়া ও আজমল হুদা হবেন এমন দুজন ব্যক্তি, যারা একই সময়ে ইসমাইল সাহেবকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখেছেন।

সেকান্দার আলী ফোনের রিসিভার তুললেন। তিন মিনিট পর আজমল হুদা সাহেবের অফিসে ফোন বেজে উঠল। তিনি ফোন ধরলেন।

'হ্যালো!'

'আজমল হুদা সাহেব বলছেন?'

'জি, বলছি।'

ঠিক সেই সময় একজন ইসমাইল সাহেব স্কুটার চেপে হাজির হলেন মতিঝিল থানায়। স্কুটারের ভাড়া মেটালেন। অন্যজন একটা মোটাসোটা ফাইল নিয়ে এসে ঢুকলেন আজমল হুদা সাহেবের কামরায়। ঘড়িতে তখন বেলা তিনটা দশ।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ হায়দার সোজা হয়ে বসলেন।

'তোমায় দেখায় ভুল নেই তো?'

লিজা মাথা নাড়ল।

'তুমি শিওর?'

'একশো ভাগ শিওর।'

সৈয়দ হায়দার আবার হেলান দিলেন। হেলান দিয়ে বললেন, 'কিন্তু তোমার বাবা বলছেন...'

'তিনি ভুল বলছেন,' লিজার গলা তীক্ষ্ণ শোনাল।

'ভুল বলে ওনার কী লাভ?'

'কোনো লাভ নেই,' লিজা স্বীকার করল।

'তাহলে?'

'আমার ধারণা...' লিজা থেমে গেলে।

'থামলে কেন, বলো?' সৈয়দ হায়দার অভয় দিলেন।

'আমার ধারণা, বাবার কোনো মানসিক সমস্যা হয়েছে।'

'কীরকম?'

'তিনি হঠাৎ হঠাৎ সবকিছু ভুলে যাচ্ছেন।'

মনোয়ার আলীও সেরকম ভাবলেন। তিনি ভাবলেন ব্যাংক থেকে ফেরার পর ইসমাইল সাহেবের এমন কিছু হয়েছে, যার ফলে তিনি সকালের কথা ভুলে গেছেন। সম্ভবত মাথায় বাড়ি-টাড়ি খেয়েছেন। তিনি সেকান্দার আলীকে তাঁর এই সন্দেহের কথা জানালেন।

সেকান্দার আলী অবাক হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'এই জিনিস আপনি নিজে নিজে বের করেছেন, নাকি কেউ হেল্প করেছে?'

মীর মনোয়ার আলীর সবগুলো দাঁত বের হয়ে গেল। আসলে তিনি নিজে বের করেননি। ক্যাশিয়ার হেল্প করেছে। কিন্তু তা আর বললেন না।

'ব্যাংক থেকে ফেরার পথে মাথায় চোট-টোট পেয়েছে, কি বলেন?'

'জি।'

'চোট পেয়েই সকালের ঘটনা ভুলে গেছে, ঠিক না?'

'জি, জি।'

'তবে কম চোট পাওয়ায় আপনার নামটা আর ভুলতে পারেনি।'

মনোয়ার আলীর চোখ ছোট ছোট হয়ে এল। তিনি সেকান্দার আলীর মেজাজ-মর্জি বোঝার চেষ্টা করছেন। লোকটা কি রসিকতা করছে?

'মনোয়ার আলী সাহেব।'

'জি!'

'এই বুদ্ধি নিয়ে রাতে ঘুমান কী করে?'

প্রফেসর আলী রিয়াজ ঘড়ি দেখলেন। রাত কম হয়নি। দুটো বেজে দশ মিনিট। আরও বেশিই হবে। এই ঘড়ি সাত মিনিট স্লো। তিনি 'বিলিভ ইট অর নট'-এর পাতা

ওল্টালেন। গল্পের শেষভাগে চলে এসেছেন। গল্পের নাম 'মরণের সাথী'।

আড়াইটার দিকে গল্প শেষ হল। আলী রিয়াজ অস্বস্তির সাথে বিছানায় গেলেন। মনটা খুঁতখুঁত করছে। কী যেন মনে পড়তে গিয়েও পড়ছে না। মনে হচ্ছে এই গল্পের সাথে কোথাও কারও মিল আছে। কার মিল আছে?

আলী রিয়াজ বাতি নিভিয়ে দিলেন। তাঁর মাথা গরম হয়ে গেছে। বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডা হতে পারে। আসলে এসব বই একটানা না-পড়াই ভালো। পড়লে লজিক এলোমেলো হয়ে যায়। যেমন তাঁর হচ্ছে। নইলে এই গল্পের সাথে কারও মিল খুঁজতে যাবেন কেন?

রাত তিনটার দিকে আলী রিয়াজ উঠে পড়লেন। উঠে বাতি জ্বালালেন। 'বিলিভ ইট অর নট'-এর সেই গল্পটা আবার বের করলেন। গল্পের নাম 'মরণের সাথী'।

এখন মনে পড়ছে। মতিঝিল থানার ওসি তাঁকে একটা কেস বলেছিল। ইসমাইল হোসেন নামক এক লোকের কেস। এই গল্পের সাথে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে?

তিনি গল্পটা পড়তে লাগলেন। গল্প বেশি বড় নয়, ছোট। এক রোমান চিত্রশিল্পীর কাহিনী। চিত্রশিল্পীর নাম জোসেফ এম. এইগনার। এইগনার যখনই মরতে যায়, তখনই অন্য এক লোক এসে তাঁর জীবন রক্ষা করে। একবার দুবার নয়, তিনবার। সেই অন্য লোকের নামও এইগনার। তাদের দুজনের কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না।

ইসমাইল হোসেনের ঘটনাও কি তাই? একই নামের, একই চেহারার দুজন ইসমাইল হোসেন কি আছে এই ঢাকা শহরে? থাকলে তাদের দেখা হয় না কেন? তারা কি টাইমটুইন?

কখনও কখনও দেখা যায়, যমজ না হয়েও মানুষের চেহারা মিলে যায়। প্রকৃতিও মিলে যায়। এদের বলা হয় টাইমটুইন। তারা একই তারিখে, একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বাপ-মা আলাদা হওয়ায় অনেক সময় তাদের দেখা হয় না। যদিও কখনও দেখা হয়েই যায়, সে কাহিনী নাটক-নভেলকেও হার মানায়। স্থান পায় অলৌকিক ঘটনার তালিকায়। যেমন, ইতালির সেই রাজা ও নাপিতের গল্প।

আলী রিয়াজ মনে করার চেষ্টা করলেন। কী যেন নাম ছিল সেই রাজার? ঠিক মনে পড়ছে না। সালটাও মনে পড়ছে না। দেশটাও ইতালি কিনা কে জানে। রাজার যে নাম, নাপিতেরও ছিল সেই নাম। চেহারাও একরকম। উভয়ের জন্ম হয়েছিল একই সময়ে, মৃত্যুও একই সময়ে। এ ঘটনার কি কোনো ব্যাখ্যা আছে?

না, নেই। তার দরকারও নেই। ইসমাইল হোসেনের ঘটনা আর এই রাজার ঘটনা এক নয়। রাজা ও নাপিতের পিতা ছিল আলাদা, মা-ও আলাদা, ঠিকানাও আলাদা। কিন্তু ইসমাইল হোসেনের বেলায় এসে দেখা যাচ্ছে, তাদের নাম-ধাম ঠিকানা সব এক। পিতার নামও এক।

আলী রিয়াজ অ্যান্টিম্যাটারের কথা ভাবলেন। অ্যান্টিম্যাটার হল কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর বিপরীত বস্তু যার ভর প্রথম বস্তুটির সমান। চার্জও সমান। কিন্তু চার্জ সম্পূর্ণ উল্টো-নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ আর পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ। কোনো বস্তু অ্যান্টিম্যাটারের সংস্পর্শে এলেই বিস্ফোরণ ঘটে এবং উভয়ের অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডাইরাক ১৯২৮ সালে প্রথম অ্যান্টিম্যাটারের অস্তিত্ব দাবি করেন। অঙ্ক কষে তিনি প্রমাণ করেন মহাবিশ্বে অবশ্যই অ্যান্টিইলেকট্রনের অস্তিত্ব আছে এবং থাকতেই হবে। কারণ, ইলেকট্রনের একক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যেখানে ইলেকট্রন আছে, সেখানেই আছে অ্যান্টিইলেকট্রন। এরা পরস্পর সমান, কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির। অ্যান্টিইলেকট্রন না থাকলে ডাইরাকের সেই অঙ্ক মিলত না।

ডাইরাকের বক্তব্য প্রথম প্রথম কারও কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু চার বছর পর পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা কসমিক রশ্মির মধ্যে অ্যান্টিইলেকট্রনের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রমাণিত হল ডাইরাকের বক্তব্য নির্ভুল। সেই অ্যান্টিইলেকট্রনের নাম দেয়া হয় পজিট্রন। দেখা গেল, ইলেকট্রনের সাথে অ্যান্টিইলেকট্রনের কোনো তফাত নেই। উভয়েই নিউক্লিয়াসকে আবর্তন করে। কেবল তফাত হল ইলেকট্রন একটি ঋণাত্মক এবং অ্যান্টিইলেকট্রন একটি ধনাত্মক কণিকা।

পঞ্চাশের দশকে এল অ্যান্টিপ্রোটন। দেখা গেল প্রোটনের চার্জ যেখানে পজিটিভ, সেখানে এই অ্যান্টিপ্রোটনের চার্জ নেগেটিভ। তারপর একে একে আবিষ্কার হল অ্যান্টিনিউট্রন, অ্যান্টিমিউওন, অ্যান্টিকোয়ার্ক। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যখনই কোনো ম্যাটারের সাথে অ্যান্টিম্যাটারের সাক্ষাৎ ঘটছে, তখনই আলোর ঝলকানির আকারে শক্তির বিস্ফোরণ ঘটছে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে অদৃশ্য করে দিচ্ছে।

প্রফেসর আলী রিয়াজ গ্লাসে পানি ঢাললেন। তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে। বস্তুর যদি প্রতিবস্তু থাকে, মানুষের প্রতিমানুষ থাকবে না কেন? কেউ যদি সেই প্রতিমানুষ বানানোর চেষ্টা করে? তিনি ঢক ঢক করে একগ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন। তাঁর শেষ ক্লাসে কে যেন এই প্রশ্ন করেছিল। কে করেছিল? এখন মনে পড়ছে না।

অ্যান্টিম্যাটার বানাতে গেলে ল্যাবরেটরি লাগে। সেই ল্যাবরেটরিতে বস্তুকণা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, কখন প্রতিবস্তুকণার সাথে তার সংঘর্ষ ঘটে। এজন্য কিছু অ্যান্টিইলেকট্রনকে অ্যান্টিপ্রোটনের চারপাশে পজিট্রন দিয়ে ঘোরাতে হয়। আলোর ঝলকানি দেখলেই বুঝতে হয় অ্যান্টিম্যাটারের সাথে তার মিলন হয়েছে। কিন্তু প্রতিমানুষের বেলায়! এতবড় গোপন ল্যাবরেটরি এই ঢাকা শহরে কোথায় পাবে?

আলী রিয়াজের কপালে ঘাম জমছে। তিনি বুঝতে পারছেন, কেন দুজন ইসমাইল হোসেন এক অফিসে যায়, এক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলে, একজনের চশমা অন্যজন ফেরত নিয়ে যায়। এটা সেকান্দার আলীকে জানাতে হবে। এখনই। হাতে আর সময় নেই। আলী রিয়াজ কাপড় পরতে লাগলেন। এসব জিনিস ফোনে

না-বলাই ভালো।

আলী রিয়াজের সেই ছাত্রের হাতেও সময় নেই। সে চটপট তার কাজে হাত লাগাল। উপায় নেই। স্যারের বিদ্যা স্যারের উপরই ঝাড়তে হবে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

মিনিট তিনেকের মধ্যে আরেকটা আলী রিয়াজ তৈরি হয়ে গেল। এবার কোনো গোলমাল হল না। ইসমাইল হোসেনের বেলায় গোলমাল হয়েছিল। টাইমটেবিল হয়েছিল দুটো। কারও সাথে কারও দেখা হত না। এবার আর সেরকম হবে না। আলী রিয়াজের ছাত্র ঘড়ি দেখল। উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে। এখন থেকে দশ মিনিটের মধ্যে দুজনের সাক্ষাৎ হবে। তারপর?

প্রফেসর আলী রিয়াজ কাপড় পাল্টালেন। তাঁর দরজার উল্টোদিকে সেকান্দার আলীর দরজা। সেকান্দার আলী এখন কী করছে? ঘুমুচ্ছে? নাকি জেগে আছে? ঘুমানোর সম্ভাবনাই বেশি। রাত একেবারে কম হয়নি।

তিনি দরজা খুলতে গিয়ে হাত নামিয়ে আনলেন। দরজায় শব্দ হচ্ছে। কেউ টুকটুক করে টোকা দিচ্ছে। কে টোকা দিচ্ছে? সেকান্দার আলী, নাকি অন্য কেউ? টোকা এত পরিচিত লাগছে কেন?

একসময় আলী রিয়াজ দরজাটা খুলে ফেললেন।

শাহেদ ইকবাল

ডাইনি

ইরমাকে দেখে মোটেই ডাইনি মনে হয় না।

ছোটখাটো গড়ন মেয়েটির, দুধে-আলতা গায়ের রং, সুন্দর একজোড়া নীল চোখ আর ধূসর-সোনালি চুল। তাছাড়া, বয়স মাত্র আট বছর।

'উনি মেয়েটাকে সারাক্ষণ খোঁচান কেন?' ফোঁপাচ্ছেন মিস প্যাল। 'উনিই চিন্তাটা ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন—ওকে খুদে ডাইনী বলে ডেকে ডেকে।'

স্যাম স্টিভার তাঁর হোঁতকা দেহখানা পেছনদিকে এগিয়ে দিতে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল সুইভেল চেয়ারে। কোলের ওপর গোদা হাত দুখানা জড়ো করলেন ভদ্রলোক। উকিলসুলভ গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে রাখলেও ভেতর ভেতর খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

মিস প্যালের মতো মহিলাদের ফোঁপানো উচিত নয়। এতে তাদের চশমা সরে যায়, পাতলা নাক বেঁকে যায়, লাল হয়ে ওঠে ভাঁজ-পড়া চোখের পাতা, অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে তারের মতো চুল।

'আপনি দয়া করে একটু শান্ত হোন,' মিষ্টি সুরে বললেন স্যাম স্টিভার। 'পুরো ব্যাপারটা আমাকে খোলাসা করে বলুন—'

'আমি পরোয়া করি না!' নাকিসুরে বলে উঠলেন মিস প্যাল। 'আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছি না। এ আমার সহ্য হয় না। আমার হাত-পা বাঁধা। ভদ্রলোক আপনার ভাই, আর ওই মেয়ে আপনার ভাতিজি। আমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা—'

'অবশ্যই করেছেন,' মধুর হাসলেন স্যাম স্টিভার, ভাবখানা এমন যেন মিস প্যাল জুরিদের ফোরম্যান। 'সবই বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু এখনও মাথায় ঢুকছে না, আপনি এত উত্তেজিত কেন।'

মিস প্যাল চশমা খুলে ফুলের নকশা আঁকা রুমালে চোখ মুছলেন। তারপর ভেজা পিণ্ডটা পার্সে পুরে, কট করে ক্যাচ লাগিয়ে, চশমা যথাস্থানে বসিয়ে, সিধে হয়ে বসলেন।

'আপনার ভাইয়ের চাকরি কেন ছাড়ছি বলি আপনাকে,' বললেন তিনি।

নাক টানতে যাচ্ছিলেন, শেষ মুহূর্তে থামলেন।

'দুবছর আগে জন স্টিভারের বিজ্ঞাপনের জবাবে হাউজকিপারের চাকরিটা নিই আমি। এ তো জানাই আছে আপনার। মা-মরা এক বাচ্চার দায়িত্ব নিতে হবে শুনে প্রথমটায় হতাশ হয়ে পড়ি। বাচ্চা দেখাশোনার কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না।'

'প্রথম ছয় মাস একজন নার্স রাখে জন,' মাথা নেড়ে বললেন স্যাম স্টিভার। 'ইরমার মা, জানেনেই তো, ওর জন্মের সময় মারা যায়।'

'জানি আমি,' কাটা কাটা জবাব দিলেন মিস প্যাল। 'ওরকম একটা দুঃখী বাচ্চার জন্যে সবারই মন কাঁদবে। আহা, বেচারি কী যে নিঃসঙ্গ ছিল, মি. স্টিভার-যদি দেখতেন, মনমরার মতো ঘুরে বেড়াত ওই বিশ্রী বাড়িটার আনাচে-কানাচে—'

'দেখেছি,' তড়িঘড়ি বলে উঠলেন স্যাম স্টিভার, আরেকটি বিস্ফোরণ পণ্ড করার আশায়। 'আর ইরমার জন্যে আপনি কতখানি করেছেন তাও আমার জানা। আমার ভাইটার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম, খানিকটা স্বার্থপরও বটে। বুঝতে চায় না।'

'উনি ভয়ানক নিষ্ঠুর,' আচমকা খেপে উঠে ঘোষণা দিলেন মিস প্যাল। 'নিষ্ঠুর আর খল প্রকৃতির। আপনার সামনেই বলছি উনি বাবা হওয়ার যোগ্য নন। আমি যখন গেছি, বাচ্চাটার দুই হাতে মারের কালসিটে ছিল। উনি বেল্ট দিয়ে—'

'জানি। ও আসলে বউয়ের মৃত্যুটাকে এখনও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই আপনি কাজটা নেয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।'

'চেষ্টা করেছিলাম,' প্যান-প্যান করে বললেন মিস প্যাল। 'আপনি তা জানেনও। দুবছরে, উনি বারবার বলার পরও, একটিবার হাত তুলিনি মেয়েটার গায়ে। "ডাইনিটাকে কষে দু'ঘা লাগান", বলতেন উনি। "ওর আসলে তেল বেড়েছে-আচ্ছা মতন প্যাঁদানো দরকার।" আর বাচ্চাটা তখন আমার পেছনে আড়াল নিয়ে ওকে বাঁচাতে বলত। কিন্তু আশ্চর্য! কাঁদত না এতকিছুর পরেও। জানেন, মি. স্টিভার, ওকে কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি আমি।'

স্যাম স্টিভার ঈষৎ বিরক্ত আর ক্লান্ত। ধাড়ি মুরগিটা আপনা থেকেই বকে যাবে কামনা করছেন। স্মিত হেসে উস্কে দিলেন তিনি। 'কিন্তু আপনার সমস্যাটা কী, ডিয়ার লেডি?'

'সবকিছু ঠিকঠাক ছিল প্রথম যখন গেলাম। চমৎকার বনিবনা হয়ে গেল দু'জনের। ইরমাকে পড়াতে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড, আগে থেকেই পড়তে পারে। আপনার ভাই নাকি ওকে শেখাননি, কিন্তু ও একটা বই নিয়ে সোফায় গুটিসুটি মেরে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা পার করত। "খুদে ডাইনিটা কারও সাথে মেশে না, খেলাধুলা করে না। ডাইনি কোথাকার।" উনি এসবই বলতেন সবসময়, মি. স্টিভার।

'ওকে একদিন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ওল্টাতে দেখে আমি তো তাজ্জব।

কী পড়ছে জানতে চাইলে দেখাল। ডাকিনীবিদ্যার ওপর একটা লেখা।

'বাপের অবহেলা কোথায় ঠেলে দিয়েছে ওকে বুঝে দেখুন। সাধ্যমতো চেষ্টা করি আমি ওকে স্বাভাবিক করতে। বেশকিছু খেলনা এনে দিই, তারমধ্যে অবিশ্যি একটাও পুতুল নেই। পুতুল খেলে কীভাবে তা পর্যন্ত জানে না বেচারি। অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেশাতে চেষ্টা করি, কিন্তু লাভ হয়নি। ওরা একে বুঝত না আর এ ওদের। ওর বাবা ওকে পাবলিক স্কুলে পাঠাতেও নারাজ। অগত্যা আমাকেই বাসায় পড়াতে হত—

'এরপর আমি ওকে পুতুল বানানোর কাদামাটি এনে দিই। ও দিয়ে মানুষের মুখ বানাতে ভারি ভালোবাসত ইরমা। ছ'বছরের বাচ্চার তুলনায় ওর প্রতিভা রীতিমতো অবাক করে আমাকে।

'ছোট ছোট পুতুল বানাতাম দুজনে। আমি সেলাই করে দিতাম ওদের কাপড়। প্রথম বছরটা সুখেই কাটল। বিশেষ করে আপনার ভাই যখন দক্ষিণ আমেরিকায় ছিলেন। কিন্তু এবছর উনি ফিরে আসার পর— ওহ, সে আর কহতব্য নয়!'

'প্লিজ, একটু বোঝার চেষ্টা করুন,' বললেন স্যাম স্টিভার। 'জন অসুখী মানুষ। বউটাকে হারিয়েছে, ব্যবসা পড়ে গেছে, তার ওপর ড্রিঙ্ক তো আছেই—আপনি তো সবই জানেন।'

'উনি মেয়েকে ঘৃণা করেন এটা জানি,' সহসা খ্যাঁক করে উঠলেন মিস প্যাল। 'উনি চান মেয়ে বখে যাক, যাতে হাতের সুখ মিটিয়ে পেটাতে পারেন। প্রায়ই ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে বেল্ট দিয়ে কী মারটাই না মারেন। আপনি কিছু একটা করুন, মি. স্টিভার, নয়তো পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব আমি।'

পাগলি বুড়িটা দেবেও, বুঝে গেছেন স্যাম স্টিভার। প্রতিকার—মধুর ব্যবহার। 'হ্যাঁ, ইরমার ব্যাপারটা—'

'ও-ও বদলে গেছে। ওর বাবা বিদেশ থেকে ফেরার পর থেকেই। আমার সাথে আর খেলতে চায় না, তাকায় না পর্যন্ত। আমি কেন ওকে বাপের হাত থেকে বাঁচাতে পারছি না সেই অভিমানেই সম্ভবত। তাছাড়া—ওর ধারণা হয়েছে ও আসলেই একটা ডাইনি।'

পাগলামি আর কাকে বলে। চেয়ারে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে সিধে হলেন স্যাম স্টিভার।

'ওভাবে তাকাবেন না, মি. স্টিভার। ও নিজেই আপনাকে বলবে—যদি আর কি ও বাড়িতে যাওয়ার সময় হয় আপনার!'

মহিলার কণ্ঠের তিরস্কারটুকু ঠিকই ধরতে পারলেন স্যাম স্টিভার। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। কথা বলার সুযোগ দিলেন মহিলাকে।

'ও বলেওছে আমাকে, ওর বাবা ওকে ডাইনি বানাতে চাইলে ও তাই-ই হবে। আর আমার সাথে কেন, কারও সাথেই খেলবে না, কেননা ডাইনিরা খেলা করে না।

গত হ্যালো উইনে ইরমা ঝাড়ুর হাতল চায় আমার কাছে। আহা, বেচারি মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে।

'এক হপ্তা আগে একটু পরিবর্তন লক্ষ করি ওর মধ্যে। রবিবার আমার সাথে গির্জায় যেতে চায়। ব্যাপটিজম দেখবে নাকি। ভাবুন তো— আট বছরের বাচ্চা মেয়ে দেখবে ব্যাপটিজম! বেশি বেশি বই পড়ছে আর কি।

'তো নিয়ে গেলাম গির্জায়। আমার হাত ধরে বসে রইল লক্ষ্মীমেয়ের মতো।

'কিন্তু এরপর আবার খোলসের মধ্যে ঢুকে গেল। সারাবাড়ি ঘুরে বই পড়ছে, সন্ধেবেলা উঠানময় ছোটাছুটি করছে, আপন মনে কীসব বকছে।

'আপনার ভাই বেড়ালছানা এনে না-দেয়াতেই এই বিপত্তি। একটা কালো বেড়ালের জন্যে খুব বায়না ধরে ও কেন চাই জিজ্ঞেস করাতে বাপকে বলে ডাইনিদের কাছে কালো বেড়াল থাকে। তারপর আর কি, ওপরতলায় পেটাতে নিয়ে যাওয়া হয় ওকে।

'ঠেকাতে পারিনি আমি। সে রাতে কারেন্ট ছিল না, মোমবাতিও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ইরমা চুরি করেছে ধারণা করেন ওর বাবা। ওইটুকু একটা বাচ্চা মোমবাতি দিয়ে কী করবে বলুন তো—

'তারপর আজ হেয়ারব্রাশ খুঁজে না পেয়ে—'

'মেয়েকে মেরেছে?'

'হ্যাঁ। ইরমা চুরির কথা স্বীকার করেছে। পুতুলের জন্যে নিয়েছিল।'

'আপনি না বললেন ওর পুতুল নেই?'

'নিজেই একটা বানিয়েছে। মানে আমার বিশ্বাস। দেখিনি কোনোদিন—ও আমাদের আর বিশ্বাস করে না বলে কোনোকিছু দেখায় না; কোনো কথাও বলে না। কী যে মুশকিল!

'ও যে পুতুলটা বানিয়েছে—ছোট সাইজের। বুঝলাম কী করে, মাঝে মাঝে বগলে নিয়ে ঘোরে। ওটার সাথে কথা বলে, আদর করে, কিন্তু আমাদের দেখতে দেয় না।

'আজ সকালে আপসে হেয়ারব্রাশটা বাবাকে ফিরিয়ে দিয়েছে ও। জিনিসটার এতটুকু ক্ষতি করেনি। এমনকি বাপের কয়েকটা চুল আটকে ছিল সেভাবেই ফেরত দিয়েছে।

'কিন্তু হলে হবে কি, বেচারিকে ব্রাশটা দিয়ে কাঁধে খুব মার মারল, হাত মুচড়ে দিয়ে তারপর—'

চেয়ারে জবুথুবু হয়ে বসে, পাখির মতো বুকটার ভেতর থেকে ফোঁপানি তুলে আনলেন মিস প্যাল।

'আর সহ্য হল না, মি. স্টিভার। সোজা আপনার কাছে চলে এলাম। আমি এমনকি জিনিসপত্র আনার জন্যেও ও-বাড়িতে আর যেতে রাজি নই। মেয়েটা অমন মার খেয়ে

একবিন্দু কাঁদা তো দূরে থাক, খিলখিল করে হাসছিল—আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ও সত্যি সত্যিই ডাইনি—ওর বাপই ওকে ডাইনি বানিয়ে ছেড়েছে—'

স্যাম স্টিভার ফোন তুলে নিলেন।

'হ্যালো—স্যাম নাকি?' ওপ্রান্ত থেকে শোনা গেল।

ভাইয়ের কণ্ঠস্বর, মদ খেয়ে টর হয়ে আছে।

'ওই বুড়িটা তোমার ওখানে গেছিল বুঝি?' বললেন জন স্টিভার। তারপর হ্যাঁসূচক জবাব পেয়ে যোগ করলেন, 'ওর কথায় কান দিয়ো না। আমি সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব।'

'একবার আসতে চাইছিলাম,' বললেন স্যাম।

'এসো—তবে আজ না। সন্ধেয় ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'শরীর খারাপ নাকি?'

'কাঁধের কাছে ব্যথা। বাত-টাত হবে। কাল ফোন করব তোমাকে।'

'বেশ।'

কিন্তু জন স্টিভার পরদিন ফোন করলেন না। বরং সাপারের সময়, স্যামই ফোন করলেন।

অবাক ব্যাপার, ফোন ধরল ইরমা। ওর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চাচাকে জানাল, 'বাবা ওপরতলায় ঘুমাচ্ছে। শরীর খারাপ।'

'ও, ঘুমাক, ডেকো না। কাঁধের ব্যথাটা বেড়েছে নাকি?'

'এবার পিঠে ধরেছে। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

'ওকে বোলো কাল আবার ফোন করব। আঁ— তো তুমি ভালো আছ তো, ইরমা? মিস প্যাল নেই বলে মন খারাপ করছে না তো?'

'নাহ্। ও চলে গেছে বলে বরং খুশি হয়েছি। আস্ত গাধা একটা।'

'ও, তাই নাকি? তোমার কিছু দরকার হলে আমাকে ফোন কোরো, কেমন? চিন্তা কোরো না, তোমার বাবা শীঘ্রি সেরে উঠবে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই চাই,' বলে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ল মেয়েটি, তারপর ফোন রেখে দিল।

পরদিন বিকেলে স্যামের অফিসে ফোন এল জনের। আজ অস্বাভাবিকতা নেই ওর কণ্ঠে—বরঞ্চ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার রেশ মিশে আছে।

'স্যাম—ঈশ্বরের দোহাই, তুমি শিগগিরি একবার এসো। কী যেন হয়ে যাচ্ছে আমার!'

'আমার কাছে এক মক্কেল এসেছে, তবে বেশিক্ষণ থাকবে না। তুমি ডাক্তার ডাকছ না কেন?'

'ওই হাতুড়ে আমার কোন কাজে আসেনি। কাঁধের ব্যথার জন্যে কাল ডায়াথেরমি দিয়েছিল, আজ পিঠের জন্যেও ওই একই।'

'কমেনি?'

'ব্যথাটা চলে গেছিল। কিন্তু এখন আবার শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে—আমাকে যেন পিষে ফেলা হচ্ছে। প্রচণ্ড চাপ, বুকের কাছে। ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছি না।'

'শুনে তো প্লুরিসি মনে হচ্ছে।'

'প্লুরিসি না। ডাক্তার পরীক্ষা করেছে। কোনো রোগই ধরতে পারেনি। আর আমিও ওকে আসল কারণটা বলতে পারিনি।'

'আসল কারণ?'

'হ্যাঁ। পিন। খুদে শয়তানটা যেগুলো গাঁথছে ওর বানানো পুতুলটার গায়ে, কাঁধে, পিঠে। এখন ঈশ্বর জানে এসব ও করছে কীভাবে।'

'জন, এসব তুমি কি—'

'ঠিকই বলছি। পুতুলটাই যত নষ্টের মূল, ও যেটা মোমবাতি আর আমার হেয়ারব্রাশের চুল দিয়ে বানিয়েছে। ওহ্—কথা বলতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে—অভিশাপ পড়ুক খুদে ডাইনিটার ওপর! জলদি করো, স্যাম। কথা দাও, একটা কিছু করবে তুমি—যা হোক কিছু—পুতুলটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নাও—যেভাবে পারো—'

আধঘণ্টা বাদে, সাড়ে চারটেয়, ভাইয়ের বাসায় প্রবেশ করলেন স্যাম স্টিভার।

দরজা খুলল ইরমা।

ওকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলেন স্যাম। ছোট্ট এক পুতুলের মতো দেখাচ্ছে ওকে। খুদে এক পুতুল—

'কেমন আছেন, চাচা?'

'ভালো। তোমার বাবাকে দেখতে এলাম; তোমাকে বলেছে? শরীর খারাপ করছে নাকি—'

'জানি। এখন ভালো আছে। ঘুমাচ্ছে।'

কিছু একটা ব্যাপার ঘটে গেল স্যাম স্টিভারের মধ্যে; শিরদাঁড়া বেয়ে একফোঁটা বরফশীতল পানি গড়িয়ে নামল।

'ঘুমাচ্ছে?' গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। 'ওপরে?'

ভাতিজি জবাব দেয়ার আগেই দুদ্দাড় সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠতে লাগলেন স্যাম।

জন নিজের বেডরুমে শুয়ে। ঘুমাচ্ছেন, অন্য কিছু না। নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে লক্ষ করলেন স্যাম। মুখের চেহারায় প্রশান্ত অভিব্যক্তি।

হিমশীতল পানির ফোঁটাটা এবার উবে গেল, স্যামের মুখে ফুটল মৃদু হাসি। 'যত্তসব,' আওড়ালেন বিড়বিড় করে। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

নিচে নামার সময় মাথায় খেলে চলল নানা ধরনের পরিকল্পনা। ভাইকে ছ'মাসের

জন্যে ছুটি কাটাতে পাঠাবেন; চিকিৎসার্থে একথাটা অবশ্য গোপন রাখতে হবে। ইরমাকে পাঠাতে বলবেন এতিমখানায়; এই মরাটে প্রাচীন বাড়িটা থেকে দূরে রাখা উচিত বাচ্চাটাকে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি থমকে দাঁড়ালেন তিনি। গোধূলির আলোয় ব্যানিস্টারের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে লক্ষ করলেন, সোফায় গুটিসুটি মেরে বসে ইরমা। খুদে ধবধবে একটা বলের মতন দেখাচ্ছে ওকে। বাহুতে দোলাচ্ছে কী একটা জিনিস, আর কথা বলছে ওটার সঙ্গে।

ও, পুতুল তাহলে সত্যিই একটা আছে।

আলগোছে নেমে এলেন স্যাম স্টিভার, এগোলেন ইরমার দিকে।

'হাউ।'

আঁতকে উঠল মেয়েটি। দুহাত উঠে গেল আদরের জিনিসটিকে গোপন করতে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওটাকে।

স্যাম স্টিভারের মনে হল বুকে একটা পুতুলকে বুঝি চেপে ধরা হয়েছে—

'বাবা এখন ভালো আছে, তাই না, চাচা?'

'হ্যাঁ, অনেকটা ভালো।'

'জানতাম।'

'ওকে অবশ্য ছুটিতে যেতে হতে পারে। অনেক দিনের জন্যে।'

মুচকি হাসি খেলে গেল ইরমার ঠোঁটে। 'বাহ,' বলল সে। 'তবে তো ভালোই।'

'তোমাকে অবশ্য,' বলে চললেন স্যাম স্টিভার, 'একা থাকতে হবে না। ভাবছি তোমাকে কোন্ স্কুলে পাঠানো যায়—'

খিলখিল করে হেসে উঠল ইরমা। 'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, চাচা,' বলল।

স্যাম সোফায় বসতে অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল ও। তারপর চাচা গা ঘেঁষে এলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নড়াচড়ার ফলে দুবাহু সামান্য ফাঁক হল, এবং স্যাম লক্ষ করলেন ভাতিজির কনুইয়ের নিচ দিয়ে একজোড়া কাঠির মতো সরু পা ঝুলছে। ট্রাউজার পরা পায়ে, জুতো তৈরি করা হয়েছে চামড়ার টুকরো কেটে।

'ওটা কী, ইরমা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'পুতুল নাকি?' হাত বাড়িয়ে দিলেন।

পুতুলটাকে আগলাতে একপাশে কাত হল ইরমা।

'দেখাব না।'

'দেখালে ক্ষতি কী, মা? মিস প্যালের কাছে শুনলাম তুমি নাকি খুব সুন্দর পুতুল বানাতে পারো?'

'মিস প্যাল একটা গাধা। আপনিও তাই। এখন যান তো।'

'লক্ষ্মী, মা, দেখাও না একটু।'

কথা বলছেন, কিন্তু স্যাম স্টিভারের দৃষ্টি পুতুলটার মাথার দিকে। মেয়েটি পিছু হঠতে, ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলেন। মাথাই ওটা, শাদা মুখের ওপর নেমে এসেছে শণের মতো চুল। আবছায়ার কারণে অস্পষ্ট মূর্তিটা, কিন্তু চোখজোড়া, নাকটা, চিবুক ঠিকই চিনতে পারলেন স্যাম স্টিভার—

আর ভণিতা করার প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

'পুতুলটা দিয়ে দাও বলছি!' ধমকে উঠলেন। 'আমি জানি কী ওটা। কে ওটা তাও জানি—'

মুহূর্তের জন্যে ইরমার মুখ থেকে মুখোশ খসে পড়ল এবং নগ্ন আতঙ্কে সেদিকে চেয়ে রইলেন স্যাম স্টিভার।

মেয়েটা জানে। মেয়েটা জানে তিনি জানেন।

এবার সেই একই দ্রুততায়, মুখোশটা এঁটে বসল ওর মুখে।

ইরমা মিষ্টি, জেদি, একটু বখে যাওয়া ছোট্ট এক বাচ্চা মেয়ে—উৎফুল্ল ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে হাসল, চোখে দুষ্টুমি।

'ওহ্, চাচা,' খিলখিলিয়ে হাসল। 'আপনি না কিছু বোঝেন না! এটা তো সত্যিকার পুতুল না।'

আবারও খিলখিল হাসি দিল ইরমা, তুলে ধরল পুতুলটা। 'এটা তো একটা—ক্যান্ডি!'

'ক্যান্ডি?'

মাথা ঝাঁকাল ইরমা। তারপর চট করে খুদে মাথাটা পুরে দিল মুখের মধ্যে। এবং কুট করে কামড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল ওটা।

ওপরতলা থেকে বিকট এক আর্তনাদ ভেসে এল। ওই একবারই।

স্যাম স্টিভার ঘুরে দাঁড়িয়ে যখন সিঁড়ি ভেঙে ছুটছেন, খুদে ইরমা, থমথমে মুখ নিয়ে মাথাটা চিবোচ্ছে তখনও, সদর দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে, মিশে গেল সাঁঝের আঁধারে।

মূল : রবার্ট ব্লচ

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অপারেশন

ডগলাস স্টোন আর লেডি স্যানক্সের সম্পর্কটা ছিল ওপেন সিক্রেট। ব্যাপারটা কুখ্যাত মহিলাটির ফ্যাশনেবল সমাজ যেমন জানত, তেমনি জানত বিজ্ঞান-সম্পর্কিত মানুষেরা, যাদের সবাই ছিল স্টোনের গুণগ্রাহী। এক সকালে যখন শোনা গেল যে আজ থেকে লেডি স্যানক্স চিরদিনের মতো অন্তরালে চলে যাচ্ছেন, কেউই আর কখনও তাঁর দেখা পাবে না, হাসি-মজার খোরাক পেয়ে সবাই আবার নড়েচড়ে বসল নতুন করে। কিন্তু ব্যাপারটা তারা হজম করার আগেই এল আরেক সংবাদ। এক সকালে ইস্পাতকঠিন স্নায়ুর অধিকারী সুবিখ্যাত সার্জনটিকে নাকি পাওয়া গেছে তাঁর সাজভৃত্যের ঘরে, বিছানায় বসে মিটিমিটি হাসছেন, দুটো পা পাজামার এক পায়ায় এক করে ঢোকানো। সাধারণ মানুষের মনে হল, একসঙ্গে এত হাস্য-কৌতুক তাদের স্নায়ু আর সইতে পারবে না।

যৌবনে ডগলাস স্টোন ছিলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আরও অনেক ওপরে হয়তো উঠতেন তিনি, কারণ এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনচল্লিশ। তাঁর কাছের মানুষেরা জানত যে শুধু সার্জন হিসেবেই নয়, ইচ্ছে করলে তিনি আরও অনেক বিষয়ে বিখ্যাত হতে পারতেন। তিনি হতে পারতেন বীর সৈনিক, দুঃসাহসী অভিযাত্রী, তুখোড় আইনজীবী, এমনকি ইট-পাথর নিয়ে ব্যস্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি জন্মই নিয়েছিলেন বিখ্যাত হবার জন্যে। ভদ্রলোক যে-পরিকল্পনা করতেন অন্য মানুষ সে-কাজ করার সাহস পেত না, আর তিনি যে-কাজ করতেন অন্য কারও পক্ষে তার পরিকল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। সার্জারিতে কেউ তাঁকে অনুসরণ করতে পারত না। তাঁর স্নায়ু, বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা কখনোই একটার সঙ্গে আরেকটা জট পাকিয়ে যেত না। খচ খচ ছুরি চলত তাঁর, লড়াই করতে করতে শেষপর্যন্ত হার মানত মৃত্যু, আর তাঁর সাহস দেখে রোগীর মতোই ফ্যাকাশে হয়ে যেত অপারেশন টেবিলের পাশে দাঁড়ানো সহকারীরা। তাঁর কর্মশক্তি, দুঃসাহস আর আত্মবিশ্বাসের স্মৃতি আজও সবার মাঝে অমলিন।

গুণের মতই লম্বা ছিল তাঁর দোষের বহর। প্রচুর আয় করতেন তিনি। লন্ডনের পেশাদার মানুষদের মধ্যে তাঁর আয়ই ছিল তৃতীয় সর্বোচ্চ, কিন্তু বিশাল সেই আয়ও তাঁর বিলাসিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। তাঁর জটিল চরিত্রের গভীরে ছিল

অতিমাত্রার অভিজাত একজন ভোগসুখবাদী মানুষ, যাঁর চাহিদার কাছে তিনি ঢেলে দিতেন জীবনের সমস্ত উপার্জন। তাঁর চোখ, কান, স্পর্শের রুচি ছিল অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের, একবার কিছু পছন্দ হলে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। পুরানো মদ, দুর্লভ বিদেশী সুগন্ধি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মৃৎশিল্প— এসবের পেছনেই হু হু করে উড়ে যেত তাঁর বিশাল উপার্জন। আর তারপরেই হঠাৎ করে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন লেডি স্যানক্সের জন্যে। বাঁকা চোখের কয়েকটা তীর আর ফিসফিস করে কিছু কথা তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। লেডি স্যানক্স ছিলেন লন্ডনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, তাঁর একমাত্র নারী। কিন্তু সার্জন লন্ডনের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ হলেও, তাঁর একমাত্র পুরুষ ছিলেন না। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভের অভ্যেস ছিল মহিলার, কেউ ধৈর্য নিয়ে তাঁর পিছু লেগে থাকলে শেষমেষ তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতেন না। সম্ভবত এই কারণে কিংবা এসবের প্রতিক্রিয়ায় লর্ড স্যানক্সকে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়ের মতো দেখাত, যদিও তাঁর আসল বয়স ছিল ছত্রিশ।

লর্ড ছিলেন শান্ত, নীরব, উদাসীন একজন মানুষ। পাতলা ঠোঁট, ঘন চোখের পাতা, বাগান আর বাড়ির ছোটখাটো কাজকর্ম নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। একসময় খুব ভালোবাসতেন তিনি অভিনয়, এমনকি লন্ডনের একটা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করেছিলেন। এই মঞ্চেই তিনি প্রথম দেখেন মিস ম্যারিয়ন ডসনকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দিতে চান নিজের কুমার পদবি আর এক কাউন্টির এক-তৃতীয়াংশ। বিয়ের পর অভিনয়ের শখ বিস্বাদ হয়ে গেল তাঁর, ফলে মেধা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কোনো মঞ্চেও তাঁকে অভিনয়ে আর রাজি করানো যায়নি। খুনতি আর ঝাঁঝরি হাতে তিনি আনন্দের নতুন জগৎ খুঁজে নিয়েছেন অর্কিড আর ক্রিসানথিমামের মাঝে।

তাঁর কি বোধশক্তি কিংবা তেজ বলতে কিছুই নেই? নাকি তিনি সব জেনেশুনেও স্ত্রীর যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন? এসব আলোচনা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় উঠল ড্রইংরুমে, চুরুটের ধোঁয়া উড়ল ক্লাবঘরে।

কিন্তু ডগলাস স্টোনের সঙ্গে লেডির সম্পর্ক শুরু হতে লর্ডের জ্ঞান বা মূর্খতা নিয়ে মাথা ঘামানো বাদ দিল সবাই। সুকৌশলে কিছুই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না স্টোন। ফলে শিগগির কলঙ্ক একেবারে ডালপালা মেলল। অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু সার্জন হিসেবে তাঁর সামাজিক মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, তিনি তাদের গালাগালি করে চল্লিশ গিনি দিয়ে লেডির জন্যে একটা বালা কিনলেন। প্রত্যেক বিকেলে সার্জনের গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরোলেন লেডি, আর সন্ধেয় সার্জন গেলেন লেডির বাড়িতে। দুজনের কারও মধ্যেই সম্পর্ক গোপন করার কোনোরকম চেষ্টা দেখা গেল না। তবে শেষমেষ একটা ছোট্ট ঘটনায় তাঁদের অভিসারে বাধা পড়ল।

শীতের এক বিষণ্ন রাত। ঠাণ্ডা, ঝোড়ো বাতাস আছড়ে পড়ছে চিমনি আর জানালার শার্সিতে। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। ডিনার শেষে স্টাডিতে আগুনের পাশে বসে

আছেন ডগলাস স্টোন, কনুইয়ের কাছে মালাকাইটের টেবিলের ওপর এক গ্লাস দামি পোর্ট। চুমুক দেয়ার আগে গ্লাসের ভেতরের রক্তলাল পদার্থটুকু দেখলেন তিনি সমঝদারের দৃষ্টিতে। আগুন ভালোভাবে জ্বলে উঠতে আলো এসে পড়ল তাঁর পৌরুষদীপ্ত মুখ আর ধূসর চোখজোড়ার ওপর। মোটা, দীর্ঘ ঠোঁট, রোমান ধাঁচের চৌকো চোয়ালে একটা বুনো ভাব। দামি চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসছেন তিনি মাঝে মাঝে। এই আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করার অধিকার তাঁর আছে। আজ ছ'জন সহকর্মীর নিষেধ সত্ত্বেও অত্যন্ত জটিল একটা অপারেশন করেছেন। এর আগে এরকম অপারেশন হয়েছে মাত্র দুবার, কিন্তু আজকের সাফল্যে তিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। লন্ডনের আর কোনো সার্জনের এই পরিকল্পনা করার দুঃসাহস কিংবা অপারেশন করার মতো দক্ষতা নেই।

কিন্তু আজ সন্ধেয় লেডি স্যানস্কের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কথা দিয়েছেন তিনি, আর ইতিমধ্যেই সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ক্যারিজ প্রস্তুত করার আদেশ দিতে বেল টেপার জন্যে কেবল হাত বাড়িয়েছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন কড়া নাড়ার ভোঁতা শব্দ। একমুহূর্ত পরেই হলঘর থেকে ভেসে এল পদশব্দ, দড়াম করে বন্ধ হল একটা দরজা।

'একজন রোগী কনসালটিং রুমে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার,' বলল খানসামা।

'তাঁর নিজের ব্যাপারে?'

'না, স্যার; মনে হয় আপনাকে নিয়ে যেতে চান।'

'এখন আর সম্ভব নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে,' কড়া গলায় বললেন ডগলাস স্টোন। 'আমি যাব না।'

'এই যে তাঁর কার্ড, স্যার।'

সোনার একটা থালায় করে কার্ডটা সামনে রাখল খানসামা। থালাটা তাঁকে উপহার দিয়েছেন একজন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী।

'হামিল আলী স্মিরনা। হুঁম! ভদ্রলোক তুর্কি মনে হচ্ছে।'

'জি, স্যার। দেখে মনে হল তিনি বিদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।'

'আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে, যেতেই হবে সেখানে। কিন্তু আমি এই হামিল আলীর সঙ্গে দেখা করব। যাও, তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, পিম।'

কয়েক মুহূর্ত পর খানসামা দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকলেন ছোটখাটো, ভাঙাচোরা এক মানুষ; পিঠে কুঁজো, মাথাটা সামনে বাড়িয়ে চোখ পিটপিট করা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। মুখ, চুল আর দাড়ি কুচকুচে কালো। ভদ্রলোকের এক হাতে লাল ডোরাকাটা শাদা মসলিনের একটা পাগড়ি, আরেক হাতে

শ্যামোয়া চামড়ার একটা ব্যাগ।

'শুভ সন্ধে,' দরজা বন্ধ করে দিয়ে খানসামা চলে যেতে বললেন ডগলাস স্টোন। 'আশা করি ইংরেজি বলতে পারেন?'

'জি, স্যার। আমি এশিয়া মাইনর থেকে এসেছি, ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারি।'

'আপনি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চান মনে হয়?'

'জি, স্যার। আমি চাই আমার স্ত্রীকে আপনি একবার দেখেন।'

'আজ তো আপনার স্ত্রীকে দেখতে পারব না, আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে। আগামীকাল সকালে যেতে পারি।'

অদ্ভুত এক কৌশলে জবাব দিলেন তুর্কি ভদ্রলোক। ব্যাগের মুখ খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করলেন তিনি, ঝরঝর করে যেন ঝরে পড়তে লাগল সোনার ঝর্না।

'এখানে একশো পাউন্ড আছে,' বললেন তিনি। 'আর কথা দিচ্ছি এক ঘণ্টার বেশি দেরি আপনাকে করতে হবে না। আপনার বাড়ির সামনেই একটা ক্যাব দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

ঘড়ি দেখলেন ডগলাস স্টোন। এক ঘণ্টা পরে লেডি স্যানস্কের কাছে গেলে খুব বেশি দেরি হবে না। তিনি তার চেয়েও দেরি করে সেখানে গেছেন। খুবই বেশি ফি দিতে চাইছেন ভদ্রলোক। জিনিসপত্র নিয়ে কয়েকজনের কাছে অনেক ঋণ হয়ে গেছে, ঋণের জন্যে চাপ দিতে শুরু করেছে তারা। না, এই সুযোগ হাতে পেয়ে তিনি হেলায় হারাতে রাজি নন। তিনি যাবেন।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সেটা খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। খুবই দুঃখজনক। আপনি কি কখনও আলমোহেদির ড্যাগারের কথা শুনেছেন?'

'না।'

'এগুলো বহু প্রাচীন পুবদেশীয় একধরনের ছুরি। অদ্ভুত চেহারা, হাতলটা আপনারা যাকে বলেন ওই রেকাবের মতো। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, প্রাচীন সব দুর্লভ বস্তুর ব্যবসা আমার। এগুলো সংগ্রহের জন্যেই আমি স্মিরনা থেকে ইংল্যান্ডে এসেছি, ফিরে যাব আগামী সপ্তাহে। দুঃখের বিষয়, এই জিনিসগুলোর সঙ্গেই ছিল ওই ড্যাগার।'

'আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে, নিশ্চয় ভুলে যাননি সে-কথা,' সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বললেন সার্জন; 'দয়া করে লম্বা বর্ণনা বাদ দিয়ে আসল ঘটনা বলুন।'

'শুনলেই বুঝতে পারবেন যে এই বর্ণনার প্রয়োজন আছে। আমি যে-ঘরে জিনিসগুলো রাখি, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে আমার স্ত্রী আজ পড়ে গেছে সেখানে, আর তার নিচের ঠোঁট কেটে গেছে আলমোহেদির সেই অভিশপ্ত ড্যাগারে।'

'হুঁ।' উঠে দাঁড়ালেন ডগলাস স্টোন। 'তাহলে আপনি চান যে ক্ষতটা আমি ব্যান্ডেজ করে দিই?'

'না, না, আপনি যা ভাবছেন আঘাত তার চেয়ে অনেক খারাপ।'

'কী রকম?'

'এই ড্যাগারগুলো বিষাক্ত।'

'বিষাক্ত!'

'জ্বি। পৃথিবীর কেউ জানে না যে এটা কী বিষ কিংবা এর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কী। বাবাও এই ব্যবসা করতেন, তাঁর মুখ থেকেই আমি প্রথম শুনি এই বিষের কথা।'

'এই বিষে আক্রান্ত হলে কী হয়?'

'গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রোগী, তারপর ঘুমের মধ্যেই মারা যায় তিরিশ ঘণ্টার ভেতরে।'

'আপনি বলছেন এই বিষ থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই, তাহলে আমার পেছনে এত খরচ করতে চাইছেন কেন?'

'ওষুধ রেহাই দিতে পারবে না, কিন্তু ছুরি হয়তো পারবে।'

'কীভাবে?'

'এই বিষের কাজ শুরু হতে অনেক দেরি হয়। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা এটা থেকে যায় ক্ষতের মধ্যে।'

'জায়গাটা পরিষ্কার করলে বিষ ধুয়ে যাবে?'

'কাউকে সাপে কামড়ালে ক্ষত পরিষ্কার করে কি সেই বিষ দূর করা যায়? এই বিষ যেমন সূক্ষ্ম তেমনি মারাত্মক!'

'তাহলে কি জায়গাটা কেটে বাদ দিতে হবে?'

'জি। এই বিষ আঙুলে লাগলে সেই আঙুল কেটে বাদ দাও, বলতেন বাবা। তবে ঘটনাটা ঘটেছে আমার স্ত্রীর বেলায়, তাই যাকে-তাকে দিয়ে অপারেশন করিয়ে আমি ঝুঁকি দিতে পারি না।'

জীবনে অনেক কাটা-ছেঁড়া করেছেন ডগলাস স্টোন, ফলে সাধারণ মানুষের ভয় তাঁর মনে নেই। সব শুনে ইতিমধ্যে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন তিনি। 'হ্যাঁ, অপারেশন ছাড়া তো আর কোনো পথই নেই মনে হচ্ছে,' বললেন তিনি সরাসরি। 'জীবন হারানোর চেয়ে বরং একটা ঠোঁট হারানো অনেক ভালো।'

'জি, ঠিকই বলেছেন আপনি। সবই আমার কিসমত, একে এড়িয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। এখন চলেন, আমার সঙ্গে গিয়ে যা করার করবেন।'

একটা ড্রয়ার থেকে সার্জিক্যাল ছুরির কেস, এক রোল ব্যান্ডেজ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস বের করে নিলেন ডগলাস স্টোন। লেডি স্যানস্ত্রের সঙ্গে দেখা করতে

চাইলে আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করার উপায় তাঁর নেই। 'আমি প্রস্তুত,' ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বললেন তিনি। 'এই ঠাণ্ডায় বেরোবার আগে খাবেন নাকি এক গ্লাস ওয়াইন?'

কথাটা শোনামাত্র একটা হাত ওপরে তুলে আতঙ্কে যেন একেবারে কুঁকড়ে গেলেন তুর্কি ভদ্রলোক। 'আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে আমি মুসলমান, মহানবীর একজন খাঁটি অনুসারী,' বললেন তিনি। 'মদ স্পর্শ করা আমাদের নিষেধ। এবার বলুন, সবুজ কাচের বোতলে করে এইমাত্র ওটা কী রাখলেন পকেটে?'

'ক্লোরোফর্ম।'

'ওটাও আমাদের জন্যে হারাম। স্পিরিট জাতীয় জিনিস আমরা ব্যবহার করি না।'

'কী! ক্লোরোফর্ম ছাড়াই স্ত্রীকে অপারেশন করাতে চান?'

'আহা! বেচারি কিছুই বুঝতে পারবে না। বিষের আক্রমণে ইতিমধ্যেই সে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। তারপর আমি তাকে স্মিরনার আফিম দিয়েছি। চলুন, স্যার, এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।'

বাইরে পা দিতেই এক পশলা বৃষ্টি এসে ঝাপটা মারল মুখে। মার্বেল পাথরের একটা নারীমূর্তির বাহু থেকে ঝোলা হলঘরের বাতিটা নিভে গেল দপ করে। অতি কষ্টে কাঠের ভারী দরজাটা খুলে ধরে রাখল খানসামা পিম। দুজনে গিয়ে উঠলেন অপেক্ষমাণ ক্যাবে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খটখটিয়ে রওনা দিল সেটা।

'দূরে যেতে হবে?' জানতে চাইলেন ডগলাস স্টোন।

'না, না। ইউস্টন রোডে।'

সময় জানার জন্যে রিপিটারের স্প্রিং চেপে ধরলেন স্টোন। মৃদু টিংটিং শব্দ তাঁকে জানিয়ে দিল যে এখন সোয়া ন'টা বাজে। মনে মনে দূরত্ব হিসেব করে তিনি ভাবলেন, এরকম ছোট্ট একটা অপারেশন করতে কত সময় লাগতে পারে। দশটার মধ্যে লেডি স্যানস্রের কাছে যেতেই হবে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পেছনে, মাঝেমাঝে দু-একটা উজ্জ্বল দোকান। ক্যাবের চামড়ার ছাদে ঝরঝরিয়ে পড়ছে বৃষ্টি, কাদার গর্তে পড়তে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠছে চাকা। উল্টোপাশে বসা তুর্কি ভদ্রলোকের শাদা পাগড়ি সামান্য চকচক করছে অন্ধকারের গায়ে। পকেটে হাত দিয়ে সুচ, সেফটিপিন ঠিকঠাক করে নিলেন সার্জন, রোগীর বাড়িতে পৌঁছার পর বাড়িতে একটা মুহূর্তও তিনি ব্যয় করতে চান না। অস্থির হয়ে মাঝেমাঝেই পা ঠুকতে লাগলেন তিনি ক্যাবের মেঝেতে।

অবশেষে একসময় গতি কমতে কমতে থেমে গেল ক্যাব। চোখের পলকে ডগলাস স্টোন বেরিয়ে এলেন বাইরে, পেছনে পেছনে স্মিরনার ব্যবসায়ী।

'তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো,' বললেন তিনি ক্যাবচালককে।

সরু, নোংরা একটা রাস্তায় করুণ চেহারার একটা বাড়ি। লন্ডনকে সার্জন চেনেন বেশ ভালোভাবেই। আশেপাশে তাকিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না, কেবল বাজে চেহারার বাড়ির লম্বা দুটো সারি। তাঁরা এসে দাঁড়ালেন রঙচটা, কালিঝুলি লাগানো একটা দরজার সামনে। ওপরে বেডরুমগুলোর একটার জানালায় হলুদ একটা আভা। জোরে জোরে দরজায় টোকা দিলেন ভদ্রলোক, আলো এসে পড়তে ডগলাস স্টোন দেখলেন, তাঁর সারা মুখে উদ্বেগের ছাপ। বোল্ট নামার শব্দ পাওয়া গেল, মোমবাতি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল বয়স্কা এক মহিলা।

'সব ঠিক আছে?' শ্বাস চাপলেন ভদ্রলোক।

'তাঁকে যেমন রেখে গিয়েছিলেন এখনও তেমনি আছেন, স্যার।'

'কথা বলেনি?'

'না, অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।'

দরজা বন্ধ করে দিলেন ব্যবসায়ী, সরু প্যাসেজ ধরে এগোতে এগোতে অবাক চোখে আশেপাশে তাকাতে লাগলেন ডগলাস স্টোন। কোনো অয়েল-ক্লথ, ম্যাট বা হ্যাট-র‍্যাক নেই কোথাও। সব জায়গায় দেখা গেল পুরু ধুলো আর মাকড়সার জাল। প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে মহিলার পেছনে পেছনে ওপরে ওঠার সময় নিজের পদশব্দই কর্কশ লাগল কানে। সেখানে কোনো কার্পেট নেই।

বেডরুমটা দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙে। বয়স্কা নার্সকে অনুসরণ করলেন ডগলাস স্টোন, তাঁর পেছনে ব্যবসায়ী। এখানে অন্তত আসবাব চোখে পড়ল। মেঝে আর কোণগুলো ভর্তি হয়ে আছে টার্কিশ ক্যাবিনেট, মণিরত্ন-খচিত টেবিল, বর্ম, অদ্ভুত চেহারার বাঁশি আর অস্ত্রশস্ত্রে। দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে একটামাত্র ছোট বাতি। সেটা নামিয়ে ডগলাস স্টোন এগোলেন জিনিসগুলোর মাঝখান দিয়ে। এক কোণের একটা বিছানায় শুয়ে আছেন বোরখা আর নেকাব পরা একজন মহিলা। মুখের নিচ অংশটা খোলা তাঁর, সার্জন দেখলেন নিচের ঠোঁটের প্রান্ত বরাবর আঁকাবাঁকা একটা কাটা দাগ।

'বোরখা পরে থাকায় কিছু মনে করবেন না,' বললেন তুর্কি ভদ্রলোক। 'আপনি নিশ্চয় জানেন যে আমরা মেয়েদের খুব পর্দার মধ্যে রাখি।'

কিন্তু সার্জন এই মুহূর্তে বোরখা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। মহিলাও এখন আর তাঁর কাছে মহিলা নয়, স্রেফ একটা রোগী। ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণচোখে ক্ষতটা পরীক্ষা করলেন তিনি। 'যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই,' বললেন সার্জন। 'লক্ষণ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে-পারি।'

হাত কচলাতে লাগলেন ব্যবসায়ী।

'স্যার, স্যার,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'দেরি করবেন না। আপনি জানেন না যে এই বিষ কত মারাত্মক। আমি জানি বলে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অপারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

'তবু আমি একটু অপেক্ষা করতে চাই,' বললেন ডগলাস স্টোন।

'যথেষ্ট অপেক্ষা করেছেন,' রেগে গেলেন তুর্কি ব্যবসায়ী। এখন প্রত্যেকটা মিনিট মূল্যবান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মৃত্যু দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবারে এখানে আসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে অন্য সার্জনের খোঁজে বেরুতে হবে।'

মুশকিলে পড়ে গেলেন ডগলাস স্টোন। একশো পাউন্ড ফেরত দেয়া মোটেই আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু অপারেশন না করলে পাউন্ডগুলো তাঁকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। আর তুর্কি ভদ্রলোকের কথা অনুসারে সত্যিই যদি মহিলা মারা যান, করোনারের জেরায় তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

'এই বিষ সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'জি, আছে।'

'আপনি কিন্তু আমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে এক্ষেত্রে একটা অপারেশনের প্রয়োজন।'

'সমস্ত পবিত্র জিনিসের শপথ করছি আমি।'

'অপারেশনের পর চেহারা হবে ভয়াবহ।'

'জি, বুঝতে পারছি যে ওই ঠোঁটে চুমু খেতে আর মোটেই ভালো লাগবে না।'

সাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন ডগলাস স্টোন, বিশ্রী এই মন্তব্যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। কিন্তু তুর্কিদের কথা বলার চালচলনের নিজস্ব কিছু ধরন আছে, আর এখন তর্কাতর্কি করার মতো সময় নেই। কেস থেকে সার্জিক্যাল একটা ছুরি বের করে তর্জনীতে ছুঁইয়ে ধার পরীক্ষা করলেন ডগলাস স্টোন, তারপর বাতিটা নিয়ে গেলেন বিছানার আরও কাছে। বোরখার ফাঁক দিয়ে গাঢ় দুটো চোখ চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

'অনেকটা আফিম দিয়েছেন মনে হচ্ছে।'

'জি, তা অনেকখানিই দেয়া হয়েছে।'

আবার তাকালেন তিনি গাঢ় চোখজোড়ার দিকে। তাতে নিষ্প্রভ দৃষ্টি, তবু তাকিয়ে থাকতে থাকতে সামান্য নড়ে গেল মণি, মৃদু কেঁপে উঠল ঠোঁট।

'উনি সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাননি,' বললেন সার্জন।

'ব্যথার বোধ না-থাকা অবস্থাতেই কি ছুরি চালানো ভালো নয়?'

ওই একই কথা ভাবছিলেন সার্জন। ফরসেপ দিয়ে আহত ঠোঁটটা চেপে ধরলেন তিনি, তারপর দ্রুত দুবার ছুরি চালিয়ে বড় একটা টুকরো কেটে ফেললেন। ভয়াবহ ঘড়ঘড়ে এক চিৎকার ছেড়ে বিছানায় উঠে বসলেন মহিলা। নেকাব খুলে পড়ে গেল মুখ থেকে। হতভম্ব হয়ে গেলেন সার্জন, এই মুখ যে তাঁর ভীষণ পরিচিত! ঠোঁট রক্তে

মাখামাখি হওয়া সত্ত্বেও চিনতে মোটেই অসুবিধে হল না। কাটা জায়গাটায় বারবার হাত তুলে সমানে চিৎকার করে চলেছেন মহিলা। ছুরি আর ফরসেপ হাতে বিছানায় বসে পড়লেন ডগলাস স্টোন। পুরো ঘরটা যেন তাঁকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ধীরে ধীরে, কানে এসে আছড়ে পড়ছে দূর সাগরের গর্জন। এখন পাশে যে-কেউ থাকলে বলত, সার্জনের চেহারা এই মুহূর্তে মহিলার কাটা মুখের চেয়েও বিশ্রী হয়ে গেছে। এর মাঝেই যেন স্বপ্নের ঘোরে তিনি দেখলেন, তুর্কি ভদ্রলোক তাঁর চুল ও দাড়ি খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর, আর সেখানে দাঁড়িয়ে লর্ড স্যানক্স। চিৎকারের শব্দ নেই আর, মহিলা আবার লুটিয়ে পড়ছেন বিছানায়। নিশ্চল বসে আছেন ডগলাস স্টোন, আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হেসে চলেছেন লর্ড স্যানক্স।

'ম্যারিয়নের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল এটা, এই অপারেশনটা,' বললেন তিনি। 'তবে শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে।'

সামনে ঝুঁকে বিছানার চাদরের ঝালর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ডগলাস স্টোন। হাত থেকে ছুরি পড়ে গেল মেঝেতে, রয়ে গেল ফরসেপ আর অন্যান্য জিনিসগুলো।

'অনেক দিন থেকেই ঘটনাটা ঘটাতে চাইছিলাম আমি,' নরম স্বরে বললেন লর্ড স্যানক্স। 'আপনার গত বুধবারের চিঠিটা আমার হাতে চলে এসেছে, এখন ওটা আমার পকেট-বুকের ভাঁজে। চিঠিটা পেয়েই আমি পরিকল্পনা এঁটে ফেলি। অবশ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আমাকে কিছু ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। আর ক্ষতটা আমি সৃষ্টি করেছি আমার সিগনেট রিঙের আঁচড়ে।'

নীরব সার্জনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কোটের পকেটে রাখা ছোট্ট রিভলভারটা কক করে নিলেন তিনি। কিন্তু ডগলাস স্টোন তখনও চাদরের ঝালর ধরে টানাটানি করছেন।

'আর যা-ই হোক আপনি কিন্তু আপনার এনগেজমেন্ট রক্ষা করেছেন,' বললেন লর্ড স্যানক্স।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ডগলাস স্টোন। লম্বা এই হাসি শুনে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল লর্ড স্যানেক্সের। একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল তাঁকে। পা-টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বাহিরে দাঁড়িয়েছিল বয়স্কা সেই মহিলা।

'জ্ঞান ফিরলে তোমার কর্ত্রীর কাছে থেকো,' বললেন লর্ড স্যানক্স। তারপর তিনি নেমে গেলেন রাস্তায়। তাঁকে দেখে হ্যাটে হাত ছুঁইয়ে অভিবাদন জানাল ক্যাবচালক।

'জন,' বললেন লর্ড স্যানক্স, 'প্রথমে ডাক্তারকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবে। সম্ভবত নিচতলায় তাঁকে ধরে নামাতে হবে। তাঁর খানসামাকে বলবে যে একটা অপারেশন করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'জি, স্যার।'

'তারপর লেডি স্যানক্সকে বাড়ি নিয়ে যেও!'

'আর আপনি কোথায় যাবেন, স্যার?'

'আগামী কয়েক মাসের জন্যে আমার ঠিকানা— হোটেল দ্য রোমা, ভেনিস। লক্ষ রেখো যেন চিঠিগুলো আমার হাতে ঠিকভাবে পৌঁছে। আর স্টিভেনসকে বোলো যেন আগামী সোমবার ক্রিসানথিমামগুলো প্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়ে তার পরে ফলাফল জানায় আমাকে।

মূল : আর্থার কোনান ডয়েল

রূপান্তর : খসরু চৌধুরী

চোখের আড়াল হলে

ঘটনাগুলো এখনও আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফেরে। ভুলে থাকার চেষ্টা করি। পারি না। কী করেই বা ভুলে থাকব? মাথার উপর দিয়ে অনবরত বিমান উড়ে গেলে কীভাবে ভুলে থাকা যায়? যতবার বিমানের গর্জন কানে আসে ততবার সেই আতঙ্কের কথা মনে পড়ে আমার। কাঁপতে থাকি থরথর করে। ভয়ে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘামে ভিজে যায় সমস্ত শরীর। কানে ভেসে আসে ইঁট, কাচ, পাথর ভাঙার শব্দ— আর আমার মেয়ের আর্তনাদ। সেই আর্তনাদ কেবল শুনতে পাই আমি। তখন আমার সব মনে পড়তে থাকে— ব্যাখ্যাতীত, রহস্যময় ঘটনাগুলো। একজন মা হয়ে এর চেয়ে কষ্টকর আর কী হতে পারে?

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল মিসেস বার্নেসের পেরামবুলেটরকে দিয়ে। আমার মেয়ে জেনিকে নিয়ে সেদিন দোকান থেকে ফিরছি আমি। হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরল ও। তারপর আঙুল তুলে দেখাল রাস্তার ওপারটা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'মা দেখো— প্রামটাকে দেখো।'

তাকালাম আমি। দেখলাম পেরামবুলেটরে বসে আছে আমাদের প্রতিবেশী মিসেস বার্নেসের বাচ্চা, আর মিসেস বার্নেস দুহাতে পেরামবুলেটরটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছেন বাজারের দিকে।

'ও তো রোজই দ্যাখো,' বললাম আমি। 'নতুন করে আর দেখার কী আছে?'

'কিন্তু রোজ তো মিসেস বার্নেসই ওটা ঠেলে নিয়ে যান,' বলল জেনি। 'অথচ আজ দ্যাখো গাড়িটা কেউ ঠেলছে না। আপনাআপনি চলছে।'

'বাজে বোকো না,' বিরক্তি চেপে রেখে বললাম আমি।

'মোটেই বাজে বকছি না,' জেনি বলল। 'দেখছ না মিসেস বার্নেস ওখানে নেই। বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রামটা নিজেই চলছে।'

ইদানীং জেনির মনটা ভালো নেই, জানি আমি। খুব উল্টোপাল্টা কথা বলছে ও। বুঝতে পারি নিঃসঙ্গতার জন্যেই এমনটা হয়েছে। এখানে ওর কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। সারাক্ষণ একা থাকে মেয়েটা। একটাই মাত্র মেয়ে আমাদের। আমিও খুব একটা সময় দিতে পারি না ওকে, ওর বাবার কথা তো বাদই দিলাম। তাই হয়তো এসব উল্টোপাল্টা কথা বলে মজা পায় ও। কয়েকদিন আগে ওর বাবার শার্টটা নিয়ে

একই কাণ্ড করেছিল। সেদিন সকালে শাদা রঙের শার্ট পরে বেরিয়েছিল ওর বাবা। অথচ জেনি বলল, 'বাবা সবুজ রঙের শার্ট পরে গেল কেন?' আমি যতই বলি, তোমার বাবা শাদা শার্ট পরে গেছে, জেনি ততই বলতে থাকে—বাবা সবুজ শার্ট পরে গেছে। একসময় ওকে বললাম, 'তোমার বাবার তো সবুজ শার্টই নেই।' জেনি মানল না আমার কথা। বলল, 'অবশ্যই আছে। নইলে সবুজ শার্ট পরল কেমন করে?'

সেদিন এই নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তর্ক করেছিল জেনি। এখন আবার শুরু করেছে মিসেস বার্নেসের পেরামবুলেটর নিয়ে। বাড়ি পৌঁছেও সেই একই ঘ্যানঘ্যানানি। 'মা সত্যি বলছি, প্রামটা নিজে নিজে চলছিল তখন।'

'বোকার মতো কথা বোলো না,' এবার সত্যিই রেগে গেলাম আমি। 'মিসেস বার্নেস না ঠেললে গাড়িটা চলবে কী করে?'

'তাহলে বোধহয় কম্পিউটার চালাচ্ছিল ওটাকে,' উত্তর দিল জেনি।

'অনেক হয়েছে, এবার থামো,' ইতি টানতে চাইলাম আমি।

জেনি বলল, 'তুমি বোধহয় বাবার শার্টের ব্যাপারটা ভুলতে পারছ না। স্বীকার করছি মিথ্যে বলেছিলাম আমি। বাবা শাদা শার্টই পরেছিল। কিন্তু মিসেস বার্নেসের ব্যাপারটা—তুমি তো দেখলে তিনি ওখানে ছিলেন না।'

'অবশ্যই ছিলেন।'

'ঠিক আছে, আমি জানালার কাছে বসে রইলাম। প্রামটা যখন ফিরবে তোমাকে ডেকে ভালো করে দেখাব।'

জানালার চৌকাঠে উঠে বসল জেনি। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম। কাজের চাপে ভুলে গেলাম জেনি ও প্রামটার কথা। অনেকক্ষণ পরে যখন রান্নাঘর থেকে বেরোলাম, দেখলাম তখনও জানালায় বসে আছে জেনি। 'খেতে এসো,' ওকে ডাকলাম আমি।

'এখনও ফেরেনি,' জেনি বলল কাছে এসে।

'কে ফেরেনি?'

'প্রামটা। মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে।'

'চিন্তা কী মিসেস বার্নেস ওটা খুঁজে বের করে আনবেন,' পরিহাসের ছলে বললাম আমি। 'এতক্ষণে হয়তো খুঁজতেও বেরিয়েছেন।'

'না, তিনি বেরোননি,' বলল জেনি। 'আমি চোখ রেখেছিলাম তাদের দরজায়। তাহলে এখনও ওটা ফিরছে না কেন বুঝতে পারছি না। লাঞ্চের সময় হয়ে গেল।'

'তাহলে বোধহয় তিনি বাচ্চাটাকে নিয়ে কোনো বন্ধুর বাড়িতে গেছেন লাঞ্চ খেতে।'

'এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছ না তাই না?'

'এটা নিয়ে এখন গল্প লিখতে বসো। চমৎকার গল্প হবে।'

'মা, এটাকে গল্প বলছ কেন? এটা তো সত্যি।'

সন্ধ্যায় শুয়ে পড়ল জেনি। হ্যারল্ড, আমার স্বামী, বাসায় ফেরার পর আমাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'তুমি তো মিসেস বার্নেসকে চেনো। রাস্তার ওপাশের সুন্দরী মহিলাটা।'

'চিনব না কেন! ওর কথা শুনতে শুনতে আজ কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

'আজ সকালে বড় রাস্তাটার ওপর গাড়ির নিচে পড়ে ছিলেন তিনি,' বলল আমার স্বামী। 'রাস্তা পার হয়ে প্রামটা সবে ফুটপাথে তুলতে যাবেন, এমন সময় ওটা কিসে যেন বেঁধে যায়। মিসেস বার্নেস তখন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাস্তা দিয়ে সে সময়ে খুব জোরে একটা গাড়ি আসছিল। সময়মতো থামতে পারেনি। মিসেস বার্নেসকে চাপা দিয়ে চলে যায়। সাথে সাথে মারা গেছেন ভদ্রমহিলা।'

ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার শরীর। 'এজন্যেই তাকে ফিরে আসতে দেখা যায়নি। জেনি সারাটা দিন পথের দিকে চেয়েছিল। বাচ্চাটা কেমন আছে?'

'ওর কিছু হয়নি। কিন্তু জেনি পথের দিকে চেয়েছিল কেন?'

ঘটনাটা খুলে বললাম ওকে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃত্যুসংবাদটা ওকে জানাই, কি বলো? খুব ভেঙে পড়বে বেচারি।'

'হ্যাঁ জানাও,' বলল হ্যারল্ড। 'ভবিষ্যতে যাতে আর কাউকে নিয়ে রসিকতা করতে না পারে, সেই শিক্ষাটা হবে।'

'বারে, ওকে দোষ দিচ্ছ কেন? ও কীভাবে জানবে! থাক, ওকে জানানোর দরকার নেই।'

মিসেস বার্নেসের ঘটনা ওকে জানালাম না। পরদিনও হয়তো জানাতাম না। কিন্তু জেনি আবার শুরু করল ঘ্যানঘ্যানানি। 'মা, গতকাল প্রামটা ফিরেছে কিনা জানো?'

বাধ্য হয়ে খবরটা দিলাম তাকে। 'মিসেস বার্নেস কাল প্রামটাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন—মনে আছে তো? আগে বলতে দাও আমাকে। খুবই দুঃসংবাদ। একটা গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিলেন তিনি। মিসেস বার্নেস মারা গেলেও নিরাপদেই আছে বাচ্চাটা।'

'মিসেস বার্নেস মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, জেনি। খুব দুঃখজনক ঘটনা।'

'কীভাবে হল?'

হ্যারল্ড আমাকে যেটুকু বলেছিল সেটুকু বললাম আমি। মনোযোগ দিয়ে শুনল জেনি। শান্ত গলায় বলল, 'তিনি নিশ্চয় বাড়ি থেকে আগেই বেরিয়ে গিয়ে প্রামটার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। হলপ করে বলতে পারি প্রামটাকে নিয়ে তিনি বের হননি।'

আর কিছু বললাম না আমি। স্বস্তিবোধ করলাম মৃত্যুসংবাদ শুনে সে ভেঙে পড়ল

মা দেখে। সেও আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না এরপর।

কয়েক সপ্তাহ পরে স্কুলে একটা ঘটনা ঘটাল জেনি। ওর এক টিচারের রয়েছে মাকড়সা-আতঙ্ক। জেনি সেই টিচারের ডেস্কে একটা মাকড়সা রেখে দিল। জেনির নামে হেডমিস্ট্রেসকে নালিশ করলেন টিচার। জেনি আমাকে বলে গেল, 'হেডমিস্ট্রেস চারটের সময় দেখা করতে বলেছেন আমাকে। ফিরতে তাই দেরি হবে।'

কিন্তু তাড়াতাড়িই বাসায় ফিরল জেনি। বললাম, 'তোমার হেডমিস্ট্রেস তো দেখছি খুব তাড়াতাড়িই তোমাকে ছেড়ে দিলেন।'

হাসল জেনি। 'ভাগ্য ভালো যে তিনি ছিলেনই না। চারটের সময় তাঁর রুমের সামনে গেলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজায় টোকা দিলাম। একবার মনে হল তিনি ভেতরে ঢুকতে বলছেন। কিন্তু ঢুকে দেখলাম রুমে কেউ নেই। মনে হয় আমার কথা ভুলেই গেছেন তিনি। কী সৌভাগ্য।'

'কাজটা ঠিক করোনি,' বললাম আমি। 'তোমার উচিত ছিল ওখানে অপেক্ষা করা।'

'আর সেধে পড়ে মার খাওয়া, তাই না?'

পরদিন স্কুলের সেক্রেটারি মিসেস লেনিং এল আমাদের বাড়িতে। কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছিল তাকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে।

'দুঃসংবাদ আছে,' বলল মিসেস লেনিং। 'কাল রাতে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন হেডমিস্ট্রেস মিস পেট্রেল। এখনও কেউ জানে না খবরটা। যে মেয়েটা ঘর ঝাড়ু দেয়, সকালে সেই প্রথমে দেখতে পায় লাশটা। বিছানায় পড়ে আছে। আমি ছাড়া তাঁকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেছে আপনার মেয়ে জেনি।'

'জেনির সঙ্গে গতকাল চারটের সময় দেখা করার কথা ছিল তাঁর—।

'তা জানি,' বলল মিসেস লেনিং। 'কিন্তু জেনি তো ভয়েই পালিয়ে গেল। অফিসে বসে দেখলাম জেনি মিস পেট্রেলের দরজায় টোকা দিল। ভেতরেও ঢুকল কিন্তু সাথে সাথেই ছুটে বেরিয়ে এল আবার। দেখা করতে গেলাম আমি মিস পেট্রেলের সাথে। উনি বললেন, জেনি তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেছে। দুঃখ করে মিস পেট্রেল বললেন, আমাকে দেখতে কি ড্রাগনের মতো লাগে যে বাচ্চারা আমাকে দেখলেই ছুটে পালাতে চায়?'

'আচ্ছা,' বললাম আমি। 'ঘটনা তাহলে এ-ই।'

মিসেস লেনিং বলল, 'খুব ক্লান্তবোধ করছিলেন মিস পেট্রেল। আমাকে বললেন শরীরটা ভালো লাগছে না। কিন্তু বুঝতে পারিনি এতটা অসুস্থ তিনি। তিনি বললেন, টিচাররা কেন যে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ছেলেমেয়েদের নামে তাঁর কাছে নালিশ করে? দুর্ভাগ্য আমাদের, একজন চমৎকার মহিলাকে আমরা হারালাম।' অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল তার চোখদুটো। 'জেনি কিছু বলেছে এ ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বলেছে মিস পেট্রেল নাকি রুমে ছিলেন না,' জবাব দিলাম আমি।

'পাজি মেয়ে,' মাথা নেড়ে বলল মিসেস লেনিং। 'তখন রুমেই ছিলেন হেডমিস্ট্রেস। খবরটা শোনার পর জেনি নিশ্চয় আঘাত পাবে। আজ বিকেলে একটি বিশেষ সভায় খবরটা প্রচার করবেন সিনিয়র মিস্ট্রেস।'

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে জেনি বলল তার হেডমিস্ট্রেসের মৃত্যুর কথা। 'তাহলে অসুস্থতার জন্যে কাল চারটে পর্যন্ত তিনি আর আমার জন্যে অপেক্ষা করেননি,' বলল সে। 'শরীর খারাপ লাগার জন্যে আগেই বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।'

'জেনি, মিথ্যে বোলো না, প্লিজ। কেন মিথ্যে বলছ?'

'কিসের মিথ্যে?' অবাক হল জেনি।

'আমি জানি মিস পেট্রেল তোমার জন্যে রুমে অপেক্ষা করছিলেন।'

'তিনি রুমে ছিলেন না,' জোর দিয়ে বলল জেনি। 'আর তুমি কীভাবে জানো যে তিনি রুমেই অপেক্ষা করছিলেন?'

'সকালে মিসেস লেনিং এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে-ই বলল।'

'কী বলেছেন?'

'বলেছে, তুমি মিস পেট্রেলের রুমে ঢুকেই তাঁর দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। অবশ্য তোমার পালানোতে হেডমিস্ট্রেস স্বস্তি পেয়েছিলেন। কাউকে শাস্তি দেয়া তিনি পছন্দ করেন না।'

'মা, কসম বলছি, আমি রুমে ঢুকে তাঁকে দেখতে পাইনি। রুমটা তখন খালি ছিল।'

'আর পারা যায় না তোমাকে নিয়ে। খুব বাড়াবাড়ি করছ।'

'আমার কথা বিশ্বাস করো, মা,' জেনি বলল। 'মিসেস বার্নেসের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটল। সেদিনও তুমি বিশ্বাস করোনি আমার কথা। অথচ আমি একটুও মিথ্যে বলিনি সেদিন।'

হঠাৎ করেই আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। বুঝতে পারলাম অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। যে দুজনকে আর সবাই দেখলেও জেনি দেখতে পায়নি তারা আর বেঁচে থাকেনি। মারা গেছে অল্প সময় পরে। আমার মনের কথাটা যেন বুঝতে পারল জেনি। বড় বড় চোখে তাকাল আমার দিকে। 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' ফিসফিস করে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল সে।

সন্ধ্যায় হ্যারল্ডকে ঘটনাগুলো খুলে বললাম আমি। হেসে উড়িয়ে দিল সে আমার কথা। বলল, 'এটা নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা। এরকম হতেই পারে। জেনির রূপকথার সাথে মিসেস বার্নেসের অ্যাকসিডেন্ট কিংবা মিস পেট্রেলের হার্ট অ্যাটাকের কোনো সম্পর্ক নেই।'

ঘটনাগুলোকে আমার স্বামীর মতোই হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম জেনির

রূপকথা বলে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পরে আমার দুধওয়ালা, খুবই নিরীহ মানুষ ও' ব্রায়ানকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটল তাতে আর উড়িয়ে দিতে পারলাম না রূপকথা বলে।

ও' ব্রায়ানের পাওনা আমি প্রতি শনিবারেই মিটিয়ে দিই। ওকে তখন এক কাপ কফিও খাওয়াই। সে সময়ে জেনি তার রুমেই থাকে। হোমওয়ার্ক করে কিংবা করার ভান করে। সেদিন সকালে দুধ দিতে এল ব্রায়ান। কফি খেতে খেতে বলল, 'মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সন্ধ্যায় দেখতে আসবে। মেহমানদের জন্যে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু দুধের পড়েছে আকাল।'

ব্রায়ান চলে যাবার পর রান্নাঘরে ঢুকল জেনি। বাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুধ এল কোত্থেকে?'

'দুধওয়ালা দিয়ে গেছে,' বললাম আমি।

'কিন্তু সে এখানে এলে তো আমি জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পেতাম।'

'তুমি বোধ হয় পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলে।'

'আমার বয়েই গেছে,' বলল জেনি। 'ওই একই পড়া পড়তে ভালো লাগে না। আমি বাইরেই তাকিয়ে ছিলাম। মনে হয় সামনের পথ দিয়ে না এসে ব্যাটা বাড়ির ওপাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে।'

কথা বাড়ালাম না আমি। জেনির সঙ্গে এত বকবক করতে আর ভালো লাগে না। পরদিন ছিল রবিবার। দুপুর গড়িয়ে গেল তবু দুধওয়ালার দেখা নেই। বিকেলের দিকে দুধ নিয়ে এল অপরিচিত এক ছেলে। 'এত দেরি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আর কেন,' বলল ছেলেটি। 'দুধের ভাণ্ডারের যা-তা অবস্থা। এদিকে কালরাতে বুড়ো ও' ব্রায়ান একটা মারামারি লাগিয়ে বসল। খাওয়াদাওয়া চলছিল সেখানে।'

'জানি,' বললাম আমি। 'মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হচ্ছিল। ব্রায়ান বলেছিল আমাকে। কিন্তু কী হয়েছিল যে মারামারি করতে গেল?'

'মেয়ের চরিত্র নিয়ে কথা তুলেছিল একজন,' বলল ছেলেটি। 'মেয়েটার চরিত্র নাকি ভালো না। অনেক পুরুষের সাথে ঢলাঢলির অভ্যেস আছে। এই শুনে খেপে যায় ব্রায়ান। লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনিতেই মাতাল ছিল ব্রায়ান, তার উপর বুড়ো। লোকটার সাথে পারবে কেন সে? লোকটার এক ঘুসিতে সে উড়ে গিয়ে পড়ল টেবিলের কোনায়। মাথাটা ঠুকে গেল। ডাক্তার এসে দেখল বেচারা মরে গেছে ততক্ষণে।'

'কী বললে? ব্রায়ান মারা গেছে?' ঘরটা হঠাৎ যেন দুলতে শুরু করল আমার চোখের সামনে। যেন দূরদূরান্ত থেকে ভেসে এল ছেলেটির কণ্ঠ, 'আমি দুঃখিত। আসলে এভাবে হুট করে কথাটা বলা ঠিক হয়নি আমার। স্থির হয়ে একটু বসুন। হ্যাঁ, এখন কি ভালো লাগছে?'

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হলাম আমি। শরীরটা ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে উঠেছে। শীত করছে খুব। 'হ্যাঁ, এখন ভালো লাগছে।'

ঘরে ঢুকল জেনি। ছেলেটির দিকে তাকাল। 'মি ও' ব্রায়ান আসেননি আজ?'

'তোমার মা পরে বলবেন সেকথা,' বলল ছেলেটি। 'একটু ধরো, মাথাটা ঘুরছে ওঁর।' ছেলেটি দ্রুত চলে গেল।

'তোমার কী হয়েছে মা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জেনি। 'মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ।'

'মারামারি করতে গিয়ে কালরাতে মারা গেছে মি. ও' ব্রায়ান,' বললাম আমি।

জেনির মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। বলল, 'সেজন্যে কাল তাকে আমি দেখতে পাইনি।'

'ও কথা বোলো না,' বললাম আমি। 'কাল সকালে সে সুস্থ ছিল। ঘটনা ঘটেছে সন্ধ্যার পরে।'

'যখনই ঘটুক, সেকারণেই কাল সকালে তাকে আমি দেখতে পাইনি,' বলল জেনি। 'একই ঘটনা ঘটেছিল মিসেস বার্নেস ও মিস পেট্রেলের ক্ষেত্রে।' ভয়ে কেঁপে গেল তার কণ্ঠ। 'অবিশ্বাস্য! আমি বুঝতে পারছি না মা! এমন ঘটছে কেন?'

দেখলাম ভীষণ ভয় পেয়েছে জেনি। প্রকাশ পেতে দিলাম না তাই নিজের ভয়টা। হেসে বললাম, 'আসলে কিছুই ঘটেনি, মামণি। সবই তোমার কল্পনা।' কিন্তু ভয়টা লুকোতে পারলাম না আমি হ্যারল্ডের কাছে। বললাম তাকে দুধওয়ালার ঘটনাটা। এবারও হেসে উড়িয়ে দিল সে। বলল, 'বাদ দাও এসব। জেনি আসলে চাইছে সবার নজর কাড়তে। মনে করছে সে যা বলছে সেটাই সত্য হচ্ছে। এসব ফালতু কথা যেন আমার সামনে এসে না বলে। তাহলে পিটিয়ে সোজা করে ফেলব।'

অনেকদিন হাঁটাচলা করতে পারছে না আমার শাশুড়ি। খুব অসুস্থ সে। সেদিন সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যাবার কথা। হঠাৎ জেনি ফিসফিস করে বলল, 'মনে করো তাকে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম না, তাহলে কী হবে তুমি তো জানো।' হ্যারল্ডের কথা সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমার। মনে হয় ঠিকই বলেছে হ্যারল্ড। জেনির মধ্যে একধরনের নাটক করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সে চায় সবকিছুর মধ্যমণি হতে। আচ্ছা আমার শাশুড়িকে দেখতে গিয়ে যদি সে সত্যিসত্যিই বলে সেখানে কেউ নেই—তাহলে? সেরকম কিছু ঘটল না। বাড়ি ফেরার সময় জেনি বলল, 'ওনাকে নিয়ে ভেবো না, বাবা। মরতে অনেক দেরি আছে।'

'তোমার মতামত শুনতে চাচ্ছি না আমরা,' তীব্রস্বরে বলল হ্যারল্ড। 'মা এখনি মরছেন কে বলেছে তোমাকে?'

হাসল জেনি। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। সেই দৃষ্টি দেখে আবারও ভয় পেলাম আমি।

জেনির ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে গেলাম ডাক্তারের সাথে। আমাদের পারিবারিক বন্ধু সে। তিনটে ঘটনাই খুলে বললাম ওকে। সবকিছু শুনে হাসল ডাক্তার। বলল, 'বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমার জেনি। কিন্তু বয়সটা হল খারাপ। কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি। এ বয়সে মেয়েরা অনেক পাগলামিই করে। মনের মধ্যে থাকে ফুরফুরে ভাব। বাতাসে ভাসতে থাকে। নিজেকে মনে করে অন্য জগতের কেউ। দোষ তার না, দোষ বয়সের। শরীর ঠিক আছে তো?'

'দেখলে তো মনে হয় সুস্থই।'

'এ বয়সে এরকম হওয়াটা স্বাভাবিক,' বলল ডাক্তার। 'তার কিচ্ছু হয়নি। তবে অনেক সময় কারও কারও মধ্যে অতীন্দ্রিয় চেতনা দেখা দেয়। ভবিষ্যৎ মৃত্যুকে সে দেখতে পায়। এ নিয়ে হৈচৈ করার কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবে মেনে নাও। তবে তার সাথে এসব নিয়ে বেশি আলোচনা কোরো না। তাহলে তার আগ্রহ বেড়ে যাবে আরও। এ নিয়ে বেশি চিন্তা কোরো না। কী ব্যাপার, এত ফ্যাকাশে লাগছে কেন তোমাকে? রাতে বুঝি ঘুম হয় না?'

'একদম ঘুমাতে পারি না ডাক্তার,' বললাম আমি। 'ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে।

প্রেসক্রিপশন লিখল ডাক্তার। ঘুমের ওষুধ দিয়েছে আমাকে। বাড়ি ফিরে এলাম ওটা নিয়ে।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ঘটল না কিছুই। সামনে জেনির পরীক্ষা। তাই নিয়ে ব্যস্ত ও। সেই সাথে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পড়াশোনা বিশেষ করেনি সে। প্রস্তুতি ভালো না। তার ভয়, প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর সে হয়তো কিছুই লিখতে পারবে না।

দেখতে দেখতে চলে এল পরীক্ষার দিন। ওর জন্যে নাস্তা বানালাম আমি। কিন্তু নাস্তা খেতে নিচে নামল না সে। কয়েকবার ডেকেও সাড়া পেলাম না তার। শেষপর্যন্ত আমি গেলাম তার রুমের দিকে। দেখি বিছানায় বসে আছে সে। ভয়ংকর আতঙ্কে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

'এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো,' ডাকলাম ওকে।

'স্কুলে যাব না আজ। ভালো লাগছে না।' জবাব দিল সে। 'আমি এখানেই থাকব।'

'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছে?'

'হ্যাঁ, মা। খুব অসুস্থ আমি। ভয়ানক অসুস্থ। স্কুলে যেতে পারব না।'

'তাহলে ডাক্তারকে খবর দিই।'

'না। তিনি এসে বলবেন যে আমার কিচ্ছু হয়নি।'

'কিছু হলে তবে তো বলবে? জেনি তোমাকে স্কুলে অবশ্যই যেতে হবে। পরীক্ষা তুমি আগেও দিয়েছ। একটা পরীক্ষা খারাপ হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

'আমি পরীক্ষা নিয়ে ভাবছি না,' বলল জেনি। 'ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি, আমি মরতে চাই না, মা।'

'কী আজেবাজে কথা বলছ? মরতে যাবে কেন তুমি?'

'আমি বাড়িতেই নিরাপদে থাকতে চাই, মা। বাইরে বেরোলে আমার খুব বিপদ হবে।'

'কিসের বিপদ?'

'যেকোনো ধরনের বিপদ হতে পারে। গাড়ি আমাকে চাপা দিতে পারে, আগুন লাগতে পারে, কেউ আক্রমণ করতে পারে, যেকোনো বিপদ একটা ঘটবেই।'

'রাতে কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। সে তো প্রায়ই দেখি। কিন্তু স্বপ্নের কথা নয়। মা, আমাকে তুমি বাইরে যেতে বোলো না।' হঠাৎ করে কাঁদতে শুরু করল জেনি।

হাত বুলিয়ে দিলাম তার পিঠে। গাঢ় স্বরে বললাম, 'তোমার ভয়টা কী নিয়ে তা আমাকে বললে তোমাকে বাড়িতে থাকতে দেব। নিশ্চয় পরীক্ষার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ?'

'ওটা তো সামান্য ব্যাপার,' বলল জেনি। 'যদি সত্যি কথা বলি, তুমি তাহলে বিশ্বাস করবে না।'

'বলোই না!'

'বলছি। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নায় মুখ দেখলাম।'

তার ভেজা, ফ্যাকাশে, ভয় পাওয়া ছোট্ট মুখটার দিকে তাকালাম আমি। আস্তে করে বললাম, 'সকালে সবার মুখ অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। তাই কি?'

আমার রসিকতা গায়ে মাখল না সে। বলল, 'ড্রেসিং টেবিল থেকে আয়নাটা নিয়ে এসো।'

আয়নাটা এনে তার হাতে দিলাম।

'আমার পেছনে এসে দাঁড়াও,' বলল সে।

আমি তার কথা শুনলাম। দাঁড়ালাম তার পেছনে। আয়নাটা সামনে মেলে ধরল ও। আমি আমার ও তার মুখটা আয়নায় দেখতে পেলাম। ঠাট্টা করে বললাম, 'আহ্ কী সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের।'

'আমাদের? শুষ্ককণ্ঠে বলল ও। 'কী দেখতে পাচ্ছ তুমি?'

'তোমাকে ও আমাকে।' বললাম আমি। 'আমাদের দুজনকে।'

আয়নাটা ছুড়ে ফেলে দিল জেনি। বলল, 'আমি দুজনকে দেখছি না। আমি দেখছি শুধু তোমাকে। নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না। এর কী অর্থ তুমি জানো?'

বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া রোগের কথা হঠাৎ করে মনে পড়ল আমার। বইতে

পড়ছি। শুনেছি রেডিওতে। এখন দেখছি তা নিজের ঘরের মধ্যেই। ওর কণ্ঠ শুনেই বুঝছি মিথ্যেকথা বলছে না ও।

'পরীক্ষার সময় অসুখ বাধিয়ে ভালোই করেছ তুমি,' বললাম আমি। 'আর সবাই যখন পরীক্ষার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়বে তখন চাদর মুড়ি দিয়ে আরামে শুয়ে থাকবে তুমি। নাও, শুয়ে পড়ো, দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'ধন্যবাদ, মা!' ফুঁপিয়ে উঠল জেনি। শুয়ে পড়ল। গাল বেয়ে নেমে পড়ল অশ্রুধারা।

নিচে নেমে হ্যারল্ডকে বললাম আমি। কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল ও। থেমে গেল। বলল, 'আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই তো? ভালোই ধোঁকা দিয়েছে তোমাকে।'

'সত্যিকথাই বলছে ও,' বললাম আমি। একেবারে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে মেয়েটা। আয়নায় তাকিয়ে নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না।'

'কল্পনার রাজ্যে আছে ও,' বলল হ্যারল্ড। 'সব কিছুই ওর কল্পনা। পরীক্ষা না হয়ে যদি স্কুলে উৎসব হত দেখতে সে এমন করত না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

'আমি জেনিকে বিশ্বাস করি। ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি আমি।'

'আমাকে আবার এর মধ্যে জড়িও না।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হ্যারল্ড। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। ওকে যতটুকু ভালোবাসি ততটুকুই ঘৃণা করি।

ডাক্তার এল। কাঁদতে কাঁদতে সব কথা ওকে খুলে বলল জেনি। ডাক্তার 'হ্যাঁ,' 'হুঁ' করে গেল। তারপর মুখ ফেরাল আমার দিকে। 'বিছানায় শুইয়ে রেখো ওকে। এতে কিছুটা ভালো লাগবে।' উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। আমাকে বাইরে এনে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল। বলল, 'হালকা ঘুমের বড়ি এটা। পরীক্ষার সময় অনেক ছেলেমেয়েকে খাইয়ে ভালো ফলাফল পেয়েছি। ওষুধের দোকান থেকে নিয়ে এসো। দুপুরে একটা, বিকেলে একটা, শোবার সময় একটা, আবার কাল সকালে একটা দিও। দেখবে স্থির মনে পরীক্ষা দিতে পারছে ও।'

'তোমার ধারণা স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপের জন্যে এটা হচ্ছে?'

'আমার ধারণা তাই। বেশি পরিশ্রম করে "হিস্টিরিয়া"তে আক্রান্ত হয়েছে। সন্ধ্যার দিকেই অনেকটা ভালো হয়ে যাবে। ওষুধগুলো যাতে ঠিকমতো খায় সেদিকে লক্ষ্য রেখো। ভয়ের কিছু নেই। আশা করছি তাড়াতাড়িই ভালো হয়ে যাবে। অবস্থার উন্নতি না হলে আমাকে রিং কোরো।'

ডাক্তার চলে যাবার পর উপরে উঠলাম আমি। জেনিকে বললাম, 'ওষুধ আনতে

যাচ্ছি দোকানে। আধঘণ্টা লাগবে। একা একা থাকতে পারবে তো?'

'পারব,' বলল জেনি। 'বিছানায় তো কোনো ভয় নেই, তাই না?'

দুহাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল জেনি। ওর হাতদুটোকে খুব সরু মনে হলো। এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার, তার সেই উৎকণ্ঠে ভরা গাঢ় আলিঙ্গন অন্য সববারের চাইতে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ওষুধ আনতে বেরিয়ে গেলাম আমি। মেয়েটা যাতে বেশিক্ষণ একা একা না থাকে সেজন্যে প্রায় ছুটতে ছুটতে দোকানের দিকে গেলাম।

ফেরার সময় চিন্তায় এতটা মগ্ন ছিলাম যে লক্ষ করিনি মাথার উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই তার প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখলাম খুব নিচু দিয়ে যাচ্ছে বিমানটা। ইঞ্জিনটা একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার চলছে। গর্জনটাও সেইসাথে একবার কমছে, একবার বাড়ছে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা থেমে গেল। আর কোনো শব্দ নেই। কী ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। দেখলাম ইঞ্জিনটা সোজা নেমে এল। আমি যে রাস্তা ধরে এতক্ষণ হাঁটছিলাম তার ওপাশের বাড়িগুলোর পেছনে প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল। চমকে উঠলাম আমি। ওদিকেই তো আমাদের বাড়ি। আর ঠিক তখনই শুনতে পেলাম গগনবিদারী একটা আর্তনাদ।

ছুটতে লাগলাম আমি। এত দ্রুত এর আগে জীবনে হাঁটিনি কখনও। যখন বাড়িতে পৌঁছলাম দেখলাম সেটা তখন একটা ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

আগুন জ্বলছে পুরো বাড়িতে। লক লক করে বেড়ে উঠছে আগুনের শিখা। ভাঙা প্লেনটা ইঁট, পাথর ও কাচের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। এবং পড়ে আছে বিমানচালকের রক্ত-মাংস-হাড়। পুড়ছে চড় চড় করে। আর পড়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে। আমার মেয়ে জেনি। মৃত।

এটাই হল অনেক দিন আগের সেই ঘটনা। আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফেলে। আমি খুঁজে পাই না এ রহস্যের কোনো সমাধান। দুঃসহ সেই স্মৃতি এখনও ডুকরে কাঁদে আমার বুকে। এখন বুঝতে পারছেন তো বিমানের শব্দ শুনলে কেন আমি এত ভয় পাই আর কেন শুনতে পাই অপার্থিব আর্তনাদ, যে আর্তনাদের শব্দ কেবল আমি একাই শুনি— আর কেউ শুনতে পায় না।

মূল : রোজমেরি টিমপারলি

রূপান্তর : মিজানুর রহমান কল্লোল

কালীর অভিশাপ

'এমন মৃত্যু একমাত্র এই রহস্যময় উপমহাদেশেই সম্ভব—' কথাটা বলেই ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। 'মানুষ কেন যে হিংস্র গল্প শুনতে পছন্দ করে বুঝি না। এই পৃথিবীতে সুন্দর কাহিনীর তো অভাব নেই।' তাঁর দৃষ্টি সামনের রাস্তার চলমান মানুষের সারিতে।

আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল। অনুভব করলাম আমি আমার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে চলেছি। এ আমার এক বিচিত্র শখ। যখন কোনো নতুন দেশে যাই তখন সেদেশের সেরা রহস্য হত্যাকাণ্ডের সত্য কাহিনী থেকে সেরা গল্পটি আমার সংগ্রহের খাতায় তুলে রাখি। সত্যিই এমন মৃত্যু একমাত্র রহস্যময় এই উপমহাদেশেই সম্ভব। গল্পটা যখন শুনি তখন আমি এর শেষটা কল্পনাও করতে পারিনি। ঘটনাটা বুঝতে হলে এই পাক-ভারত উপমহাদেশের মূল সংস্কৃতির গভীরে যেতে হবে। এ দেশটাই যে এমন। এদেশের মানুষ তার প্রতিটি দিন যাপন করে ভূত, প্রেত, অপদেবতা আর পিশাচের রাজ্যে। এদেশের মানুষের দুটো পৃথিবী আছে। এক হচ্ছে তার আত্মার জগৎ আর অপরটি হচ্ছে অতিবাস্তব বস্তুগত জগৎ।

এ গল্পের ভিকটিম বা মূল নায়ক—রমেন্দ্রনাথ। তার মৃত্যু হয়েছিল এক অভিশাপে। হ্যাঁ, সবচাইতে ভয়ংকর অভিশাপ বলে যাকে মানা হয়, সেই কালীর অভিশাপেই তার মৃত্যু হয়েছিল। এই বিংশ শতাব্দীতে এটা অবাস্তব মনে হলেও ঘটনা আসলে সত্যিই ঘটেছিল।

রমেন্দ্রনাথ এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। শিশুকালেই সে তার মা-বাবাকে হারায়। তার এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিসির কাছে মানুষ হয় সে। নিকটআত্মীয়ের মধ্যে ওই পিসি ছাড়াও তার এক ভাই ছিল জগদীশ। তার আপন ভাই নয়, সৎভাই। রমেন্দ্রনাথের বাবা যদিও তাদের দুই ভাইয়ের মাঝে সম্পত্তি সমান দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তবু জগদীশ রমেন্দ্রনাথের চাইতে বয়সে বেশ ক'বছরের বড় হওয়ায় দেখাশোনার দায়িত্বটা তার ওপরই বর্তেছিল। রমেন তার লেখাপড়া নিয়ে পিসির আঁচলের তলায় দিন বেশ ভালোই কাটাচ্ছিল। পিসির মাত্রাতিরিক্ত স্নেহের শাসন ছাড়া জীবন নিয়ে তার আর কোনো সমস্যাই ছিল না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সন্তানের জন্য যে উৎকণ্ঠা মায়ের মনে চিরদিন বাসা বেঁধে থাকে রমেনের পিসি শান্তাদেবীর মনে তা একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। তাই

রমেনকে মাঝে মাঝেই পারিবারিক ডাক্তার সিন্ধের সামনে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাজিরা দিতে হত। ভারতীয় হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ডা. সিন্ধ এদেশের সমস্ত কুসংস্কারে উর্ধ্বে বাস করতেন।

এভাবেই দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছিল, তাই পিসি যখন রমেনকে জগদীশ সম্পর্কে সাবধান করতে লাগলেন তখন প্রথম প্রথম রমেন সেকথার কোনো গুরুত্বই দিল না। তবু পিসি বারবার বলতে লাগলেন, 'তুই জগদীশকে খুব বেশি বিশ্বাস করছিস। তার কাছ থেকে অন্তত তোর অংশটুকু আলাদা করে নে। আর নিজেই নিজেরটা দেখাশোনা কর্।' কিন্তু সৎভাইয়ের উপর রমেনের অটল বিশ্বাস। তবে এই বিশ্বাসের ভিত একদিন নড়ে উঠল। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রমেনকে ডেকে তার আর জগদীশের অ্যাকাউন্টের অসামঞ্জস্যের কথা তাকে জানাল। রমেনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এতবড় প্রতারণা! তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে সোজা বাড়ি ফিরে জগদীশের ঘরে ঢুকল। সেদিন সকাল থেকে জগদীশের সামান্য জ্বর হয়েছে। সে তার ঘরেই শুয়েছিল। রমেন যখন তার ঘরে এল তখন ডা. সিন্ধ তার দেহের তাপ নিচ্ছিলেন। রমেন তার সামনেই জগদীশের কাছে তার সম্পত্তির হিসাব দাবি করে বসল।

তুমি আমার সম্পত্তির এতদিনের আয়ের সবটুকুই আত্মসাৎ করেছ। ঠগ! জোচ্চর!

রমেন বড় দুঃখে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

তোমার মতো উজবুক এই পৃথিবীতে দুটো নেই। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে এতদিন তোমার সম্পত্তি দেখাশোনা করেছি?

জগদীশের মুখে ক্রূর হাসির রেখা। আতঙ্কিত হয়ে রমেন অনুভব করল তার সৎভাই তাকে কোনোদিনই একমুহূর্তের তরেও ভালোবাসেনি। পিসির সাবধানবাণী তার মনে পড়ে গেল।

তুমি যা করেছ তা আইনের চোখে অপরাধ। তবু তুমি আমার ভাই, তাই আইনের আশ্রয় আমি নেব না। তুমি তোমার অংশ থেকে আমার টাকা বুঝিয়ে দাও আর আমার অংশ আলাদা করে দাও। যদি ভালয় ভালয় না করো তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে আমি বাধ্য হব। তোমাকে জেলের ভাত যদি না-খাওয়াই তবে আমার নাম রমেনই নয়।

কিন্তু তাহলে তো আমার ভাগে আর কিছুই থাকে না। আমাকে পথের ফকির হতে হবে।

আমার অংশ চুরি করবার সময় সেকথা তোমার মনে ছিল না? এখন নাকিকান্না কেঁদে কোনো লাভ হবে না।

আমি তোর বড়ভাই। এতবড় কথা তুই আমাকে বললি! দাঁড়া এই পৈতে ছুঁয়ে আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—না, ঐ বুড়ির একথা শোনা দরকার—। জগদীশ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বুড়ি পিসিকে হাত ধরে হিড়হিড় করে ঘরে টেনে নিয়ে এল। —শোন্ বুড়ি! আমি আমার বাপের আর তোর সবচাইতে প্রিয় রমেনকে অভিশাপ দিচ্ছি।—

না, না, জগদীশ! এ কাজ করিস না বাবা! রমেন তোর ছোটভাই।

বৃদ্ধার স্বরে মিনতি।

এতক্ষণ ডা. সিন্ধ চুপচাপ সবকিছু, শুনছিলেন। পিসির আকুলতা দেখে আর চুপ থাকতে পারলেন না।

অভিশাপকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? অভিশাপ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আপনি শান্ত হোন।

কিন্তু জগদীশকে থামানো গেল না। সে ভয়ে বিবর্ণ রমেনের দিকে ফিরে পৈতেয় আঙুল জড়িয়ে বলে উঠল— আমি তোমাকে মা কালীর নামে অভিশাপ দিচ্ছি। তিনি যেন তোমার এই সুন্দর জিভটাকে, যার সাহায্যে তুমি আমাকে এত বড় বড় সুন্দর সুন্দর কথা বললে, সেই জিভটাকে কুৎসিত, বিকট করে দেন। তা যেন ফুলে ওঠে আর হলুদ ছাতায় ঢেকে যায়। আলো তোমার প্রিয়, তাই না? আজ থেকে যেন তুমি অনন্ত অন্ধকার জগতে বাস করবার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করো। ভরা বৈশাখে গুলমোহরের গাছ যেমন সোনার মতো জ্বলতে থাকে ঠিক তেমনি যেন তোমার গায়ের চামড়া জ্বলতে থাকে আর কুৎসিতভাবে তোমার চামড়া যেন ফেটে ফেটে যায়। মা কালী যেন তোমার মাথায় হাজার হাজার খাঁড়ার ঘা মেরে রক্তাক্ত করেন। আর সবশেষে অসহ্য যন্ত্রণায় দেহ মোচড়াতে মোচড়াতে তুমি এ পৃথিবী থেকে যেন বিদায় নাও।

কথা শেষ করেই জগদীশ বিছানায় আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। আর রমেন? সে যেন রাহুগ্রস্ত। কাঠের পুতুলের মতো নিষ্প্রাণভাবে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। পিসি যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। রমেন ঘর ছেড়ে যেতেই চিৎকার করে মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ডা. সিন্ধ দ্রুত জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

এসব ছেলেমানুষিতে এত বিশ্বাস করছেন কেন বলুন তো? অভিশাপেই যদি সবকিছু হত তাহলে এ পৃথিবী কবেই শেষ হয়ে যেত।

কিন্তু তার এসব কথা বৃদ্ধাকে কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারল না। ও মরে যাবে। ও মরে যাবে! শান্তাদেবী পাগলের মতো এই একটা কথাই বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। নিরাশ হয়ে ডা. সিন্ধ রমেনের ঘরে গেলেন। রমেন তার বিছানায় শুয়েছিল চুপচাপ।

রমেন, তুমি অন্তত একথা বিশ্বাস কারো না। এটা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন শিক্ষিত ছেলের পক্ষে এটা শোভা পায় না।

রমেন ডাক্তারের কথার কোনো জবাব না দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুল। অগত্যা ডাক্তার আর কী করেন। তিনি রমেনের অনুমতি নিয়ে তাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিলেন একটা। মন শান্ত করার জন্য সত্যিই তার এখন ঘুমের প্রয়োজন।

পরের দিন মধ্যরাতে রমেনের বাড়িতে ডাক্তারের ডাক পড়ল। বৃদ্ধা শান্তাদেবী দরজায় দাঁড়িয়ে।

শুরু হয়ে গেছে। অভিশাপ শুরু হয়ে গেছে।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা।

জগদীশ কোথায়?

ডাক্তারের কণ্ঠে উষ্মা।

আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে। আর ফেরেনি। কিন্তু সে তো কিছু করেনি ডাক্তার, কিচ্ছু করেনি। সে শুধু আমার মানিকের মাথার উপর কালীর অভিশাপ দিয়েছে।

ডাক্তার দ্রুত রমেনের ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললেন।

আলো নেভাও। আমার অন্ধকার চাই। আলো আমার সহ্য হয় না।

রমেন চিৎকার করে উঠল।

ডাক্তার রমেনের চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিলেন। পিসিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এটা হিস্টিরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, ইট ইজ নাথিং বাট অটোসাজেশান।

কিন্তু রমেনের গায়ের তাপ মেপে তিনি চমকে উঠলেন। ১০৫° সে-এর উপরে। দ্রুত প্রশ্ন করলেন, তোমার মাথায় কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে?

মনে হচ্ছে হাজার হাজার খাড়ার ঘায়ে মাথার ভিতরটা রক্তাক্ত হচ্ছে।—

দুঃখের হাসি হেসে রমেন ডাক্তারকে জানাল। তারপর দুহাতে মাথা ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

ডাক্তার খুব সাবধানে তাকে পরীক্ষা করলেন। তার জিভ ফুলে উঠেছে আর শাদা ছাতায় ঢেকে গেছে। কিছু কিছু অংশ হলুদ হতে শুরু করেছে। সব মিলে জিভটা এত ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে যে ডাক্তার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। তিনি রমেনের রক্তের স্যাম্পল নিয়ে দ্রুত কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে যখন ফিরলেন তখন তার মুখ আরও গম্ভীর। রক্ত পরীক্ষায় কিছুই ধরা পড়েনি। কিছুই না!

আমি আমার জানামতে সবকটি ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্ট করেছি। নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। আমি আবার পরীক্ষা করব।

তার স্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তুমি কিছুই পাবে না, বাবা। এ যে কালীর অভিশাপ।

ভীত দর্শকে বাড়ি ভরে গেছে। তারা রমেনের পিসিকে রোগীর সেবার কাজে সাহায্য করছে। ডাক্তার আবার রমেনকে পরীক্ষা করলেন। রমেনের চামড়া দেখে তার জগদীশের কথা মনে পড়ে গেল— তোমার চামড়া কুৎসিতভাবে ফেটে ফেটে যাবে— । তিনি পাগলের মতো একের-পর-এক পরীক্ষা করে চললেন। কিছুতেই তিনি হার মানবেন না।

নেগেটিভ! আমার সমস্ত জীবনের শিক্ষা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে! আমি ভাবতেই পারছি না।

এ যে কালীর নামে ব্রাহ্মণের অভিশাপ।

বৃদ্ধার ঐ একই কথা।

দুদিন পর রমেন্দ্রনাথ মারা গেল। মারা গেল জগদীশ যেমন বলেছিল ঠিক তেমনিভাবে নিদারুণ যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে। আর ডা. সিন্ধ? তিনি শত চেষ্টা করেও রমেনের মৃত্যুর কোনো কারণই বলতে পারলেন না।

আমার বন্ধু গল্প শেষ করলেন।

মাফ করবেন, একটা প্রশ্ন করব?

করুন।

ডা. সিন্ধের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তিনি ধরতে পারেননি।

বরং উল্টো। একজন চিকিৎসক হিসাবে তার যোগ্যতা সন্দেহাতীত। বিশেষ করে প্যাথলজি আর ব্যাকটেরিওলজিতে।

কিন্তু এ যে অসম্ভব!

পাশ্চাত্য সভ্যতা সবসময়ই এই উপমহাদেশের সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখে।

আমার বন্ধু হাসলেন। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন। এ অসম্ভব।

আমি ঠিক বুঝলাম না।

রমেনের এক শিক্ষক। তিনি ইউনিভার্সিটির বৈদিক ফিলসফির অধ্যাপক। তিনি কিছুতেই এ মৃত্যু সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। হ্যাঁ, সে শিক্ষক আমিই। রমেন আমার বড় প্রিয় ছাত্র ছিল। পুলিশে খবর দিয়ে রমেনের পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করলাম। রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশ জগদীশ আর তার সঙ্গীকে গ্রেফতার করল। বিচারে তাদের দোষও প্রমাণিত হলো। হ্যাঁ, জগদীশ যখন বুঝল তার সব প্রতারণা ধরা পড়ে গেছে তখন সে আর একজনের সাহায্যে তার ভাইকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল।

আপনি কিন্তু এখনও জগদীশের সঙ্গীর নাম বলেননি। কে সে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে বন্ধু নামটি উচ্চারণ করলেন—ডা. সিন্ধ। তার শেখানো কথাগুলো জগদীশ যখন নিপুণভাবে অভিনয় করে বলে গেল, তখন তিনি রমেনের ঘরে গেলেন আর ঘুমের ওষুধের বদলে হতভাগ্যের শিরায় ঢুকিয়ে দিলেন বিউবনিক প্লেগে'র জীবাণু। পাশ্চাত্যের অস্ত্র আর প্রাচ্যের কুসংস্কার এমন সুন্দরভাবে তিনি মিলিয়ে ছিলেন! সত্যিই একটা অসাধারণ প্রতিভা। আপনি কি বলেন?'

মূল : এলেরি কুইন

রূপান্তর : মুশতারী বানু

ফাঙ্গাস

এক

গভীর রাতে সাগর নাকি কাছে চলে আসে— বইতে পড়েছে বাবুই। অযুত নিযুত তারাজ্বলা আকাশের নিচে কালচে-নীল ঢেউগুলোর শুভ্র ফেনামাখা প্রান্ত রুপালি দেখায়...চাঁদের আলোতে। পৃথিবীতে নাকি এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য আর হতে পারে না।

সুন্দর। এবং ভয়ংকর।

ভয়ংকর সুন্দর!

এত দেখতে ইচ্ছা করে!

বাবুই শুনেছে, পাহাড়ের ওপর এই প্রাচীনকালের বাড়িটা থেকে সাগর নাকি খুব বেশিদূর নয়। বাসে করে যেতে বড়জোর এক কি দেড় ঘণ্টা। এইজন্যই বেশ একটু আশা করতে পারছে সাগর দেখার। এখন থেকে যখন এই 'প্রায়' জঙ্গল জায়গাটাই তাদের বাড়ি, তখন সম্ভাবনাটাও বেশ উজ্জ্বল।

বাবুইর অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগে না। ঢাকায় স্কুল আর বন্ধুদের জন্য যা একটু মনখারাপ। তবে এখানকার স্কুলও ভালোই। ঢাকার নামী ইংলিশ মিডিয়ামের তুলনায় হয়তো ছোট্ট কিন্ডারগার্টেনটা কিছুই নয়, তবুও বন্ধুরা খুব ভালো। ঢাকার চাইতেও ভালো। অনেকগুলো পাহাড়ি ছেলেমেয়ে তার বন্ধু হয়েছে। এমনকি দু-একটা পাহাড়ি শব্দও শেখা হয়েছে।

শেষ বিকেলের গোধূলি-ছোঁয়া বাতাসকে ফুসফুসে প্রবেশের অবাধ অনুমতি দেয় বাবুই। ফুসফুস থেকে লোহিত কণিকায়; আর ক্রমশ ধমনি বেয়ে ছুটে চলে হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কে, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে...বিশুদ্ধ অক্সিজেন!

আকাশটাও এখন ভয়াবহ সুন্দর। পাহাড়ি অঞ্চলের সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত অবশ্য এমনই— প্রত্যেকবার বিস্মিত করবার জন্য যথেষ্ট। কী যেন বলে চাকমা ভাষায়?...'আগাশ'। মানে আকাশ। আচ্ছা, গোধূলি রাঙা আকাশকে কী বলে?

ভাবনাগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না বালক মনে। আধুনিক তিনতলা সমান উঁচু এই দোতলা 'প্রাসাদের' ছাদে দাঁড়ালে প্রকৃতিই সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়। নিতে বাধ্য! তবে বাবুইর মনোযোগ কেড়েছে আজ অন্য কিছু। এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা কিছু।

সিঁড়িঘরের দেয়ালে লেখা কয়েকটা সংখ্যা। দেয়াল মানে একদম সিলিঙের

কাছাকাছি। নোনাধরা, শ্যাওলাপড়া দেয়ালের বুকে কালচে মেরুন রঙে লেখা অস্পষ্ট কয়েকটা সংখ্যা।

১৭/০৭

১৯৮৫

দেয়াল জুড়ে শাদা শাদা ছত্রাকের মতো কী একটা জন্মেছে বলে আরও কিছু লেখা আছে কি না পড়ার কোনও উপায় নেই। কিন্তু কে লিখতে পারে? তাও এত উপরে? সংখ্যাগুলোর মানেও বোঝা যাচ্ছে না...

না না, একটু বোধহয় যাচ্ছে। যেমন, ১৭ একটা প্রাইম নাম্বার। ৭-ও একটা প্রাইম নাম্বার। কিন্তু তারপর? ১৯ একটা প্রাইম নাম্বার অবশ্যই, কিন্তু ৮৫ তো নয়!

অবশ্য আরও একটা মিল আছে। এরা সবগুলোই বিজোড় সংখ্যা...

মাকে পাওয়া যায় রান্নাঘরেই। জানালার কার্নিশ পরিষ্কারের জন্য উঠেপড়ে লেগে আছেন। এক সপ্তাহ হল এখানে আসা হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে পুরো বাড়ি পরিষ্কার করতে একটা বছর পার হয়ে যাবে। নোনাধরা দেয়ালগুলো দেখলে এমনিতেই মন খারাপ হয়ে আসে। তার ওপর কেমন শ্যাওলাপড়া বাথরুম, দেয়াল, বাইরের বাগানটা। এতখানি জায়গা, অথচ শ্যাওলা আর জংলি আগাছায় ছেয়ে আছে। কেয়ারটেকার লোকটা এতগুলো বছর যে স্রেফ ফাঁকি মেরেছে, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।

'মা, জানো, চারটার মাঝে তিনটা সংখ্যা না প্রাইম নাম্বার!'

কিসের কথা বলা হচ্ছে, বোঝেন মাহেরা সুলতানা এবং একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেন। বারো বছরের ছেলেটার শরীরে বুড়োমানুষের মস্তিষ্ক বন্দি। সর্বক্ষণ এমন সব বিষয় নিয়ে থাকবে, যেগুলো নিয়ে বড়রাও মাথা ঘামায় না। প্রিয় বিষয়? অঙ্ক। একদম বাবার স্বভাব!

'প্রাইম নাম্বারটা কী জিনিস, বাবা?'

মায়ের অজ্ঞতায় যেন খুশি হয় বালক, 'প্রাইম নাম্বার হল এমন একটা সংখ্যা, যাকে ১ এবং সেই সংখ্যাটা ছাড়া অন্য কোনও সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজন করা যায় না। এই যেমন ধরো— ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫১, ৫৩, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৯,...

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সংখ্যাগুলো প্রাইম নাম্বার হল তো কী হল?'

'কী আবার হবে? সংখ্যা কত মজার বিষয়...জানো মা, আমার জন্ম তারিখ-ও না প্রাইম নাম্বার।'

ছেলের কথাবার্তায় আজকাল আর বিস্মিত হন না মাহেরা বেগম, তবে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

'তোমার জন্ম তারিখও?'

'হুঁ। কীভাবে শুনবে? ১৩.৫.১৯৯৪। ১৩ একটা প্রাইম নাম্বার, ৫ একটা প্রাইম

নাম্বার। আর ১৯৯৪-কে যদি লিখো (১+৯+৯+৪), তা হলে যোগফল হল ২৩। মানে আরও একটা প্রাইম নাম্বার। আবার দেখো (১৩+৫+২৩) লিখলে যোগফল কত? ৪১! সেটাও একটা প্রাইম নাম্বার!'

এবার সত্যি সত্যি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মাহেরা বেগম। বাকি দিনটুকু মনে হচ্ছে প্রাইম নাম্বারের সাথেই কাটবে। বাবার মতো এই ছেলের মাথাতেও কিছু ঢুকলে সহসা বের হয় না। বাবা যেমন হঠাৎই একদিন নিজের এক রূপবতী ছাত্রীকে বিয়ে করে বাসায় নিয়ে এল...

চোখজোড়া জ্বালা করে ওঠে। অশ্রু আসি আসি করেও আসে না। বিশ বছর সংসার করার পর একমাত্র ছেলে আর অসুস্থ বাবাকে নিয়ে এমন আশ্রয়হীন অবস্থায় পড়তে হবে, কখনও কি কল্পনাও করেছিলেন? তা-ও প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায়। ছেলের খরচ নাহয় ওর বাবা দেবে। কিন্তু আর সব কীভাবে চলবে? এই বাড়িটা যদি বাবা তখন বিক্রি করে দিতেন, তা হলে যে কী হত তা ভাবতেও ভয় লাগে এখন।

বাবুই চলে গেছে। আবার জানালা পরিষ্কারে মন দিতে চেষ্টা করেন তিনি। এমন হতচ্ছাড়া শ্যাওলা, আজ পরিষ্কার করলেন তো দুদিন বাদে ফের গজিয়ে যাবে। আসলে ঠিক শ্যাওলাও নয়। ছত্রাকের মতো কিছু একটা। শাদাবর্ণের তুলো তুলো শরীর, তাতে সবুজ আভা কিংবা কালো কালো ফুটকি।

জানালার কাঠগুলো বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে। হতেই পারে, কালে কালে আর বাড়িটার বয়স তো কম হল না। পচা কাঠে এমন ছত্রাক-ফত্রাক জন্মে থাকে।

অবশ্য কাজের মাঝেও মাহেরার মন পড়ে থাকে অনেকটা দূরে মেইন গেটটার কাছে। এসেছে আজকে? পাঁচটা তো বোধহয় বেজে গেছে...

তাকে দেখতে পাচ্ছেন রোজই!

কতই বা বয়স হবে? তিন...বড়জোর সাড়ে তিন। পরনে শুধু একটা ছোট্ট, কালো হাফপ্যান্ট— শুভ্র শঙ্খের মতো গায়ের রঙের মাঝে প্রকট হয়ে থাকে। গাঢ় কালচে-বাদামী চুলগুলো শেষ বিকেলের আলোয় উজ্জ্বল হয়। এতদূর থেকেও বোঝা যায় কালো চোখের দৃষ্টি আর গোলাপি ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি। যেন মাহেরার জন্যই ওই হাসিটুকু।

পাহাড়ের সন্তান সে। সম্ভবত চাকমা শিশু। এত্ত সুন্দর বাবুটা যে দেখে একধরনের অস্বস্তি হয়। তবুও তাকিয়ে থাকার অমোঘ আকর্ষণ এড়াতে পারেন না।

মাহেরা জানেন না যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি মোহাবিষ্ট হয়ে যান প্রত্যেকদিন। এতটাই যে বাবুইর আর্ত চিৎকারটুকুও তাঁর শ্রবণসীমা পর্যন্ত পৌঁছে না।

এবং ভুলে যান—

আসলে মনে করতে পারেন না যে ঠিক এমন একটি মুখের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল বহুকাল আগে।

আঠারো বছরের ঝকঝকে এক পাহাড়ি তরুণ প্রেমিক ছিল তাঁর!

দুই

শোরগোলও কখনও দারুণ নিঃশব্দ হয়!

আঁধার প্রকৃতির যে নিজস্ব আওয়াজ, তার বুকেই বসবাস করে অপরিসীম শূন্যতা...নিঃস্তব্ধতা। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা গুঞ্জনই সহসা হাহাকার সৃষ্টি করে বুকের গহিনে। কিংবা...

কিংবা আরও গভীরে কোথাও।

অস্তিত্বের শেকড়ে।

'বাবুই...বাবুই!'

অন্ধকারের মাঝে যে কোথায় চলে যায় ছেলেটা! জংলা এলাকা, বিদ্যুতের ঝলকানিতেই সাপের ভয়ে অস্থির লাগে। আর এখন তো লোডশেডিং। কখন ফিরবে কে জানে! হোক লো-ভোল্টেজের টিমটিমে আলো, তবু ইলেকট্রিসিটির উপস্থিতি একটু সাহস জোগায় শহুরে মনের অহেতুক ধুকপুকানিতে।

দারোয়ান লাল মিয়াও নেই আশপাশে। অগত্যা নিজেই টর্চ হাতে বাগানে নামেন মাহেরা। বাড়ির পেছনের এ জায়গাটুকু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। বাবুই হয়তো খেলছে কোথাও। একচিলতে উঠোনে অবশ্য কাদামাখা কিছু পায়ের ছাপ ফুটে আছে। ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন...

এর মাঝে বন্ধুও যোগাড় হয়ে গেছে বুঝি?

তবে...না, বাবুই এখন একাই এবং খেলছেও না। সুবিশাল পাকুড়গাছটার গুঁড়িতে শুয়ে আছে কাত হয়ে। গায়ের গেঞ্জি কোথায় গেছে কে জানে! পরনে শুধু প্যান্ট।

কালো রঙের হাফপ্যান্ট!

শুয়ে থাকার ভঙ্গিটাও কেমন অস্বাভাবিক। জ্বর-টর এল না তো? জ্বর উঠলে এই ছেলে আবার গায়ের কাপড় খুলে ফেলে।

'জানো মা, সংখ্যাগুলো না আসলে একটা তারিখ। ১৭.৭.১৯৮৫ ইং। সবগুলোই প্রাইম নাম্বার...'

একটা নিশ্বাস ফেলে ছেলেকে তুলে নিতে উদ্যত হন মাহেরা। বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। উলট-পলট বকছে, মানে নির্ঘাত জ্বর এসেছে বাবুইর। ক্রমাগত প্রলাপম বকেই যাচ্ছে।

'প্রাইম নাম্বার...প্রাইম নাম্বার হল...১৭.৭.১৯৮৫ ইং! সতেরোই জুলাই, উনিশশো পঁচাশি...সতেরো, সতেরো, সতেরোই জুলাই। মা...মা জানো সতেরোই জুলাই। আজকে সতেরোই জুলাই...'

জানেন না কেন, সতেরোই জুলাই উনিশশো পঁচাশি ইং তারিখটা মাহেরার অভ্যন্তরেও ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছিল!

তিন

টুপ্...টাপ্...টুপ্!

শব্দটা মেঝেতে পানি পড়ার। ফোঁটায় ফোঁটায়।

টুপ্...টাপ্...টুপ্!...দারুণ চাপ সৃষ্টি করে আওয়াজটা নার্ভের ওপর। কেমন অশনি সংকেতের মতো কানে বাজে। আফ্রিকান যুদ্ধ-দামামার মাদকতার মতোই এই একঘেয়ে আওয়াজটাতেও আছে অদ্ভুত এক নেশা। শ্রবণ ইন্দ্রিয় তাই দারুণ সচেতন হয়ে ওঠে। মধ্যদুপুরের ঝড়বৃষ্টি ছাপিয়ে কানে বাজে শুধু... টুপ্...টাপ্...টুপ্!

অস্থির লাগে আওয়াজে। তবু বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। বিষণ্ন মনটা শরীরকে যেন চেপে ধরে রাখে। গত বিশ বছরে যা হয়নি, আজ তা-ই হচ্ছে। ভুলে যাওয়া, স্মৃতির অতলে দাফন করে রাখা একটুকরো ঘটনা আক্ষেপ তৈরি করছে বুকের গহিনে।

যদিও আক্ষেপের কিছু নেই, জানেন তিনি। মানুষকে কখনও জীবনের প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে হয়। নিজের স্বার্থেই হতে হয়। শরৎ যদি পরিবারের তাগিদে সব ভুলতে পেরেছিল, তিনি ভুলে গিয়ে কী এমন অন্যায় করেছেন?

... টুপ্...টাপ্...উফ!!

এবং ক্ষণিকের জন্য কাঁধে একটা হিমশীতল স্পর্শ। জান্তব গোঙানি।...হ্যাঁ, জান্তবই। মানবকণ্ঠ থেকে এমন আওয়াজ বের হতেই পারে না। অসম্ভব!

কিন্তু পেছনে তো বাবুই শুয়ে...চট করে উঠে বসেন মাহেরা। নাহ! কোথায় বাবুই? কোন্ ফাঁকে যে পালিয়ে চলে গেছে!

'আ...আ...! আ!'

ডাকটা সম্ভবত 'মা'। গোঙানিতে বিকৃত হয়ে অপার্থিব শোনায়।

হ্যাঁ। বাবুইটাই। কিন্তু...কিন্তু...

হাতজোড়া ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে। মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে লালা। আর ঘাড়টা এমনভাবে কাত হয়ে আছে... যেন ভেঙে গেছে। ছুটে আসছে ছেলেটা! গাঢ় লাল রঙের দাঁতগুলো বিকট হয়ে ফুটে আছে...

ছুটে আসছে!

আসছেই!

এখনই পৌঁছে যাবে সে। এক্ষুনি! ধরে ফেলবে!

চার

ক্ষীণ একটা চিৎকার দিয়ে উঠে বসেন তিনি।

উফ! কী ছিল ওটা? দুঃস্বপ্ন?

তাই-ই হবে। ঝড়বৃষ্টি দূরে থাক, কটকটে রোদ উঠেছে ইতিমধ্যেই। অথচ ঘড়িতে মাত্র সাতটা এবং বাবুইও জেগে গেছে। বিছানায় বসে সারি বেঁধে সাজিয়ে রাখছে একগাদা জিনিস। কলম, খাতা, ঘড়ি, পানির গ্লাস...যা যা হাতের কাছে পাচ্ছে।

অসুখটা হবার পর থেকে এই এক খেলা শুরু হয়েছে। সারাদিন একইভাবে বিছানায় বসে থাকে, সারি বেঁধে বারবার সাজায় উদ্ভট সব জিনিসপত্র। আর কথাবার্তা! একদমই বলে না।

ডাক্তার সাহেব অবশ্য ব্যাখ্যাটা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসলে মানসিক চাপের মধ্যে আছে ছেলেটা। বাবা-মার ডিভোর্স, হঠাৎ নতুন জায়গায় চলে আসা— তাও এমন নিঃসঙ্গ পরিবেশে। চিকিৎসা একটাই। ঢাকা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা।

অবশ্য মাহেরাও সেরকমই ভাবছেন আজকাল। অনেক বছর যাবৎ যত্নের অভাবে বাড়িটার অবস্থা শোচনীয়। খুব ভালোমতো সংস্কার না করিয়ে থাকাটা উচিত হবে না। সেদিন থেকে জ্বরের সাথে সাথে অ্যালার্জি উঠে ভরে গেছে বাবুইর পুরো শরীর। বাবার মাথায় চুলের গোড়াতেও হবহু এক সংক্রমণ। ডাক্তার সাহেব তো বলছেন, বাড়িটাই এর জন্য দায়ী। অনেক সময় জড়পদার্থের ওপর জন্মানো ছত্রাক প্রাণীশরীরের সংস্পর্শে এলে সেখানেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

মাহেরার মনে হল বাবুইর অ্যালার্জিটা মনে হয় গতকালের চাইতে বেড়েছে। পুরো শরীর শাদা রঙের চাকা চাকা দাগ। ফুলে আছে। দেখে কেন যেন মনে হয় খুব জ্বলুনি বোধহয় সেখানে। বাবাও সেরকমই বলেছেন। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন দুদিন হল।

অথচ বাবুই কোনওরকম সাড়াশব্দ করে না। শুধু গায়ে কাপড় দিতে গেলে চিৎকার করে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কী, চিৎকারটা শোনায় জানোয়ারের মতো।

আজকাল প্রশ্ন করলেও জবাব পাওয়া যায় না— মায়ের ওপর এতটাই অভিমান ছেলের। কিন্তু এখন নিজেই মুখ খোলে। হাসে না, তবে কথা বলে।

'মা জানো, চাইনিজরা কী বিশ্বাস করে? ওরা বিশ্বাস করে যে অপশক্তিরা সবসময় সোজাপথে চলাফেরা করে। আঁকাবাঁকা পথে তাঁরা যেতে পারে না।'

'এজন্যই বুঝি সবসময় তুমি সরলরেখা বানাচ্ছ?' ঠাট্টা করেই বলেন তিনি। কিন্তু জবাবে বাবুই যে একটুকরো হাসি উপহার দেয় তাতে হিম হয়ে আসে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত। ব্যাখ্যাতীত কোনও কারণে।

বাবুই কি তবে সত্যিই মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে? ভায়োলেন্ট কোনও মানসিক রোগী?

পাঁচ

মেয়েটি চোখেমুখে অসম্ভব ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে ছিল শিশুটির দিকে। মায়েরা কখনও সন্তানদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। কিন্তু এই কিশোরী মেয়েটি দেখছে। বিগত তিনবছর প্রাণপণে ঘৃণা করেছে সে বিছানায় শুইয়ে রাখা প্রাণীটিকে।

হ্যাঁ, প্রাণীই। মানুষ বলতে সে রাজি নয় কিছুতেই। শারীরিকভাবে চরম বিকলাঙ্গ কুৎসিত একটা শিশু। যার মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ লালা গড়ায়, কণ্ঠ দিয়ে গোঙানি ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ বের হয় না, তাকে জানোয়ার ছাড়া আর কিসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে?

বাবা তো সমাজের, ধর্মের দোহাই দিয়ে ছেড়ে চলে গেছে তাকে। এখন প্রাণীটা জ্বালাচ্ছে। সমাজে কুমারী মা হবার গঞ্জনা, পরিবারের অত্যাচার, পনেরো বছর বয়সে মা হবার বোঝা...সবকিছুর জন্য দায়ী এই প্রাণীটি।

শুধুমাত্র এই প্রাণীটি!

মেয়েটি চরম ঘৃণায় দুহাতে মুখ ঢাকে। ফুঁপিয়ে কাঁদে। না জানি কতরকম ওষুধপত্র খেয়ে গর্ভেই হত্যার চেষ্টা করেছে সে এটাকে। কিন্তু কিচ্ছুতে কিছু হয়নি। তবে...

তবে আজ হবে। বাবা বলেছে তাকে, কথা দিয়েছে। আর একটু পরেই মুক্তি তার। চিরতরে! এই প্রাণীটা থেকে এবং এই কুৎসিত এলাকা থেকেও।

আজীবনের মুক্তি!

একটা একটা করে মুহূর্ত অপেক্ষা করে কিশোরী। এবং সে দিনটি ছিল— ১৭ই জুলাই, ১৯৮৫ ইং!

'যাইবো, যাইবো। বেবাকটি যাইবো! খায়া ফালাইবো! বেবাকটিরে খায়া পালাইবো...'

উৎকট চিৎকারটা বাস্তবে টেনে নিয়ে আসে মাহেরাকে। সঞ্জয়! এ বাড়ির এত বছরের কেয়ারটেকার। ঢাকায় বসে তাঁরা কেউ জানতেও পারেননি যে লোকটার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে। রীতিমতো উন্মাদ যাকে বলে।

মাঝে মাঝেই বাড়ির সামনে দিয়ে এমন তারস্বরে চিৎকার করে। ছোটাছুটি করে। দারোয়ান দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করতে হয়।

'আসলে বাড়িটাই দোষী!' মনে মনে ভাবেন মাহেরা। যাবতীয় কুসংস্কার মুহূর্তে ঘিরে ধরে মনকে। ভিড় করে আসে যাবতীয় খারাপ ভাবনা— বাবুইর অমঙ্গল আশঙ্কায়। ভেতরে ভেতরে ভীষণ একটা তাগাদা বোধ করতে শুরু করেন বাড়িটা ছেড়ে দেবার জন্য। কে জানে, বাবুইর যদি সঞ্জয়ের মতো...

ভাবনা ফুরায় না। গেটের কাছে ছোট্ট দেবশিশুর মতো মানুষটা সমস্ত মনোযোগ

কেড়ে নেয়। পাঁচটা কি বেজে গেছে? উঁহুঁ। না। সবে তো দুপুর। তা হলে?

মোহাবিষ্ট মাহেরা টেরও পাচ্ছিলেন না প্রকৃতির শীতল পরিবর্তন। টের পাচ্ছিলেন না যে মেঘেরা ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ, বাতাসেরা। হয়ে উঠছে আর্দ্র, পাখিরা বাড়ি ফেরার জন্য উন্মাদ প্রায়।

ঠিক যেমন এক ঝড়ো দুপুর তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন!

প্রচণ্ডভাবে মোহাবিষ্ট মাহেরা জানতেও পারলেন না যে, পাশের ঘরে তাঁর বাবার মৃতদেহ ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। শরীরে ফুটে উঠতে শুরু করেছে শাদা বর্ণের চাকা চাকা কুৎসিত চিহ্ন। পড়ে গিয়েছে মাথার সমস্ত চুল।

ছয়

ছোট ছোট পায়ের চিহ্নগুলো অনুসরণ করেন তিনি সন্তর্পণে। ভুলে যান যে বাবুইর পায়ের চিহ্ন এখন আর অতটা ছোট্ট নেই।

কাদা মাখা, গুটি গুটি পায়ের পদচিহ্ন। সিঁড়ি বেয়ে সাবলীলভাবে নেমে গেছে মাটির নিচের ঘরটার দিকে। মাত্র মিনিট কয়েক পুরনো চিহ্ন। এখনও ভেজা।

যেন তাঁকে পথ দেখানোই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য!

তীব্র একটা বোটকা গন্ধ সিঁড়ির গোড়া থেকেই নাকে লাগছিল। ঠিক বোটকা গন্ধ নয়, আসলে অনেকটা ঝাঁঝালো মতন। এ ঘ্রাণটার উপস্থিতি অবশ্য পুরো বাড়িতেই অল্পবিস্তর পান। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে হাজার গুণ বেশি তীব্র।

একটু ঠেলা দিতেই খুলে যায় বেসমেন্টের দরজা। আর মাত্র পাঁচটা ধাপ নামলেই পৌঁছে যাবেন সেই ঘরে যেখান থেকে শব্দ দূরে থাক, হাওয়া পর্যন্ত বাইরে যেতে পারে না।

তবে সহসাই সিঁড়িতে পা রাখেন না। কারণ...

ভুলও হতে পারে। তবুও কেন যেন মনে হয় কিছু 'একটা' সড়সড় শব্দ তুলে ছুটে যায় অন্ধকারের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। এবং ঝাঁঝালো ঘ্রাণটা ছাপিয়ে নাকে এসে লাগে তীব্র একটা পচা গন্ধ। খুব তীব্র।

কোনও প্রাণীদেহ পচে যাবার ঘ্রাণ!

খুব কাছেই বজ্রপাতের গুড়গুড় শব্দ হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে মাহেরার বুকে। দারোয়ান বাড়ি নেই, বাবা ঘুমাচ্ছেন হয়তো...পুরো বাড়িটাতে একরকম একাই তিনি। যদি বাবুইকে খুঁজতে না হত, তা হলে হয়তো এখানে আসার মতো সাহস তিনি কখনও একত্রিত করতে পারতেন না। এখানেই তো নানা আর মা সেই প্রাণীটাকে...

নিজের অজান্তেই শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর এবং অসতর্ক হয়ে পরমুহূর্তেই...

আসলে মনে হল কে যেন শাড়ি ধরে টেনে ফেলে দিল তাঁকে। কিছু একটার ওপর ফেলে দিল, যার শরীর জুড়ে তুলো তুলো একটা অনুভব।

বাবুই?...হ্যাঁ, তা-ই তো মনে হচ্ছে। একই রকম শরীর স্বাস্থ্য...কিন্তু বাবুই উলের পোশাক কেন পরেছে? আর এখানে পড়েই বা আছে কেন? অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যায়নি তো?

মাহেরার ইন্দ্রিয়গুলো ঠিকমতো কাজ করছিল না। করলে অনুভব করতে পারতেন যে, তীব্র পচা গন্ধটা বাবুইর শরীরটা থেকেই আসছে!

'বাবুই! কী হয়েছে বাবা? বাবুই?'

হাতড়ে হাতড়ে টর্চটা জ্বালেন ঠিকই। তবে আলোটা উজ্জ্বল হতেই আর্ত চিৎকার দিয়ে ছিটকে আসেন ঘরের এককোণে। টর্চটাও পড়ে যায় হাত থেকে, তবে নেভে

না।

সমস্ত শরীরটা ফাঙ্গাসে ঢেকে গেছে বাবুইর। সমস্ত শরীরটা!! শুধু মুখটা বাদে। চোখজোড়া পচে-গলে গিয়ে কোটর দুটো শূন্য। পচে-গলে খসে পড়েছে গালের চামড়াও। আর ফাঙ্গাসের দল...

ফাঙ্গাসের দল ক্রমশ খুব ধীরেসুস্থে অগ্রসর হচ্ছে পুরোটা গ্রাস করে নিতে। তাদের শুভ্র, অথচ নোংরা উপস্থিতিতে।

এবং...

উত্তেজনায় এমন অবস্থা যে চিৎকারও আসে না কণ্ঠ দিয়ে। তবু চিৎকার করেন তিনি। নিঃশব্দ চিৎকার!

বাবুইর ঠিক মাথার কাছেই বসে আছে দেবশিশুর মতো ছেলেটা। পরনে শুধু কালো হাফপ্যান্ট।

মাহেরা সুলতানা আতঙ্কের শেষ সীমায় গিয়ে অনুভব করেন যে দেবশিশুর মতো চেহারাটার সাথে কোথায় যেন সেই কুৎসিত প্রাণীটার অসম্ভব মিল আছে। অসম্ভব মিল!

প্রাণীটা খলখল শব্দ তুলে হাসে। ঠিক আনন্দিত শিশুদের মতোই। তারপর... তারপর একটু ঝুঁকে বাবুইর চোখের কোটরে আঙুল ঢুকিয়ে কী যেন বের করে আনে হলুদাভ বর্ণের...সময় নিয়ে চেটে চেটে খায়।

আবার হাসে...এবং খায়।

খলখল করে হাসে!

চিৎকার করতে চান মাহেরা প্রাণপণে। কিন্তু বুকের ওপর হাজার টনের ভার। হাত-পায়ের অসহনীয় জ্বলুনি কাটা মুরগির মতো ছটফট করায় তাঁকে। চার হাত-পায়ে ফুটে উঠতে শুরু করে শুভ্র বর্ণের চাকা চাকা চিহ্ন...

নিঃশব্দ চিৎকারে মাহেরার কণ্ঠ দিয়ে গাঢ় লাল রক্ত উপচে ওঠে। গড়িয়ে নামে চিবুক বেয়ে।

কেটে ফেলতে হবে!

কেটে ফেলতে হবে!

এক্ষুনি!...যে করেই হোক!

এক্ষুনি!

এক্ষুনি!

পরিশিষ্ট

সংবাদপত্রে ব্যাপারটা প্রকাশিত হবার পর খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। মানসিক বিকারগ্রস্ত এক নারী, যে নিজেরই বাবা এবং পুত্রকে খুন করে ফেলে রেখেছিল পচন ধরার জন্য। মৃতদেহ দুটির ওপর পাওয়া গেছে ফাঙ্গাসের ঠিক তেমন এক আস্তরণ, যেমনটা আছে বেসমেন্টে পাওয়া অপর একটি কঙ্কালের শরীরে।

ধারণা করা হচ্ছে, কঙ্কালটি কোনও শিশুর এবং উক্ত নারী বহুবছর পূর্ব হতেই মানসিক বিকারগ্রস্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, নিজের চার হাত-পায়ের মাঝে তিনটি অঙ্গই সে ধারালো চাপাতির আঘাতে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বর্তমানে আছে মানসিক চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে।

এবং চিকিৎসদের মতে, তাঁর সুস্থ জীবনে ফেরার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

রুমানা বৈশাখী

অশুভ প্রহর

ভয়াবহ সেই দিনটির কথা মনে করলে আজও আতঙ্কে আমার হাত-পা হিম হয়ে আসে। অবিশ্বাস্য সেই কাহিনীই শোনাব এখন—

আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগত। সুযোগ পেলেই কোথাও-না-কোথাও ঘুরতে চলে যেতাম। একবার তৌহিদ নামে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিল। আমি একেবারে এককথায় রাজি হলাম। গ্রামটি পাবনার এক প্রত্যন্ত গ্রাম, আজকালকার মতো তখন যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না। বাসে, রিকশা করেও নাকি পুরোটা পথ যাওয়া যায় না। কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তৌহিদ প্রকৃতি, নদী-চাঁদ, গাছপালা, পাখির ডাক এসব মিলিয়ে সে তার গ্রামের একটি ফাটাফাটি সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে রাখল।

নির্দিষ্ট দিনে দুজন রওনা দিলাম। সারারাত বাসে কয়েক ঘণ্টা বসে তারপর গ্রামের উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ভয়ংকর রিকশাভ্রমণ, সবার শেষে ক্ষেতের আইল ধরে হাঁটা, সব মিলিয়ে বেশ কষ্ট— কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হল অ্যাডভেঞ্চারের মতো, তাই যত কষ্ট মনে হল ততই বুঝি মজা।

তৌহিদের বাড়ি পৌঁছে অবশ্যি বেশ আশাভঙ্গ হল। গ্রামটা যেরকম সুন্দর হবে মনে করেছিলাম সেরকম নয়। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাবার পথে মাঝামাঝি একটি ছোট্ট স্টেশনে নেমে গেলেই এরকম গ্রাম পাওয়া যায়। তবে গ্রামের মানুষজন খুব সহজ সরল। শহর থেকে এসেছি শুনে আমাদের খাতিরযত্ন করার জন্য সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমদিনটা কোনোমতে পার করে দ্বিতীয় দিনই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সুন্দর জায়গা বলেই আমার চোখে ভেসে উঠে খোলামেলা একটা জায়গার ছবি। কিন্তু এখানে সবই কেমন যেন ঘিঞ্জি। তৌহিদের অবশ্যি খুব উৎসাহ। যেটাই দেখে সেটাই দেখে বলে, 'চমৎকার! তাই না?'

আমি তার মনে ব্যথা দিতে পারি না। তাই মাথা নেড়ে বলি, 'ঠিকই বলেছিস চমৎকার।'

সময় কাটানোর জন্য আমি তখন গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে

দেখার মতো কী আছে। অনেক চিন্তা করে কয়েকজন উত্তর দিল, মাইল তিনেক দূরে একটা পুরোনো হিন্দুমন্দির আছে। গ্রামের মানুষের কাছে সেটাই খুব দর্শনীয় একটা জিনিস মনে হলেও আমার তিন মাইল হেঁটে একটা পুরোনো ভাঙা হিন্দুমন্দির দেখতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা করল না, তাই কখনও একা আবার কখনও তৌহিদকে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একসময় আবিষ্কার করলাম জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর।

যেমন মনে করা যাক একটা বটগাছের কথা। গ্রামের শেষ মাথায় একটা বিশাল বটগাছ। এতবড় বটগাছ আমি জীবনে দেখিনি। গাছের মোটা কাণ্ডের মাঝে বয়সের ছাপ। আমি সেই বটগাছটার নীবে বসে পাখির কিচিরমিচির ডাক শুনি। কত রকম পাখি এই গাছটায় আসে তার হিসেব নেই।

এই বটগাছের নিচে বসেই আমার আরেকজন মানুষের সাথে পরিচয় হয়। মানুষটা বাঙালিদের তুলনায় বেশ লম্বা। গায়ের রং ফর্সা ছিল। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদের মতো লম্বা চুল আর জটপাকানো দাড়ি। গায়ে কুচকুচে কালো রংঙের লম্বা আলখাল্লা। চোখে সুরমা। প্রথম দর্শনেই তাকে আমার আধ্যাত্মিক টাইপের মানুষ বলে মনে হল। মানুষটার নাম রবিশঙ্কর। এই গ্রামেই থাকে। কাজকর্ম কিছু করে বলে মনে হয় না। কথা বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রবিশঙ্কর খুব বেশি কথা বলে না। তার কাছে জানতে পারলাম এই গ্রামের শেষে নদীর তীরে নাকি একটা শ্মশানঘাট আছে। আমার দেখার কৌতূহল হল। রবিশঙ্কর তখন আমাকে শ্মশানঘাট দেখাতে নিয়ে চলল। গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছি। মানুষজন আমাদের দেখে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। একটা ছোট বাচ্চাকে তার মা যেভাবে জাপটে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল তা দেখে আমার মনে হল গ্রামের লোকজন রবিশঙ্করকে একটু ভয় পায়।

রবিশঙ্করের কাছে শ্মশানঘাটের কথা যেরকম ধারণা হয়েছিল গিয়ে দেখি সেরকম কিছু নয়। নদীর তীরে একটা বাঁধানো ঘাট ভেঙেচুরে আছে। তার পাশে বড় একটা জায়গা, সেখানে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি আর আবর্জনা। খানিকদূরে ভাঙাচোরা বেশ কিছু ছোট ছোট মন্দির। জায়গাটার একটা বিশ্রী চেহারা। অবশ্য শ্মশানঘাটের চেহারা খুব সুন্দর হবে সেরকম কোনও যুক্তি নেই।

রবিশঙ্কর এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু শ্মশানঘাটে এসে হঠাৎ একেবারে চুপ মেরে গেল। আমার কোনও কথারই উত্তর দেয় না। মানুষটা ঠিক স্বাভাবিক না, তাই তাকে না ঘাঁটিয়ে ফিরে এলাম।

তৌহিদের বাড়ি আসার পথে দেখতে পেলাম আমাকে নিয়ে আসার জন্য কিছু লোক হন্তদন্ত হয়ে আসছে। এতক্ষণে গ্রামে খবর ছড়িয়ে গেছে যে, রবিশঙ্কর

আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটি এত গুরুতর কেন প্রথমে বুঝতে পারলাম না। তাদের সাথে কথা বলে সেটা পরিষ্কার হল, রবিশঙ্কর নাকি পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। তার অলৌকিক ক্ষমতা। মন্ত্রবলে সে মানুষকে ছাগল বানিয়ে দিতে পারে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে-কোনো কিছু জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমাবস্যার রাতে তার বাড়িতে ভূত-প্রেত আর পিশাচেরা নেমে আসে। তখন নাকি সেখানে নরবলি দেওয়া হয়। শুনে আমার ভীষণ কৌতূহল হল। ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না। এই প্রত্যন্ত গ্রামে রবিশঙ্করের মতো একটা মানুষ গ্রামের সবাইকে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে—মানুষটার নিশ্চয়ই একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা আমার জানার খুব কৌতূহল হলো।

সেদিন রাতে খাবার পর তৌহিদকে বললাম, 'তৌহিদ, চল্ এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'এত রাতে? কোথায় যাবি?'

'রাত কোথায়! চট্টগ্রামে থাকতে এখনও আমাদের সন্ধ্যাই হত না—এখানে বলছিস রাত!'

'কিন্তু যাবি কোথায়?' তৌহিদ প্রশ্ন করে।

'রবিশঙ্করের বাড়িতে।'

তৌহিদ আঁতকে উঠল, 'রবিশঙ্করের বাড়িতে? কেন?'

'লোকটাকে আমার ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, একটু কথা বলে আসি।'

তৌহিদ হেসে বলল, 'কথা বলতে চাইলে এই মাঝরাতে কেন? দিনের বেলায় গেলি না কেন?'

আমি বললাম, 'সে নাকি প্রেতসাধক। প্রেতসাধকের সাথে দিনে কথা বলে লাভ কী, আর দেখলি না দিনের বেলা কী হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল!'

তৌহিদ তবুও ইতস্তত করতে থাকে। তখন আমি একাই রওনা দেব বলে ভয় দেখালাম, তাতে কাজ হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চ্ যাই।'

গ্রামের মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। কাউকে জিজ্ঞেস করে রবিশঙ্করের বাড়ি খুঁজে বের করতে হলে সমস্যা হয়ে যেত। তবে তৌহিদের মোটামুটি ধারণা আছে। গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় রবিশঙ্করের বাড়ি। বাড়ির সামনে বড় বড় দুটো তালগাছ। অনেকদূর থেকে নাকি গাছদুটো দেখা যায়।

অন্ধকার রাতে দুজন কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতেই অন্ধকার বিরাজ করছে। হঠাৎ হঠাৎ কোনও বাড়িতে একটি দুটি আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে কুকুর ডাকছে। তবে গ্রামের কুকুর খুব নিরীহ, কখনও তেড়ে আসে না।

রবিশঙ্করের বাড়ির সামনে বড় বড় দুটি তালগাছ, কাজেই খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধা হল না। খেয়াল করলাম, তার বাড়ির আশেপাশে আর কোনও বাড়ি

নেই। অন্ধকারে ভলো দেখা যায় না, তবু মনে হল বাড়িটাই ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। চারপাশে ঝোপঝাড়, পেছনে বড় বড় গাছে লতাপাতায় জঙ্গল হয়ে আছে। এত রাতে একজনের বাড়ি এসে তাকে ডেকে তুলতে সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু তৌহিদ কোনোরকম দ্বিধা না করেই গলা ছেড়ে ডাকল, 'শঙ্করদা বাড়ি আছেন?'

কয়েকবার ডাকডাকি করতেই খুট করে দরজা খুলে গেল এবং রবিশঙ্কর বের হয়ে এল, বলল, 'কে?'

'আমরা,' তৌহিদ একটু এগিয়ে বলল, 'আমি তৌহিদ, মোল্লাবাড়ির তৌহিদ। আর এ আমার বন্ধু, চট্টগ্রাম থেকে এসেছে।'

রবিশঙ্কর কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। তার শরীর থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ এসে ভক্ করে নাকে লাগল, তৌহিদ বলল, 'শঙ্করদা কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'না, আমার ঘুমাতে দেরি হয়।'

'ও, ঘরে আলো নেই দেখে ভাবলাম ঘুমিয়ে গেছেন।'

রবিশঙ্কর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তখন একটু আলো হবে।'

তৌহিদ বলল, 'শঙ্করদা, আমার এই বন্ধুর সাথে তো আপনার দেখা হয়েছে, সে আপনার সাথে কথা বলতে এসেছে।'

রবিশঙ্কর আবছা অন্ধকারের মাঝে কোথা থেকে একটা ভাঙা জলচৌকি এনে ঝেড়ে দিয়ে বলল, 'বসেন।' নিজে অসংকোচে মাটিতে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলেন।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আপনার সাথে যখন বটগাছের নিচে দেখা হয়, তখন জানতাম না আপনি একজন তান্ত্রিক, শুনে একটু কৌতূহল হল। তাই ভাবলাম আপনার সাথে একটু কথা বলে যাই।'

রবিশঙ্কর কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি অস্বস্তিতে একটু নড়েচড়ে বললাম, 'গ্রামের মানুষজনের কাছে শুনেছি আপনি নাকি পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। আপনার কাছে নাকি ভূত-প্রেত-পিশাচরা আসে?'

রবিশঙ্কর এবারও কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, 'আমি কখনও ভূত-প্রেত দেখিনি। আপনার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।'

রবিশঙ্কর একটু নড়েচড়ে বসল, 'কী জানতে চাইছিলেন?'

'এসব কি আসলেই আছে?' আমি বললাম।

অন্ধকারে দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে হল রবিশঙ্কর একটু হাসল, বলল, 'আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'না।'

রবিশঙ্কর কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি বললাম, 'কী হল? চুপ করে আছেন কেন? কিছু একটা বলুন।'

'দেখুন, আপনি তো জিনিসটা আছে সেটাই বিশ্বাস করেন না। যেটা বিশ্বাস করেন না সেটা সম্পর্কে কী জানবেন? জেনে কী লাভ?'

আমি অন্ধকারে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, রবিশঙ্কর ঠিকই বলেছে। তবুও বললাম, 'জিনিসটা সম্পর্কে জানি না বলেই তো বিশ্বাস করার সুযোগ পাইনি। যদি দেখতে পেতাম—'

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না, রবিশঙ্কর প্রায় ধমকে উঠল, 'আপনি দেখতে চান?' তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। আমি চমকে উঠলাম।

আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে যদি দেখতে পেতাম আর কী!'

তৌহিদ আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'কী বলছিস তুই? দেখতে চাস মানে? এর মাঝে দেখার কী আছে?'

বুঝতে পারলাম তৌহিদ ভয় পেয়েছে। সত্যি কথা বলতে, অন্ধকার রাতে নির্জন একটা জায়গায় এভাবে বসে পিশাচ দেখার কথা চিন্তা করে আমারই কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। তবুও সাহস করে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই। দেখাতে পারবেন?'

রবিশঙ্কর বলল, 'আপনাদের সাহস আছে?'

সাহস নিয়ে খোঁটা দিলে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি কঠিন গলায় বললাম, 'আছে, অবশ্যই আছে।'

'ভয় পাবেন না?'

তৌহিদ কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু আমি তাকে বলার সুযোগ দিলাম না। বললাম, 'না ভয় পাব না।'

রবিশঙ্কর তবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। তা হলে দেখেন, দেখি আপনাদের বিশ্বাস হয় কিনা।'

তৌহিদ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখব?'

'যারা আসবে।'

'কারা আসবে?'

রবিশঙ্কর রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'রাতের বেলা যাদের নাম নিতে হয় না।'

রবিশঙ্কর তার ঘরের ভেতর ঢুকে গেল এবং কিছুক্ষণ পর কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে এল। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু মনে হল, একটা খুলি, কিছু ফুল, কিছু বাসনকোসন, গামছা— এইরকম ব্যবহারিক জিনিস।

রবিশঙ্কর আমাদের ডেকে বলল, 'আপনারা এইখানে বসেন।'

আমরা ইতস্তত করছিলাম, তা দেখে সে বলল, 'মাটিতেই বসতে হবে। কোনো

কিছু করার নাই।'

আমরা মাটিতে আসন পেতে বসলাম। রবিশঙ্কর মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে নিল, তারপর বিড়বিড় করে কী একটা পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে সে আমাদের ঘিরে একটা বড় গোল দাগ দিয়ে বলল, 'আপনাদের চক্রবন্ধন দিয়ে দিলাম, কিছুতেই এই চক্র থেকে বের হবেন না। যতক্ষণ এর ভিতরে থাকবেন, ততক্ষণ আপনারা নিরাপদ। কোনও বিপদ হবে না।'

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'কী বিপদ?'

'কত রকম বিপদ হতে পারে। যারা আসবে তারা কী করবে কে বলতে পারে!'

তৌহিদ আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'হাসান। বাদ দে। চল্, বাড়ি যাই।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'পাগল হয়েছিস, খেলাটা দেখে যাই।'

'যদি সত্যি হয়?' তৌহিদ প্রশ্ন করে।

'ধুর, সত্যি হবে কেমন করে? তুই না কেমিস্ট্রিতে অনার্স করছিস, কখনও ভূতের কেমিকেল কম্পোজিশন পড়েছিস?'

তৌহিদ কিছু বলল না। কিন্তু সে খুব স্বস্তি পেল বলে মনে হলো না। রবিশঙ্কর আমাদের সামনে একটা ছোট গোল দাগ দিল তারপর জীর্ণ মাদুর পেতে সেখানে বসল। তার এই কাজটা আমার কাছে বোধগম্য হল না। সে পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। তার আবার চক্রবন্ধনের কী প্রয়োজন? প্রশ্ন করব কিনা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আমার মনের কথা মনে হয় বুঝতে পেরে সে স্মিত হেসে বলল, 'প্রেতেরা রেগে গেলে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই, তাই সাবধান হওয়া ভালো।'

রবিশঙ্কর তার সামনে খুলিটা রেখে তার উপরে একটা মোমবাতি জ্বেলে নিল। এরপর একটা থালায় আগুন জ্বালল। ছোট একটা পুঁটলি থেকে পাউডারের মতো জিনিস বের করে আগুনের উপর ছুড়ে দিতেই কটকট শব্দ করে পুড়তে থাকল এবং একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। রবিশঙ্কর একটা পুরাতন লাল গামছা মাথায় বেঁধে নিল, তারপর আমাদের দিতে তাকিয়ে বলল, 'আমি ডাকছি। মনে রাখবেন যতই ভয় পান, এই চক্রবন্ধন থেকে বের হবেন না।'

তৌহিদ কাঁপা গলায় বলল, 'ভয় পাব কেন?'

'দেখবেন, নিজ চোখেই দেখবেন।'

রবিশঙ্কর দুই হাত উপরে তুলে হঠাৎ অনুচ্চ এবং দ্রুত গলায় কিছু একটা বলতে লাগল। শুনে আমার মনে হল, সে বুঝি কাউকে তীব্র ভাষায় গালাগাল করছে। একটানা কথা বলে সে একমুহূর্তের জন্য থামল। হঠাৎ ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেরাম। শিউরে উঠল শরীরটা। ক্রমেই বাড়ছে বাতাসের বেগ। মোমবাতির মাথায় আগুনের শিখাটা উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করল কিছুক্ষণ, তারপর নিভে গেল। রবিশঙ্কর চাপা গলায় বলল, 'আসছে, ওরা আসছে।'

আমি, তৌহিদ গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম। রবিশঙ্কর ঠিকই বলেছিল, কৃষ্ণপক্ষের রাত সত্যি সত্যি এখন চাঁদ উঠেছে। রবিশঙ্কর আবার হাত উপরে তুলে আকাশের দিকে মুখ করে বিড়বিড় করতে থাকল। হঠাৎ চারদিক অসম্ভব নীরব হয়ে গেল। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর একটা নিস্তব্ধতা। ব্যাপারটি বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। চারপাশে এতক্ষণ ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল, হঠাৎ করে সব ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জন থেমে গেছে। আমি কান পেতে থাকলাম। শুধু মনে হতে লাগল এক্ষুনি বুঝি কিছু একটা ঘটবে।

আচমকা কোথা থেকে একটা জন্তু সোজাসুজি আমাদের দিকে ছুটে এল। চক্রের কিনারে এসেই হঠাৎ যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেল জানোয়ারটা। ছিটকে সরে গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে, তারপর আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমার হৃৎপিণ্ড ধক ধক করছে। মাথা ঘুরিয়ে প্রাণীটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। দূরে গুড়ি মেরে বসে আছে। অন্ধকারে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। জন্তুটার আকার-আকৃতি দেখে মনে হল কুকুর। কিন্তু সাধারণ কুকুর থেকে অনেক বড়। প্রাণীটা নিঃশব্দে আবার আমাদের দিকে ছুটে এল, কিন্তু একেবারে শেষমুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে চিনতে পেরে শিউরে উঠলাম, টেলিভিশনে অনেকবার দেখেছি জন্তুটাকে। কুকুর নয়, নেকড়ে। এই অঞ্চলে নেকড়ে কোথা থেকে এল ভেবে পেলাম না।

রবিশঙ্কর এবার হাতদুটো নিচে নামিয়ে তার সামনে রাখা জিনিসপত্র থেকে ছোট কৌটার মতো একটা জিনিস তুলে নেয়। দড়ি দিয়ে সেটা একটা ছোট্ট লাঠির সাথে বাঁধা। লাঠিটা সে ধরে কৌটাটা ঘুরাতে ঘুরাতে আবার বিড়বিড় করতে থাকে। এতক্ষণ কথাগুলো ছিল তীব্র ভাষায় গালগাল করার মতো। এবারে সেটা হল একরকম অনুনয়ের মতো। রবিশঙ্কর কাতর গলায় কাকে যেন ডাকছে।

আমি আর তৌহিদ অল্প অল্প কাঁপছি। রবিশঙ্করের বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়-গাছপালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ নূপুরের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল। আচমকা আমাদের সামনে দীর্ঘদেহের কিছু একটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ নয়। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। চাঁদের আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু অবয়বটা বোঝা যায়। একজন মানুষের চামড়া ছিলে নিলে যেরকম দেখা যাবে অনেকটা সেরকম। কুৎসিত মূর্তিটা এক পা এগিয়ে আসে। পায়ে নূপুর বাঁধা, সেখান থেকে একধরনের শব্দ হয়। ছায়ামূতিটির চুল উড়ছে। উৎকট পচা মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকল। মুখ দিয়ে বমি বের হয়ে আসতে চাইল। কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকলাম। আমি টের পাচ্ছি, তৌহিদ থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ আমাদের উপর চটচটে আঠালো ক্লেদাক্ত জিনিস পড়তে লাগল। কিছু

বোঝার আগেই তৌহিদ লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে ছুট লাগাল। আমি তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। শুনতে পেলাম কে যেন খনখনে গলায় হা হা করে হেসে উঠল। তৌহিদ ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু মাঝপথে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। দেখলাম অসংখ্য নেকড়ে গর্জন করে তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম, রবিশঙ্কর নিজের চক্রবন্ধন থেকে বের হয়ে তৌহিদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এরপর আর কিছুই আমার মনে নেই।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি কে যেন আমার মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে। চারপাশ আলোকিত দেখে বুঝলাম সকাল হয়েছে। রাতের কথা মনে পড়তেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। পাশে দাঁড়ানো তৌহিদকে ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ' রবিশঙ্কর কোথায়?'

উত্তরে সে উঠানের এককোণে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম জীবনেও তা ভুলব না। রবিশঙ্করের কুণ্ডলী পাকানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ পড়ে আছে। চোখদুটো খোলা। না-দেখেও বুঝতে পারলাম, খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারা।

'এ কী করে হল?' তৌহিদকে প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, 'নেকড়েগুলো যখন আমাকে আক্রমণ করে, রবিশঙ্কর তখন দৌড়ে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে পাশের ঝোপে ফেলে দেয়, এরপর দেখলাম নেকড়েগুলো রবিশঙ্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর তোর মতো আমিও জ্ঞান হারাই।'

বুঝতে পারলাম রবিশঙ্কর নিজের চক্রবন্ধন থেকে বের হওয়ায় নেকড়েগুলোর শিকারে পরিণত হয়েছে। তার একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল, 'প্রেতেরা রেগে গেলে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই।'

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে আর একমুহূর্তও নয়। কিন্তু রবিশঙ্করের লাশের একটা ব্যবস্থা না করে চলে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। যতই সে প্রেতসাধক হোক, আমার জন্যই তার আজ এই অবস্থা। মনের মধ্যে একটা পাপবোধ জন্ম নিল। সে তার জীবনের বিনিময়ে তৌহিদের জীবন বাঁচিয়েছে একথাও ভুললাম না।

তার খোলা চোখদুটোর দিকে চাইলাম। ওই চোখদুটো যেন আমায় বলছে, 'কী গো, শহুরে মানুষ, এবার বিশ্বাস হল?' আস্তে করে তার চোখদুটো বুজিয়ে দিলাম। তারপর একবারও পিছনে ফিরে না তাকিয়ে দুই বন্ধু গ্রামের দিকে রওনা দিলাম। রবিশঙ্করের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

কামরুল হাসান

দানব বৈদ্যুতিক মাকড়সার চেহারা নিয়ে কুৎসিত, আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখা চিরে দিল রাতের অন্ধকার আকাশ। কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল দূরে কোথাও। ঝমঝমিয়ে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি।

পঞ্চদশী ক্যারল জেন ইলেরি মাথার উপর একটা খবরের কাগজ রেখে দ্রুত পা চালাল বাড়ির দিকে। বৃষ্টিতে ইতিমধ্যে ভিজে গেছে জুতো। বাড়ির সদরদরজার সামনে চলে এল ক্যারল। ঠাণ্ডা লেগে গেছে ওর। কাঁপছে ঠকঠক করে। দরজার ম্যাটের নিচে হাত ঢুকিয়ে অতিরিক্ত চাবিটা খুঁজল।

'ধ্যাত্তেরি!' চাবি না পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ক্যারল। ফুলের টবগুলোর নিচে আঙুল ঢোকাল ও, দরজার মাথায় কিছুই ঠেকল না হাতে।

বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। তবু ঝুঁকিটা নিল ক্যারল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল বাড়ির পেছনে। খিড়কির দরজার নব-এর দিকে হাত বাড়াল না। লাভ হবে না। বন্ধ দরজা। কী করতে হবে জানে ক্যারল। বাবা-মা রেগে আগুন হয়ে যাবে, মনে মনে বলল ও। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হয়ে যাবে আমার।

সমস্যার সমাধানে সে একপাটি জুতো খুলে ফেলল পা থেকে। জুতোর তীক্ষ্ণ হিল দিয়ে বাড়ি মারল রান্নাঘরের জানালায়। কিছুই ঘটল না। দ্বিতীয়বারে আরও জোরে বাড়ি দিল ক্যারল। ঝনঝন শব্দে ভাঙল জানালা, খুরের মতো ধারালো টুকরোগুলো ছিটকে পড়ল ভেতরে, ছড়িয়ে গেল রান্নাঘরের চারপাশে।

প্রতিবেশীরা জানালা ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়েছে কিনা জানে না ক্যারল। দুশ্চিন্তা বোধ করল ও। সদ্য তৈরি ফাঁকে হাত বাড়াল, কিচেন কাউন্টারের উপর ছিটিয়ে থাকা কাচের টুকরোগুলো যতটা পারল পরিষ্কার করল। তারপর নিজেকে টেনে তুলল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল জানালার ফাঁকে। রান্নাঘরের আলমারির উপর থেকে নামছে ক্যারল, কাচের টুকরো বিঁধে গেল কব্জিতে। প্রায় একই সময়ে পাতলা সোলের জুতো ভেদ করে একখণ্ড কাচ ঢুকে গেল পায়ের পাতায়। ব্যথায় কুঁচকে গেল ক্যারলের মুখ। ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে বেরুতে লাগল রক্ত। ভাঙা জানালা থেকে রান্নাঘরের মেঝে পর্যন্ত রক্তের লম্বা একটা রেখা তৈরি হল। বাতির সুইচেও

লেগে গেল রক্ত।

'বাহ্, দারুণ!' কিচেনের সিঙ্কে রক্তমাখা হাত ধুতে ধুতে গুঙিয়ে উঠল ক্যারল। 'বাবা-মা আমাকে ঠিক খুন করে ফেলবে!'

কাবার্ডের নিচের রোলার থেকে আধডজন পেপার টাওয়েল টেনে নিল ক্যারল, পা এবং কব্জির রক্ত মুছল। রান্নাঘরের মেঝে মোছার চেষ্টা করল খামোকাই, তারপর দ্রুত চলে এল গেস্ট বাথরুমে। আসমানি রঙের বাথ টাওয়েলে আবার মুছল রক্ত। অনেকটা রক্ত বেরোলেও ক্ষত তেমন গভীর নয়। দ্রুত ব্যান্ডেজ করে নিল ক্যারল।

এবারে একটু ভালো লাগছে ওর, চলে এল হলঘরে। সিঁড়ির মাথায় আলো জ্বলছে দেখে অবাক হল ক্যারল। বাবা-মা বাড়ি আছে নাকি? নিশ্চয় জানালা ভাঙার শব্দ ওদের কানে গেছে।

'কেউ বাড়ি আছ?' ডাকল ক্যারল। 'বাবা-মা? তোমরা উপরে?'

কারও কোনও সাড়া নেই। শুধুই নীরবতা। ক্যারল ধারণা করল বাবা-মা সকালে কাজে যাওয়ার সময় হয়তো ভুলে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। কব্জিতে বাঁধা বেঢপ বড় আকারের ঘড়ির জ্বলজ্বলে ডায়ালে চোখ বুলাল ও। সাড়ে ছ'টা বাজে। মা-বাবা কই? ভাবছে ক্যারল। এ সময় তো তাঁদের বাড়ি থাকার কথা।

এ মুহূর্তে বাড়িতে একা থাকতেই পারবে না ক্যারল। আজ সকালেই রেডিওর খবরে শুনেছে গিনসবার্গ মেন্টাল হেলথ ফ্যাসিলিটি'র এক মানসিক রোগী পালিয়েছে। মানসিক হাসপাতালটা ওদের শহর হ্যাম্পটন ফলস থেকে মাইল তিনেক দূরে, আর পলায়নকারী ভয়ংকর এক উন্মাদ খুনি। সে বৃদ্ধ দুই দম্পতি এবং তাদের নাতিকে জবাই করে হত্যা করেছে।

এসব খবর রেডিও ছাড়াও খবরের কাগজেও পড়েছে ক্যারল। কাগজে লিখেছে, খুনি মেয়েটি পাগল সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে কারাগারে না ঢুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল গিনসবার্গ মানসিক হাসপাতালে। মূলত হ্যাম্পটন ফলস-এর অধিবাসীরাই এ ব্যাপারে দাবি তুলেছিল। তাদের ভয় ছিল খুনি হাসপাতাল থেকে না আবার পালিয়ে এসে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়! পুলিশ এবং মানসিক হাসপাতালের পরিচালক ওই সময় আশ্বাস দিয়েছিলেন অত্যন্ত সুরক্ষিত ওই হাসপাতাল থেকে নাকি কারও পালাবার সুযোগ নেই। এসবই যে ফাঁকা বুলি ছিল এখন তা বোঝাই যাচ্ছে।

খবরের কাগজের সূত্র অনুসারে, হাসপাতালের আর্দালিকে মেরে অজ্ঞান করে খুনি এক ডাক্তারের গাড়ির ব্যাকসিটে লুকিয়ে পালিয়ে যায়। হাইওয়েতে ওঠার পরে সে ডাক্তারের পিঠে কাঁটাচামচ ঠেকিয়ে লোকটির টাকা-পয়সা, ঘড়ি ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে একটি সরু রাস্তায় গাড়ি ঢোকানোর নির্দেশ দেয়। তারপর হঠাৎ করে ডাক্তারকে গাড়ি থামাতে বলে সে গাড়ি থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ে এবং একছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলে।

খুনি এ মুহূর্তে জঙ্গলে আছে নাকি হ্যাম্পটন হিলস-এর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানে না কেউ। যদিও শহরের সবাই, ক্যারলসহ, সিঁটিয়ে আছে মৃত্যুভয়ে। পুলিশ শহরবাসীকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছে, বলেছে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে এবং চোখ-কান খোলা রাখতে। খুনি বা রহস্যময় কোনও কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

থার্মোস্টাট চালু করে গায়ের ভেজা কোট খুলে ফেলল ক্যারল। চলল ডেন-এর দিকে। আলো জ্বালল। ঘরের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। আসবাব আগেরগুলোই, তবে কয়েকটা রুচিমতো সাজাতে গিয়ে এ কাজ করেছেন, ভাবল ক্যারল। সে টেলিভিশনের সামনে বসে অন করল রিমোটের সুইচ।

দুটার খবর দেখাচ্ছে টিভি। পলাতক খুনি সম্পর্কে বলছে খবর-পাঠক। একটি মুখ ভেসে উঠল টিভি পর্দায়। খুন হয়ে যাওয়া এক কিশোরের মায়ের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে রিপোর্টার।

'রনি খুব হাসিখুশি স্বভাবের ছিল,' বলল পাতলা লালচুলের মহিলা। 'জীবনটাকে দারুণভাবে উপভোগ করত ও, ছিল খুব স্মার্ট। বয়স নয় হলে কী হবে, ওই বয়সেই দাবায় সবাইকে হারিয়ে দিত রনি। কে জানে ও হয়তো একদিন চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠতে পারত,' মহিলা চোখ মুছল। 'কিন্তু আর কোনওদিন চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না ও।'

পর্দার ছবি বদলে গেল। ক্লোজআপে দাবার সেট দেখা গেল। মহিলা রাজাকে তুলে নিল সেট থেকে।

'খুবই দুঃখজনক,' বিড়বিড় করল ক্যারল। 'বেচারি মা। বেচারা ছেলে।' চোখ পিটপিট করে অশ্রু ঠেকিয়ে রাখল ও। 'এমন কাজ কে করল?'

মহিলার শোকাতুর চেহারা দেখতে কষ্ট লাগছে ক্যারলের। সে চ্যানেল বদলাল। কিন্তু এখানেও সেই একই গল্প। লম্বা, কালো চুলের এশীয় এক উপস্থাপিকা এক মনোবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

'ড. গ্যারিসন,' জিজ্ঞেস করল সে, 'খুনির মানসিক ভারসাম্যহীনতা কীরকম হতে পারে?'

টাক মাথা, মোটাসোটা ড. গ্যারিসন গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'এ ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ ভুলে যায় নিজের পরিচয়। সে কে, কোত্থেকে এসেছে তা জানে না, সে-যে কোনও অপরাধ করেছে তাও তার স্মৃতিতে থাকে না। তার ভেতরে আরও যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি, কাউকে চিনতে বা বুঝতে না-পারা। সে অদ্ভুত সব শব্দ শোনে, উল্টোপাল্টা সব দৃশ্য দেখে। সে এমন কিছু দেখতে পায়, যার কোনও অস্তিত্বই নেই। এমন সব শব্দ সে শোনে আসলে সেরকম কোনও শব্দই হয়নি, সবই তার মস্তিষ্কপ্রসূত।'

'এ অসুখের কারণ কী?'

'বেশিরভাগ সময় এরকম হওয়ার কারণ মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীনতা। তবে ইদানীং কিছু ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে যার সাহায্যে এ অসুখ সারানো যায়। তবে চিকিৎসাটা—'

চিকিৎসার বিবরণ শোনা হল না ক্যারলের। ওর খুব ভয় লাগছে। তাই অফ্ করে দিল রিমোটের সুইচ। কালো হয়ে গেল টিভি পর্দা।

মন থেকে ভয়ংকর ঘটনাটা দূর করে দিতে চাইল ক্যারল। সামনের জানালায় গিয়ে ফাঁক করল পর্দা। উঁকি দিল। অবশেষে থেমেছে বৃষ্টি। তবে বাতাসের উন্মাদনায় বিরতি নেই। দমকা হাওয়ায় ঝর্নার মতো পাতা থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বৃষ্টির জল। একটা গাড়ি চলে গেল, ভেজা রাস্তায় হিস্‌স্ শব্দ তুলে।

রাস্তার মাথায় একটা পুলিশের গাড়ি চোখে পড়ল ক্যারলের। আস্তে চলছে, সার্চলাইটের তীব্র আলো ফালাফালা করে দিচ্ছে অন্ধকার। বাড়িঘরের সামনের অংশ, বেড়া, গাছ ইত্যাদি আংশিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। একমুহূর্তের জন্য ক্যারলদের বাড়িতে স্থির থাকল আলোকরেখা, তারপর চলে গেল গাড়ি। দানবের লাল চোখের মতো টেললাইট জোড়া কিছুক্ষণ জ্বলতে দেখল ক্যারল। অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি।

পর্দা আবার টেনে দিল ক্যারল। ফিরে এল রান্নাঘরে। ভাঙা জানালা দিয়ে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল। গা শিরশির করে উঠল ক্যারলের। হাত এবং পায়ের ব্যান্ডেজ পরীক্ষা করে দেখল ও। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। ব্যথাও তেমন লাগছে না।

খিদে পেয়েছে ক্যারলের। ফ্রিজ খুলল। পেয়ে গেল ঠাণ্ডা ফ্রুট সালাদ এবং কটেজ চিজ। একটা প্লেটে খাবারগুলো সাজাল ও, বসল টেবিলে। খেতে লাগল। ভাবছে বাবা-মা আসছে না কেন? গেছে কই তারা?

হঠাৎ ক্যারলের পেছনে, দেয়ালে ঝোলানো ফোন বেজে উঠল, লাফিয়ে উঠল ক্যারল। বাবা-মা অ্যাক্সিডেন্ট করেননি তো? এজন্যই কি তাঁদের দেরি হচ্ছে? ভয়ে শিরশির করছে গা; রিসিভার তুলল ও।

'হ্যালো,' ঢোক গিলল ক্যারল।

ঠাণ্ডা একটা মহিলা-কণ্ঠ শুনতে পেল সে একমুহূর্তের জন্য। তারপর সব নীরব।

'কে বলছেন?' দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যারল।

এ প্রান্তে সাড়া নেই, হাহাকারের মতো নিশ্বাস ফেলল কেউ। ওর মা? আহত হয়েছেন?

'হ্যালো!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যারল।

লাইনের অপরপ্রান্তে শব্দ হল খুট করে। কেটে গেল লাইন। শুধু ডায়াল টোন শোনা যাচ্ছে।

ফোন ছেড়ে দিল ক্যারল। বাতাসে হয়তো ফোনের তার-টার ছিঁড়ে গেছে, ভাবল

ও। কিন্তু কথাটা নিজেরই বিশ্বাস হল না। কেউ, হয়তো ওই পলাতক খুনিই ওকে নিয়ে খেলছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে। খিদেটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল ক্যারলের, বমি আসছে। মাথাটাও ধরেছে। আধ-খাওয়া খাবার একটা প্লাস্টিকের কাগজে মুড়ে ফ্রিজে রেখে দিল ও।

কল-এ পিরিচ ধুচ্ছে, অকস্মাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। বাড়ির কোথাও সম্ভবত উপরতলায়, দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেছে একটি দরজা।

বাতাসের ধাক্কায় হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে কোনও দরজা কিংবা জানালা, নিজেকে ব্যাখ্যা দিল ক্যারল। একমুহূর্তের জন্য রিল্যাক্স বোধ করল। কিন্তু সত্যি কি বাতাসের ধাক্কায় বন্ধ হয়েছে দরজা? নাকি উপরতলায় কেউ আছে? ভয়টা আবার কাঁপিয়ে দিল ক্যারলকে।

ভীত, সন্ত্রস্ত ক্যারল বেরিয়ে পড়ল রান্নাঘর থেকে, ঢুকল হলঘরে। মাথার উপরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আপত্তি জানাল ফ্লোরবোর্ড, দোতলায় আরেকটি দরজা বন্ধ হল। এবারে আস্তে।

'ভাগো! পালাও এ বাড়ি থেকে!' ক্যারলের মাথার ভেতরে বলে উঠল একটি কণ্ঠ।

'রিল্যাক্স', বলল আরেকটি কণ্ঠ। 'তুমি বেহুদাই ভয় পাচ্ছ।' কিন্তু ভয়টা তাড়াতে পারছে না ক্যারল। চাবিটা সাধারণত যে জায়গায় থাকার কথা সেখানে ছিল না কেন? কেউ— খুনি কি চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে? খুনিই কি দোতলার বাতি জ্বালিয়েছে? বাড়ির কোথাও কি সে লুকিয়ে আছে? অন্য কোনও ঘরে...ক্লজিট...কিংবা খাটের নিচে? স্থির হও। নিজেকে শোনাল ক্যারল। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিচ্ছ তুমি।

বুক ভরে দম নিল ক্যারল, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। একেকবারে, একেক ধাপ। দোতলার ল্যান্ডিং-এ চলে এল, সামান্য খোলা একটি দরজা থেকে আলো আসছে। পরক্ষণে ঘাড়ের কাছের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরে কেউ হাঁটাহাঁটি করছে। শোনা যাচ্ছে পায়ের আওয়াজ। খুট করে একটা শব্দ হল, ঘরের ভেতরটা আরও আলোকিত দেখাল, প্রায় একই সময় চালু হয়ে গেল টিভি।

আতঙ্কিত ক্যারল দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিল, বুকের খাঁচায় দমাদম পিটছে হৃৎপিণ্ড। ঘরে কে? একটা কণ্ঠ বিস্ফোরিত হল ওর মস্তিষ্কে। কে?

পা টিপে টিপে সিঁড়ির শেষধাপের দিকে এগোল ক্যারল, ঘরে যে-ই হোক দেখবে, হঠাৎ একটা গলা শুনতে পেয়ে জমে গেল ও। মহিলা কণ্ঠ!

জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যারল, নড়তে ভুলে গেছে। নিশ্বাস হয়ে উঠল হিসহিসে।

আরেকটি গলা শুনতে পেল ক্যারল। বাবার গলা।

'কাউকে আঘাত কোরো না,' বললেন তিনি। 'আমরা চাই না তুমিও আঘাত

পাও।'

এরপর শোনা গেল মা'র কণ্ঠ। 'প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করো সবাই তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে।'

উন্মাদ খুনি তা হলে তার বাবা-মা'কে আটক করেছে! ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যারল। বাবা-মা'র সাহায্য দরকার। ওদেরকে সাহায্য করতে হবে।

ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল ক্যারল। ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খুনির সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোথায় খুনি? শূন্য ঘর। টিভি চলছে। টিভিতে দেখা যাচ্ছে তার বাবা-মা একটি সোফায় বসে আছেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে এক খবর-পাঠক। কিন্তু টিভিতে যে ঘরটি দেখছে ক্যারল তা তার পরিচিত ঘর নয়। বাবা-মাকেও যেন কেমন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে বয়স।

'আমি যদ্দূর জানি,' বলল নিউজ কাস্টার। 'আপনারা ওই খুনের ঘটনার কিছুদিন পরেই হ্যাম্পটন ফলস-এর বাড়ি ছেড়ে টিম্বারলেনে চলে আসেন। ঠিক?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ক্যারলের বাবা। 'আমরা তড়িঘড়ি বাড়ি বিক্রি করে চলে আসি। জিনিসপত্র কিছুই আনা হয়নি।'

'ও-বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছিল না,' ব্যাখ্যা করলেন ক্যারলের মা। 'অমন ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস আমাদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।'

বাবা-মা এসব বলছেন কী! আপন মনে বলল ক্যারল। মিথ্যা বলছেন কেন ওঁরা? কেন বলছেন আমাদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন? আমি তো আমাদের আগের বাড়িতেই আছি।

পর্দায় নিউজকাস্টার বলছে, 'মানসিক হাসপাতাল থেকে আজ সকালে পালিয়ে যাওয়া কিশোরীর বাবা-মা'র সাক্ষাৎকার তাদের টিম্বার লেনের বাড়ি থেকে সরাসরি প্রচার করা হল। তাঁরা তাঁদের মেয়েকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁদের ধারণা, তাঁদের মেয়ে একধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে আছে, সম্ভবত তার নিজেরও জানা নেই সে কোথায় আছে কিংবা সে কে।'

বাবা-মায়ের চেহারা আবার ভেসে উঠল পর্দায়। ভুরুকুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারল।

'তুমি যদি এই সাক্ষাৎকার দেখে থাকো, সোনা,' বলছে তার মা, 'তোমাকে বলছি, তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি আমরা। কারণ তোমাকে আমরা ভালোবাসি।'

এরপর বাবাকে দেখা গেল। 'কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কিংবা হাসপাতাল যে-কারও কাছে খুশি তুমি যেতে পারো। ওরা তোমাকে সাহায্য করবে, সুইটহার্ট।'

আমার বাবা-মা টিভিতে কী করছেন? অবাক ক্যারল। আমাকে নিয়ে এসব অদ্ভুত কথা বলার মানে কী?

ক্যারল হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল মিহি কান্নার শব্দে। হলঘরের শেষপ্রান্তে, তার বেডরুম থেকে ভেসে আসছে কান্না। ধীরে ধীরে, খুব আস্তে সে হলঘরের দিকে পা বাড়াল। ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। অবাক হয়ে দেখল ওর ঘরটিকে নার্সারিতে রূপান্তর করা হয়েছে। দোলনায় ফুটফুটে একটি বাচ্চা শুয়ে আছে, উ উ করে কাঁদছে। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। আর ঠিক তখন আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠতে চাইল ক্যারল।

হলঘর দিয়ে এগিয়ে আসছে এক কিশোরী। সেই উন্মাদ খুনি যার ছবি আজ খবরের কাগজে দেখেছে ক্যারল। মেয়েটির পরনে পুরুষের ওভারকোট, গালে লেপ্টে আছে ভেজা চুল, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ।

আত্মরক্ষার জন্য কিছু পাওয়া যায় কিনা, পাগলের মতো হাতড়াল ক্যারল। কিছুই পেল না। নিজের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা কাঁটাচামচ। অগ্রভাগ সুচালো এবং ধারালো।

দোলনায় উঠে বসল বাচ্চা। তার কান্না চিৎকারে পরিণত হয়েছে।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল ক্যারল। চায় না বাচ্চার চিৎকার শুনে আকৃষ্ট হোক খুনি। মাথার উপর কাঁটাচামচ রেখে বাচ্চাটির দিকে ছুটে গেল ও। 'চুপ!' মেয়েটির মুখে হাত চাপা দিল।

'চুপ!' হিসিয়ে উঠল খুনি, ব্যঙ্গ করছে ক্যারলকে। তারও হাতে কাঁটাচামচ।

'চলে যাও!' গলা ফাটাল ক্যারল। বাচ্চাকে ছেড়ে দিল ও। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগোল খুনির দিকে।

'চলে যাও!' ভেংচাল খুনি। সে-ও হাতের অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।

'ফিরে যাও বলছি! তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

ঘোঁত ঘোঁত করল ক্যারল। পুনরাবৃত্তি করল খুনিও।

'তোমাকে বাচ্চাটার ক্ষতি করতে দেব না!' বাচ্চা এবং খুনির মাঝখানে দাঁড়াল সে।

তারপর বুক-হিম-করা চিৎকার দিয়ে খুনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যারল। হাতের কাঁটাচামচ দিয়ে উন্মাদের মতো আঘাত করতে লাগল আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে।

অনীশ দাস অপু

বন্ধ ঘরের রহস্য

বলসোভার স্কোয়ারের ১০৯ নমর বাড়ির নিচতলার প্যাসেজের শেষ মাথার ঘরটা সবসময় বন্ধ থাকে কেন? জানার খুব ইচ্ছা এমেলিয়া জেঙ্কিনসের। তবে বন্ধ ঘরের রহস্য জানার সৌভাগ্য হয়তো কোনদিনই হবে না। কারণ ওর মনিব, মিসেস বিশপ এমন বদমেজাজী মহিলা, এমেলিয়ার কৌতূহলের কথা ঘুর্ণাক্ষরেও টের পেয়ে গেলে ওকে পিটিয়েই মেরে ফেলবেন। দিন কয়েক আগে এমেলিয়া চুরি করে স্ট্রবেরি জ্যাম খেতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে যায় ও। মিসেস বিশপ শুধু ঠাণ্ডাচোখে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতেই হার্টবিট বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল এমেলিয়ার। কঠিন গলায়, চিবিয়ে চিবিয়ে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন—এমেলিয়াকে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর কিছু চুরি করে খেতে দেখলে মুখ ভেঙে দেবেন।

মহিলাকে যমের মতো ডরায় এমেলিয়া। ওর যাবার কোনো জায়গা নেই। নইলে ঠিক কোথায় চলে যেত। বাপ-মা মরা এতিম মেয়ে। পেকহ্যাম থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন মিসেস বিশপ। বিধবা মহিলার বাড়িতে দিনভর খাটে। কিন্তু মহিলা ওর সাথে মোটেও ভালো ব্যবহার করেন না। মহিলার স্বামী মারা গেছেন কবে কে জানে, এখনও ডাঁটফাট কমেনি। সোনালি চুলগুলো সবসময় পরিপাটি আঁচড়ে রাখেন, কৃত্রিম আইল্যাশ পরেন চোখে। লম্বা, ম্যানিকিওর করা নখ নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা নেই।

মিসেস বিশপকে ভয় পায় এমেলিয়া। তারপরও মহিলা বাইরে গেলে তাঁর বেডরুমে ঢুকে সাজগোজের লোভ সামলাতে পারে না কিছুতেই। সাজ বলতে মিসেস বিশপের লালরঙের একটা ফ্যান্সি ড্রেস পরা। ওটার হাড়ের তৈরি বোতামগুলো জ্বলজ্বল করে। দেখলেই বোঝা যায় খুব দামি। সার্টটা পরে আয়নার সামনে নিজেকে বারবার দেখে এমেলিয়া। তারপর আবার পোশাকটা খুলে, আগের মতো ভাঁজ করে রেখে দেয় ওয়ারড্রোবে।

মিসেস বিশপ সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না এমেলিয়া। তাই দুধঅলা বা হকারের কাছে তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করে। একদিন দুধঅলাকে সে প্রশ্ন করল, 'মিসেস বিশপের স্বামী কী করতেন জানো কিছু?'

তরুণ এই দুধঅলাটি মনে-মনে পছন্দ করে এমেলিয়াকে। প্রায়ই সে ফুল নিয়ে আসে মেয়েটির জন্যে।

'না তেমন কিছু জানি না,' জবাব দিল দুধঅলা। 'তবে শুনেছি ব্যবসা করতেন। দেশের বাইরে, ব্যবসার কাজে গিয়ে নাকি মারা গেছেন তিনি। ফ্রান্সের কোথায় যেন। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি শাদা চুল ছিল। মিসেস বিশপের বাবা বলে অনেকেই ভুল করত তাকে।'

'উনি স্বামীকে ভালোবাসতেন কিনা সন্দেহ আছে আমার,' বলল এমেলিয়া। 'ভালোবাসার ব্যাপারটাই বোধহয় ভদ্রমহিলার মধ্যে নেই।'

হেসে উঠল দুধঅলা। 'আজকালকার আধুনিক মেয়েরা তাদের স্বামীদের তেমন পাত্তা-টাত্তা দিতে চায় না। মিসেস বিশপও হয়তো তাদের একজন। কেন, এখানে ভালো লাগছে না তোমার?'

করুণ মুখ করে জবাব দিল এমেলিয়া, 'না। তবে বাইরের জগৎ এরচেয়েও খারাপ। তাই কোথাও যাবার সাহস পাই না।'

'তাহলে এখানেই থেকে যাও,' পরামর্শের সুরে বলল দুধঅলা। 'অন্তত ভালো কোথাও চলে যাবার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত।'

এমেলিয়ার আসলেই কোথাও যাবার জায়গা নেই। টাকা থাকলেও সে না হয় কেটে পড়ার ধান্ধা করত। কিন্তু মিসেস বিশপ ওকে এত কম বেতন দেন যে নিজের টুকিটাকি জিনিস কেনার পর হাতে প্রায় কিছুই থাকে না। তারপরও এমেলিয়া সুযোগের অপেক্ষায় আছে। হাতে কিছু টাকা এলেই এখান থেকে চলে যাবে। এমেলিয়ার বিশ্বাস, মিসেস বিশপ ওই বন্ধঘরে টাকাপয়সা রাখেন। একদিন সে এক অদ্ভুত স্বপ্নও দেখে ফেলল ঘরটিকে নিয়ে। দেখল মিসেস বিশপ ড্রইংরুমের ফায়ারপ্লেসের ডানপাশে রাখা একটি সিন্দুক থেকে একজোড়া চাবি নিয়ে সটান ঢুকে পড়লেন সেই বন্ধঘরে। তার পিছু নিয়েছিল এমেলিয়া। কিন্তু সে ভেতরে যাবার আগেই দরজা বন্ধ করে দিলেন মিসেস বিশপ। দরজা বন্ধ হবার আগে সে শুধু দেখতে পেল ঘরের মাঝখানে বড় একটা পালঙ্ক। বাইরে দাঁড়িয়ে এমেলিয়া শুনতে পেল ভেতরে পয়সা গোনার টুংটাং শব্দ হচ্ছে।

'যা ভেবেছি তাই,' বিড়বিড় করল এমেলিয়া। 'ও ঘরে টাকা লুকিয়ে রেখেছেন মিসেস বিশপ।'

সে ভেতরের দৃশ্য দেখার জন্যে চোখ রাখল কী-হোলে। সাথে সাথে কী যেন গরম একটা ঢুকে গেল চোখে, ভয়ানক জ্বলতে লাগল। ব্যথাটা এত বাস্তব, ঘুম ভেঙে গেল এমেলিয়ার। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছে বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। বন্ধঘরের রহস্য ভেদ করার আগ্রহ বেড়ে গেল কয়েক গুণ। 'ওখান থেকে কিছু টাকা যদি সরাতে পারি,' নিজের মনে বলল এমেলিয়া, 'তাহলে সাথে সাথে এখান থেকে চলে যাব। লন্ডন বিরাট শহর। লুকোবার অনেক জায়গা আছে। পুলিশ খুঁজেও পাবে না। আর ধরা পড়লেই বা কী, এই নরকের চেয়ে জেলখানা নিশ্চয়ই খারাপ হবে না। সারাক্ষণ

ওই মহিলার ধমকের ভয়ে সিটিয়ে থাকার চেয়ে চলে যাওয়া অনেক ভালো।'

স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটানোর চেষ্টা চালাল এমেলিয়া বারকয়েক। কিন্তু যতবার সাহস করে ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াল, ততবারই কোনো-না-কোনো বাধা পেল। একবার হলঘর থেকে সে ড্রইংরুমে ঢুকবে ভাবছে, হঠাৎ মনে হল মিসেস বিশপ পিছু পিছু আসছেন ওর, ঘুরলেই তাঁর ঠাণ্ডা, নীল চোখ জোড়া দেখতে পাবে, কটমট করে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। আরেকবার মাঝরাতে সে চুপি চুপি নেমে এসেছে নিচে, পায়ের শব্দ পেল পেছনে। ঝট করে ঘুরল এমেলিয়া। নাহ্, কেউ নেই পেছনে। কিন্তু এত ভয় লেগে উঠল, দৌড়ে সে ঢুকে গেল নিজের ঘরে, নিচতলায় নামার আর সাহসই পেল না। তবে দিনকয়েক পরে এমেলিয়ার বহুল প্রত্যাশার সুযোগটি এল।

'আমি বেরুচ্ছি, এমেলিয়া,' মিসেস বিশপ বললেন ওকে, 'ডিনারের আগে ফিরব না। কেউ ফোন করলে ম্যাসেজ নিয়ে রাখবি।'

নতুন কেনা কোট আর স্কার্ট পরে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তিনি। তাঁকে রাস্তার মোড় ঘুরতে দেখেই একদৌড়ে তাঁর বেডরুমে ঢুকল এমেলিয়া। নতুন হ্যাট কিনেছেন মিসেস বিশপ। দামি, পার্শিয়ান হ্যাট। কালো হ্যাটটা পরার খুব লোভ এমেলিয়ার। অবশেষে সুযোগ পাওয়া গেছে। সে হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। দেখতে মন্দ নয় এমেলিয়া, কালো হ্যাটে মানিয়েও গেছে, মিসেস বিশপের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী লাগল নিজেকে। হাসিমুখে এবার মিসেস বিশপের লাল কলারের নীলরঙের স্কার্টটা পরল ও। মনিবনীর চেয়ে হালকা পাতলা বলে পোশাকটা ঢিলে হল গায়ে, তবে আয়নার নিজের চেহারা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ এমেলিয়া। ড্রেসিং টেবিলে থরে থরে সাজানো দামি সব লিপস্টিক আর নেইল পলিশ। ওগুলো ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারল না এমেলিয়া। মিসেস বিশপের ফরাসি হাইহিলও পায়ে গলাল। তারপর মুচকি হেসে আবার দাঁড়াল আয়নার সামনে। নিজেকে বারবার দেখেও আশ মেটে না এমেলিয়ার।

এখন এমেলিয়াকে দেখলে কে বলবে ও বাড়ির চাকরানী! মনিবনীর চেয়ে শতগুণ সুন্দর লাগছে ওকে। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছে এমেলিয়া, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। আতঙ্কিত হয়ে উঠল এমেলিয়া। একটানে হ্যাটটা ছুড়ে ফেলে, পাগলের মতো জামাকাপড় খুলতে লাগল। ওদিকে ফোন বেজেই চলেছে। এমেলিয়া আধা-নগ্ন অবস্থায় গিয়ে ফোন ধরল। ম্যাসেজ রাখার পর শান্ত হল ও। তারপর আস্তে ধীরে পোশাকগুলো ভাঁজ করে আগের জায়গায় পরিপাটি অবস্থায় রেখে দিল। ওর বুক এখনও ধুকধুক করছে। এমেলিয়া ঠিক করল এখনই সে ড্রইংরুমে অভিযান চালাবে।

বাড়িতে কেউ নেই, তারপরও অভ্যাসমতো চারপাশে চোখ বোলাল এমেলিয়া। এখনও মনে হচ্ছে কেউ ওকে গোপনে দেখছে। অথচ মিসেস বিশপকে দেখেছে সে

চলে যেতে। মিসেস বিশপ চুপিচুপি আবার ফিরে আসেননি তো? সন্দেহমুক্ত হবার জন্যে এমেলিয়া বারদুই নক করল ড্রইংরুমের দরজায়। কোনো সাড়া নেই। সাহস করে এবার সে দরজা খুলল, পা রাখল ভেতরে। খোলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে, ঘরটা ঝকঝক করছে, এমেলিয়ার ভয় অনেকটাই কেটে গেল। দ্রুত পা চালাল সে ফায়ারপ্লেসের দিকে। সিন্দুকে তালা মারা নেই। ডালা খুলতেই একটা চাবি চোখে পড়ল। স্বপ্নে দেখা সব ঘটনা বাস্তবে ঘটে যাচ্ছে। 'ইশ, ওই বন্ধঘরে যদি সত্যি টাকা থাকে', মনে মনে বলল এমেলিয়া, তাহলে টাকা নিয়ে এক্ষুনি কেটে পড়ব। স্বাধীন হয়ে যাব আমি। স্বাধীন এবং ধনী।'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে দৌড় দিল এমেলিয়া প্যাসেজের শেষ মাথায়, বন্ধঘরের দিকে। দরজায় তালা মারা। চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা, এমেলিয়ার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল ঘরটা। ঘরের মাঝখানে, ওর স্বপ্নে দেখা পালঙ্কটা সত্যি আছে, এককোনায় একটা আয়রন সেফ। এ ছাড়া আসবাব বলতে খানকয়েক চেয়ার এবং একটা আয়না। আয়নার দিকে মুগ্ধচোখে তাকাল এমেলিয়া। আয়না ওকে সবসময় অভিভূত করে তোলে। আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে কোনো ক্লান্তি নেই ওর। কল্পনায় তো প্রায়ই ও নিজেকে ফিল্মের নায়িকা ভাবে। ভাবে অনেক টাকা থাকলে দামি দামি ড্রেস কিনে, সাজগোজ করলে ফিল্মের নায়িকাদের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ দেখাবে না ওকে। ঘরের এই আয়নাটার দিকেও তাকিয়ে রইল এমেলিয়া। পালঙ্কের পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি পড়েছে আয়নায়। এমেলিয়া দেখল শাদা চুল, শাদা গোঁফের এক বুড়ো শুয়ে আছে বিছানায়, ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ ফায়ারপ্লেসের পাশে, দেয়ালের সাথে লাগানো আলমারির দরজা ফাঁক হয়ে গেল, ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। মিসেস বিশপ। তবে বিছানায় শোয়া বুড়োর মতো মিসেস বিশপেরও চারপাশে ধোঁয়াটে একটা পর্দা দেখা যাচ্ছে। মহিলার পরনে নীল সিল্কের ড্রেসিং গাউন, তাতে বড় বড় মুক্তোর বোতাম, পায়ে উলের জুতো। এক হাতে সোনার বালা, অন্য হাতের আঙুলে অনেকগুলো ঝলমলে আংটি। এমেলিয়া লক্ষ করেছে মহিলা সবসময় গহনা পরে থাকতে ভালোবাসেন। তিনি পা টিপে টিপে এগোলেন বিছানার দিকে, তারপর একটা বালিশ তুলে নিলেন হাতে। তাঁর চোখে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর, ক্রূর চাউনি যা দেখে ভয়ে জমে যায় এমেলিয়া। তিনি বালিশটা ঘুমন্ত বুড়োর মুখে চেপে ধরলেন সর্বশক্তি দিয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল এমেলিয়া, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল। বিছানা খালি, ঘরও তাই। সে সম্পূর্ণ একা।

এত ভয় পেয়েছে এমেলিয়া যে সামলে উঠতে সময় লাগল। বুঝতে পারল আয়নায় ভৌতিক যে-দৃশ্যটা দেখেছে বাস্তবে তাই ঘটেছে। ওই বুড়ো আর কেউ নন, মি. বিশপ স্বয়ং। মিসেস বিশপ তাঁর স্বামীকে খুন করেছেন। হয়তো স্বামীর সাথে

তিনি মানিয়ে চলতে পারছিলেন না বা টাকার লোভে, কোনো কারণেই হোক স্বামীকে মেরে ফেলেছেন মিসেস বিশপ। আসল ঘটনা কেউ জানে না। তিনি রটিয়ে দিয়েছেন মি. বিশপ বিদেশে মারা গেছেন। ভয়ংকর সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল এমেলিয়া। মিসেস বিশপ তাহলে খুনি! এজেন্যই ওই বড় বড় নীল চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি তার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

এখন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু টাকা না নিয়ে যাওয়া যাবে না। এমেলিয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে আয়রন সেফের মধ্যে টাকা আছে। সে সেফের হাতল ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। কিন্তু খুলছে না সেফ। কোথাও গোপন বোতাম আছে কিনা ভেবে সেফের গায়ে হাত বোলাতে লাগল এমেলিয়া। সত্যি আছে। বোতামটায় চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল এমেলিয়া। সোনা! ড্রয়ারগুলো সোনার মুদ্রা, সোনার চুড়ি, আংটি, ব্রেসলেট আর নেকলেসে বোঝাই। মিসেস বিশপ কেন এ-ঘরটা সবসময় বন্ধ রাখেন সে রহস্য এবার জানা গেল। তিনি শুধু খুনি নন, চোরও। স্বামীকে খুন করে তার সমস্ত সোনাদানা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি।

এ ঘর সবসময় বন্ধ রাখেন যাতে কেউ জানতে না পারে এখানে কী আছে।

'আমি এখান থেকে কিছু গহনা সরিয়ে ফেলব,' বিড়বিড় করল এমেলিয়া। 'এগুলো পরলে নিশ্চয়ই আমাকে খুব সুন্দর দেখাবে।'

উত্তেজনার চোটে ভয় চলে গেছে এমেলিয়ার। সে দ্রুত কয়েকটা চুরি আর ব্রেসলেট পরে নিল হাতে, গলায় পরল নেকলেস। সোনার গহনায় নিজেকে রীতিমতো মুড়ে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়াল আয়নার সামনে। সাথে সাথে মুখ থেকে হাসি মুছে গেল, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নির্জলা আতঙ্ক। এমেলিয়া দেখতে পেয়েছে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন রক্তমাংসের মিসেস বিশপ। তাঁর হাতে লম্বা এক টুকরো তার, মুখটা কঠিন, চাউনিটা শীতল এবং ক্রূর। কিছুক্ষণ আগে অবিকল এই চেহারার ভৌতিক মিসেস বিশপকে দেখেছে সে আয়নায়।

'বেশ,' স্বভাবসুলভ ঠাণ্ডা, শান্ত গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি। 'অবশেষে ধরা পড়ে গেছিস তুই। আমার গোপন ব্যাপারগুলোও দেখে ফেলেছিস। আমার গহনাও পরে আছিস দেখছি। এদিকে আয় হারামজাদী।'

নীল চোখে কী সম্মোহনী জাদু আছে কে জানে, পায়ে পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এমেলিয়া। যেন সাপ সম্মোহন করে টেনে আনছে তার শিকারকে। এমেলিয়ার শরীরের সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার ভাষা এবং শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে, নীরবে সে তার মনিবনীর আদেশ পালন করল। সামনে এসে দাঁড়াল মিসেস বিশপের।

'হাঁটু গেড়ে বোস,' আদেশ করলেন মিসেস বিশপ।

এমেলিয়া হাঁটু গেড়ে বসল, তার চোখ স্থির হয়ে আছে মিসেস বিশপের ধবধবে শাদা হাত আর টকটকে লাল ড্রেসের ওপর।

সাবধানে দরজা বন্ধ করলেন মিসেস বিশপ, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন, হাতের তারটা দেখালেন এমেলিয়াকে।

'চিনিস এটা কী?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা নাড়ল এমেলিয়া, কথা বলতে চাইল, কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ, একটা শব্দও বেরুল না। 'এটা তোর গলায় বাঁধব আমি,' বলে চললেন মিসেস বিশপ, যত্নের সাথে এমেলিয়ার ঘাড় এবং গলায় জড়ালেন তারটা। 'তোর বাবা-মা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেও কেউ তোর খোঁজ নিতে আসবে না। কাজেই...' লম্বা, সরু, শাদা আঙুল দিয়ে তিনি ফাঁসটাকে শক্ত করে টানতে লাগলেন...

মূল : এলিয়ট ও ডোনেল

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

রবির দিকে তাকাল সে। একইভাবে শুয়ে আছে। মাত্র অল্পকটি দিন। কোথায় না গিয়েছে তাঁর সঙ্গে—জাফলং, হিমছড়ি, কুয়াকাটা, ফয়েজ লেক, রাঙ্গামাটি। রবি দেশের বাইরেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে রাজি হয়নি। অসম্ভব সুখী এক জীবন। সিতিমা স্মৃতির পাতা উল্টে গেল।

রবি শেভ করছে, আর গলায় কোনো এক গানের সুর ভেজে চলেছে। রবির গলাটা চমৎকার। সে নিজেও একসময় চমৎকার গাইতে পারত, জীবনটাও ছিল সুখ-দুঃখের। চমৎকার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু শুধু সেই একটি বিশেষ দিন থেকে সবকিছুই কেমন বদলে গেল। সিতিমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে রবির কাণ্ডকারখানা দেখছে; সে শেভ শেষে আফটার শেভ লাগাল।

'সিমা, মাই লাভ, আটটা বেজে যাচ্ছে, উঠে পড়ো ডিয়ার,' রবি চেঁচাতে লাগল বাথরুম থেকে।

সিতিমা চোখ বন্ধ করে ফেলল, কারণ রবি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে। কড়া আফটার শেভের গন্ধে সিতিমা উত্তেজনা বোধ করছে।

রবি ঝুঁকে ওর কপালে চুমু খেল। সিতিমা ওকে অবাক করে দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরল।

'এই যে দুষ্টু মেয়ে, তুমি তাহলে এতক্ষণ জেগে ছিলে?'

'রবি, আই লাভ ইউ।'

'মি টু,' রবি ওকে দুহাতে তুলে নিল। 'কিন্তু সেটা কোনো কাজের কথা না, এখন কটা বাজে জানো?'

'রবি তুমি আমায় ভালোবাস না?'

'বাসি। এখন দুষ্টুমির সময় নয়, হাতে খুব...'

'আই লাভ ইউ, রবি। তুমি আগে দশবার আই লাভ ইউ বলো, না হলে কিন্তু গলা ছাড়ছি না।' সিতিমা ছোট্ট মেয়ের মতো জেদ ধরল।

রবি একবার বলেই থেমে গেল, কারণ সিতিমা নিজেই বলা শুরু করেছে। সে এক নিশ্বাসে বলে গেল।

'রবি, তোমায় আমি এত ভালবাসি কেন বলো তো?'

'আমি যে বাসি, তাই।'

'বলো, আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না?'

'যাব না। আর একটাও কথা নয়।' সে সিতিমার ঠোঁটে আঙুল দিল। 'এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসো, আমি টেবিলে বসছি।'

সিতিমা সুবোধ বালিকার মতো বাথরুমের দিকে এগুলো।

'আবার কী হল!'

'তুমি কিন্তু এই চেয়ারটায় বসবে, বাথরুম থেকে যেন তোমায় দেখতে পাই।'

রবি এগিয়ে এসে সিতিমাকে জড়িয়ে ধরল। 'এত হারাবার ভয় কেনরে বোকা মেয়ে। এত ভয় পেতে হয় না।'

'তোমার জন্য সবসময় আমার কেমন যেন লাগে। রবি!'

'বলো।'

'তুমি আমাকে ভালোবাস না?'

'কেন বলছ? জানোই তো।'

'তাহলে কেন তুমি আমায় সারাক্ষণ এভাবে বুকে জড়িয়ে রাখো না?' সিতিমা কাঁদছে।'

রবি মেয়েটাকে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল। 'আই ফিল ইউ, মাই লাভ। আই ফিল ইউ জাস্ট ইন মাই ব্রেথ।'

'আবার বলো রবি, শুধু আরেকবার।'

রবি দুহাতে সিতিমার মুখটি তুলে ধরল, অশ্রু চিকচিক করছে চাঁদমুখে। 'বউ! লক্ষ্মীবউ আমার। এখনও অনেক কাজ বাকি। সাড়ে ন'টায় আমাদের ফ্লাইট, হাতে সময় খুব বেশি নেই। একটু তাড়াতাড়ি না করলে ফ্লাইট যে মিস করব, সোনা।'

সিতিমা আবার ওর বুকে মুখ লুকোতে চাইল।

'উঁহুঁ। নো দুষ্টুমি, আমার দিকে তাকাও। বলো তো আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'তুমি বলো।'

'উই আর অন্য দ্য রুট টু কক্সবাজার। যেখানে থাকছি শুধু তুমি আর আমি। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো রেডি হয়ে নাও, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'স্মাইলিং ফেস।'

সিতিমা মিষ্টি করে হাসল।

সিতিমা সেই প্রথম থেকেই চুপ করে আছে। বিমানে ওঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি। তুলার মতো মেঘগুলো কীভাবে পেছনে পড়ে যাচ্ছে সে অপলক দৃষ্টিতে তাই তাকিয়ে দেখছে।

'সিমা!'

'উঁ!' একটু চমকে উঠল যেন।

'মন খারাপ?'

সিতিমা রবির কাঁধে মাথা রাখল। 'না গো।'

'কিছু বলছ না যে!'

'ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'কিছু খাবে? এরা খুব চমৎকার জুস দেয়, সঙ্গে আর কিছু...।'

'কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমার কাঁধে শুয়ে থাকতেই ভাল্লাগছে।'

'সম্মানিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ...' অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে।

'সিমা, আমরা চিটাগং চলে এসেছি; এক্ষুনি প্লেন ল্যান্ড করবে। কী হল!'

'কানে খুব চাপ লাগছে। উহ্!'

'হাই তোলার চেষ্টা করো, আর জোরে জোরে দম ছাড়ো।'

সিতিমা তাই করল।

ভালো লাগছে এখন!

'হ্যাঁ...বিমানে উঠতে এজন্যেই আমার ভালো লাগে না।'

'প্লেন টেক অফ বা ল্যান্ড করার সময় প্রেশার ভেরিয়েশনের জন্য কানের পর্দায় চাপ পড়তে পারে, ওটা কিছু না।'

ওরা পতেঙ্গা এয়ারপোর্টে পা রাখল।

'আমরা এখন কানেকটিং ফ্লাইটে কক্সবাজার যাচ্ছি।'

'এ্যাই—চট্টগ্রামেও তো দেখার অনেক কিছু আছে; আবার বিমানে উঠতে ভালো লাগছে না।'

'তোমাকে নিয়ে যে কী করি!'

রবি সিতিমাকে লাউঞ্জে রেখে কাউন্টারে চলে এল। ফ্লাইট চেঞ্জ করতে তাকে বেশ ঝামেলাই পোহাতে হল।

'তোমায় অনেক কষ্ট দিয়ে ফেললাম, রাগ করোনি তো?'

'তাতে আপাতত অসুবিধার কিছুই নেই, হোটেলে ঠিকমতো পুষিয়ে দিলেই চলবে।'

'আস্তে বলো, চারদিকে এত মানুষ তোমার চোখে পড়ছে না!'

'কেন, আস্তে বলব কেন? আমি কথা বলছি আমার বউর সাথে, তাতে কোন্ শালার কী?' সে আরও গলা চড়াল।

সিতিমা খুবই লজ্জা পাচ্ছে, সে আর কথা না-বলাই ভালো মনে করল।

ওরা ফ্রিপোর্ট সল্টগোলা, বারেকবিল্ডিং ছেড়ে শহরের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকায় 'হোটেল আগ্রাবাদে' এসে উঠল।

হোটেলটি চমৎকার, আন্তর্জাতিক মানের। অত্যাধুনিক সমস্ত সুযোগসুবিধাই রয়েছে : সুইমিং পুলের নীল পানিতে দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার সঙ্গে এক কিশোরীকেও দেখা যাচ্ছে।

'সিমা—'

'তুমি আমার সাথে কথা বলবে না, নির্লজ্জ, বেহায়া। তুমি আর কক্ষনো আমার সাথে কথা বলবে না।'

'ওরেব্বাপ! হাই টেম্পারেচার। কফিও বানিয়ে ফেলা যেতে পারে, কী বলেন ম্যাডাম! কিন্তু ম্যাডাম এরকম একটা বন্ধ রুমে...আপনার সাথে আমি...মানে বুঝতেই পারছেন...আফটার অল আমি একজন সক্ষম পুরুষ।'

সিতিমাকে রাগী চোখে তাকাতে দেখে রবি থামল।

'ইয়ে...মানে...বলছিলাম কী, আমি বোকাসোকা মানুষ, একটা অন্যায় নাহয় করেই ফেলেছি, একটু কনসিডার করলে হয় না—বলেন তো আপনার কিছু ফাই-ফরমাশ খেটে দিই?

সিতিমা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

'পা টিপে দেব ম্যাডাম?' বলেই একলাফে উঠে এসে পা ধরতেই সিতিমা ওকে কান ধরে দাঁড়া করাল।

'আঁ, আঁ আপনার এত কষ্ট করার দরকার নেই ম্যাডাম, একটু হালকা করুন...এই দেখুন কান ধরা কাকে বলে,' এক দুই গুনতে গুনতে রবি এবার কান ধরে ওঠবোস করতে লাগল।

সিতিমা হেসে ফেলল।

হুররে! রবি এসে সিতিমাকে দুহাতে শূন্যে তুলে ফেলল।

'তুমি সবসময় এমন উল্টোপাল্টা কাজ করো, আমার কষ্ট হয় না?'

'এই নাকে খত দিলাম। নো উল্টোপাল্টা কাজ। নো কষ্ট। এখন থেকে কাজ হবে সব সোজাসাপ্টা।'

'না আরও করবে, আমায় আরও কষ্ট দেবে।'

'অ্যাঁ—'

'হ্যাঁ, সারাজীবন এমনি করে একটু একটু কষ্ট দেবে, দেবে না—?'

ওদের বিয়ে হয়েছে আজ ছ'সপ্তাহ। কষ্ট দেয়ার সময় বৈকি, এরাই যে পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষগুলোর নমুনা।

সিতিমারা আজ এসেছে ফ্রয়েজ লেকে। সিতিমাকে ছোট্ট মেয়ের মতোই লাগছে। সে কিছুটা দিশেহারাও বোধ করছে। প্রকৃতির এ অকৃপণ হাতের দানকে সে যেন ঠিক স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। কী বলবে তাও বুঝতে পারছে না।

সিতিমা রবির বাহু আঁকড়ে ধরল। 'দ্যাখো, কী সুন্দর! কী সুন্দর লেক, পাহাড়,

গাছ; ফুল দ্যাখো...মেয়েটির গলা কাঁপছে।

'সবকিছু এত সুন্দর কেন?' লেকের চারপাশের অস্বাভাবিক নিসর্গ সিতিমার কান্নার বাঁধ ভেঙে দিল। 'আমি সহ্য করতে পারছি না। রবি, আমি সত্যি সহ্য করতে পারছি না...আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে।'

'চলো...।' রবির কাঁধে মাথা রেখে সিতিমা হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের ঘন সবুজের মাঝে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পথে ওরা হাঁটছে, কেউই কথা বলছে না। পড়ন্ত বিকেলের লাল সূর্য গোটা পরিবেশটাকে আরও মায়াবী করে তুলেছে। নির্বাক প্রকৃতি সবাককেও নির্বাক করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

হঠাৎ সিতিমা প্রবল ঝাঁকি খেল। সে হতভম্বের মতো চেয়ে রইল, তার পাশে রবি নেই। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাগলের মত চিৎকার করতে লাগল, আর তখনই দেখল দৃশ্যটা।

এবড়োখেবড়ো পথে চলার সময় রবি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রায় দুশো ফিট নিচে পড়ে যায়; সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সিতিমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

সিতিমা বুঝতে পারছে না, সে বেঁচে আছে কিনা। সে হাত মুঠি করার চেষ্টা করল, পায়ের আঙুল নাড়ানোর চেষ্টা করল।

তার মানে হচ্ছে, সে হয়তো বেঁচেই আছে।

সে কারও ডাক শুনতে পেল, হ্যাঁ কে যেন ডাকছে; প্রতিটি কথা সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে, এ কণ্ঠ তার খুবই চেনা।

সে জবাব দিচ্ছে, যদিও সে নিজেও বুঝতে পারছে তার কথা অপরপক্ষের কানে পৌঁছাচ্ছে না।

হঠাৎ চোখেমুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা লাগল যেন। তাকে কেউ ডেকে চলেছে; সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সাড়া দেয়ার জন্যে, তার ঠোঁটদুটো একটু নড়ে উঠল কেবল।

'সিমা, চোখ খোলো। সিমা, এই দেখো, আমি এখানে! সিমা—এই যে তাকাও আমার দিকে—।'

সিতিমা চোখ মেলল, রবি তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে, তার মনে হল রবির মুখটা যেন লম্বাটে হয়ে গেছে, সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'রবি তুমি বেঁচে আছ...আমি বেঁচে...!'

'কথা বোলো না। চুপ করে থাকো। একটু শক্তি সঞ্চয় করো।' রবি ওকে নির্ভরতা দেয়ার চেষ্টা করল।

'আমরা...আমরা এখন কোথায়, রবি?'

'আমরা, এই যে হোটেলে। আমাদের কারও কিছু হয়নি সিমা—আমরা ভাল আছি, সুস্থ আছি, বুঝতে পারছ!'

'হ্যাঁ।'

'এখন একটু ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ঘুমুবার চেষ্টা করো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।' রবি সিতিমার মাথা কোলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। সিতিমা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন। সিতিমা যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছে।

সে ডাকল, 'রবি!' সাড়া না-পাওয়ায় আবার ডাকল।

রবি এবার সাড়া দিল।

'কী করছিলে!' জানতে চাইল সিতিমা।

'গান শুনছিলাম ওয়্যাকম্যানে, রিচার্ড মার্ক্স-এর অসাধারণ গান, শুনবে?'

তার শোনার কোনো ইচ্ছেই নেই, কিন্তু রবির আগ্রহ দেখে তার মায়া হল

'কী গান?'

রবি গাইতে লাগল—

I wonder how we can survive this romance–
But in the end, If I'm with you
I'll take that chance,
Oh, Can't you see it baby...

'রবি!'

'বলো।'

'সেদিন কী হয়েছিল?'

'কিসের কথা বলছ?'

'তুমি হঠাৎ অত উপর থেকে পড়ে গেলে—'

রবি উঠে এসে সিতিমার দুহাত ধরল। 'সিমা, আমাদের কারও কিছু হয়নি। উই বোথ আর পারফেক্টলি অ'রাইট। এ নিয়ে আর ভেবো না।'

'কিন্তু...।'

'কোনো কিন্তু নেই। যা শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে ভাবলে শুধু তোমার মন খারাপই হবে; সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

সিতিমা খোলা জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, শহরের চলমান জীবনের দিকে। 'রবি, আমরা যাচ্ছি কবে?'

'কোথায়?'

'রাজশাহীতে?'

'কেন, মনে নেই আমাদের কক্সবাজার যাওয়ার কথা?'

'পরে না হয় আবার আসব, এখন যেতে মন চাইছে না।'

'তথাস্তু! সেক্ষেত্রে সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছানুযায়ী আগামীকালই আমরা প্রত্যাবর্তন করব। খুশি?'

'খুশি।'

'বকশিশ!'

সিতিমা 'বকশিশ' দিল।

নিঝুম ভিলা। রাণীবাজারে তাদের এ বাড়িটি অন্যান্য বাড়ি থেকে যথেষ্ট পৃথক এবং বিচ্ছিন্নও বটে; মূল রাস্তা বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে হাতের বাঁদিকে মোড় নিলেই দুটি বাবলাগাছ দেখা যাবে, গাছগুলো যেন জড়াজড়ি করে বাড়িটাকে আড়াল করে রাখতে চাইছে। ওদের বাড়িটার পেছনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে অদ্ভুত বাগান রয়েছে। সিতিমা যতবারই তাকায়, বেশ অস্বস্তি বোধ করে। রবি একথা বলতেই সে এটাকে হেসে উড়িয়ে দিল।

সিতিমা বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়িটির দিকে তাকাল। নিকষ অন্ধকারেও তার দেখতে কোনো অসুবিধা হল না, ঘণ্টার কাঁটাটি ২-এর খানিকটা ডানে নেমে গেছে, মিনিটের কাঁটা ৬-এর ঘরে থমকে আছে। রবি পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে তাদের মাঝে ভালোবাসাবাসির ব্যাপারটি হয়ে গেছে। অন্যান্য রাতগুলোতে সেও এসময়ে সারাশরীরে এক সুখময় ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আজ তার চোখে ঘুম নেই, থাকার কথাও নয়। এখনকার সে, কিছুক্ষণ আগের সিতিমাটিও নয়।

এটা হচ্ছে তার বিয়ের উনপঞ্চাশতম রাত, বিশেষ রাত।

আকাশে এখনও পূর্ণচন্দ্র। সিতিমা জানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ চন্দ্রিমা ম্লান হতে শুরু করবে, নেমে আসবে ঘোর অমাবস্যা, আসতেই হবে। এটাই নিয়ম। সিতিমা দৃষ্টিতে অশরীরী তাণ্ডব নিয়ে প্রহর গুনছে।

মেঘহীন আকাশে পরপর তিনবার বিদ্যুৎ চমকাবে এবং ঠিক তৃতীয় চমকের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশজোড়া পেঁচা একযোগে ডানা ঝাপটাবে, রক্তচোষা বাদুড় দিগ্বিদিক ছুটতে থাকবে, গাছের ডালে বহুরূপী একে অপরের কণ্ঠরোধ করবে, নিশাচর প্রাণীগুলো প্রকৃতির এ অসম্ভব সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমস্বরে ডেকে উঠবে, আর এক তরতাজা হৃদপিণ্ডের বিনিময়ে জন্ম নেবে এক নূতন সিতিমা—সপ্তম সিতিমা।

রবি নড়াচড়া করছে। সিতিমা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

রবি এবার উঠে বসল, সিতিমার দিকে একবার তাকিয়ে বিছানা থেকে নামল। সিতিমা দেখল সে বাথরুমে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল যখনই তার গভীর রাতে ঘুম ভেঙেছে, রবিকে পাশে দেখেনি। ঘুম ভেঙে বাথরুম করাটা মানুষটার অভ্যাস হয়ে গেছে; মানুষটা জানে না এরপর থেকে আর বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না;

সিতিমার মুখে রাক্ষসী হাসি।

সবকিছুই ঠিকমতো চলছে। বাইরে চাঁদের আলো ম্লান হয়ে যেতে শুরু করেছে। বাতাসে গাছের পাতায় সরসর করে উঠল, নাকি প্রকৃতির উন্মাদ খেয়ালের আগাম বার্তা পাঠাল। সিতিমার ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছে। চাঁদের আলো আরও ম্লান হল। সিতিমার মাঝে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। রবি আসছে না কেন, রবি কোথায়! সে আরও অস্থির হয়ে উঠল।

চন্দ্রালোকিত পৃথিবী হঠাৎই ঘোর অমাবস্যায় নিপতিত হল এবং আকাশে প্রথম বিদ্যুৎচমকের সাথে সাথে দানবী সিতিমার আত্মপ্রকাশ ঘটল। সে নারকীয় উন্মাদনায় প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে। রবি এসে ঘরে দরজায় পা রাখতেই পরিস্থিতি অনুধাবন করল।

সিতিমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। প্রকৃতি তাকে ঠকিয়েছে। তার সপ্তম বাছাই ভুল ছিল। এ হচ্ছে সেই রবি যে জাফলং-এ দু'ঘণ্টা পানির নিচে থেকেও বেঁচে আছে, কুয়াকাটায় যে সাপটি তাকে ছোবল দেয়ার জন্যে ফণা তুলেছিল সে লক্ষ্যই করেনি রবি তা জ্যান্ত গিলে ফেলেছে, ফয়েজ লেক-এ দুশো ফিট উপর থেকে পড়েও এ রবি অক্ষতই রয়ে গেছে। সিতিমা জানতেই পারেনি গভীর রাতে সে যেত বাড়ির পেছনের বাগানে, যেখানে সে আবাদ করত ভয়ংকর সরীসৃপের।

এ রবিও যে প্রহর গুনছে তার নবজন্মের, তার দৃষ্টি সিতিমার গর্ভের দশম সপ্তাহের ভ্রূণের দিকে; ওটাই যে তাকে নূতন প্রাণ দেবে। ভুল করে ফেলেছে রবিও তার নির্বাচনে।

দ্বিতীয় বিদ্যুৎচমক হল।

ভয়ংকর ক্রোধে দানবী রবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার দরকার একটা তাজা হৃৎপিণ্ড। সে আক্ষরিকভাবেই রবির বুক ছিঁড়ে ফেলল। জান্তব গর্জনে রবি ছুড়ে মারল সিতিমাকে ঘরের দেয়ালে। থেঁতলানো শরীর নিয়ে সিতিমা উঠে দাঁড়াল, তালতাল মাংসপিণ্ডের দু'হাত বাড়িয়ে রবির দিকে এগুতে লাগল। দানবের ছিঁড়ে ফেলা বুক আবার এক হয়ে যাচ্ছে যেন। সিতিমার দুর্ভাগ্য, সে জানে না রবির গলায় অস্বাভাবিক বড় এডাম্‌স এপলটি যতক্ষণ অক্ষত থাকছে, তার ধ্বংস সম্ভব নয়। সিতিমা জানালায় হাত রাখল, হ্যাঁচকা টানে পুরো লোহার গ্রিল খুলে ছুড়ে মারল রবির দিকে। রবি মেঝেতে পড়ে রইল, তার মাথা দুভাগ হয়ে মগজ বেরিয়ে এসেছে। সিতিমা সেদিকে এগুলো।

রবি আবার উঠে বসেছে। এবার সে সিতিমার মুখোমুখি হল। সিতিমার মাংসপিণ্ডের দেহটাকে দুহাতে প্রচণ্ড চাপে বিকৃত করে ঘরের অন্যপ্রান্তে আছড়ে মারল।

তৃতীয়বারের মতো বিদ্যুৎ চমকাল। এই সেই মুহূর্ত; এখনই প্রকৃতি জন্ম দেবে নূতন সিতিমার, নাহয় তাকে ধ্বংস করবে।

সিতিমা অশরীরী শক্তিতে মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল রবির উপর, তার দুহাত ছিঁড়ে ফেলল। ভয়ংকর গর্জনে রবি তাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল। সিতিমা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। প্রকৃতির সিদ্ধান্ত সে জেনে গেছে। গোঁ গোঁ শব্দে রবি এগুচ্ছে সিতিমার দিকে। সিতিমা তার শেষ শক্তিটুকু নিয়ে রবির গলা পেঁচিয়ে ফেলল, সে ক্রমশ মোচড়াতে লাগল। মাথা থেকে ধড় আলাদা করে ফেলতে চাইছে। হাতহীন রবি কোনোভাবেই তার গলা রক্ষা করতে পারছে না।

ধ্বংস হল দুই শক্তি।

ত্রিশজোড়া পেঁচার ডানা ঝাপটানো থেমে গেছে, রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার স্থিরতা পেয়েছে, গাছের ডালে বহুরূপীরা আনন্দে গলাগলি করল আর তাবৎ নিশাচর প্রাণী প্রকৃতির এ অভাবনীয় সিদ্ধান্তকে সমস্বরে সাধুবাদ জানাল। প্রকৃতিও জবাব দিল, সমস্ত চিহ্ন নিয়ে গোটা বাড়িটি অস্তিত্বহীন করে দিল, যেন কখনও কিছুই ছিল না, কিছু থাকার কথাও ছিল না।

পৃথিবীর ঘুমন্ত মানুষগুলো কখনও জানবে না এ রাতের কথা। একজন রবির কথা! একজন সিতিমার কথা! শান্তিতে ঘুমাক মানুষগুলো।

এম. সাইফুর রহমান

শাহেরজাদী

মাঝরাতে দরজায় খট্‌খট্ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আলমের। দরজা খুলে দেখল এক অনিন্দ্যসুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী দাঁড়িয়ে। মেয়েটার রূপের দীপ্তিতে একটা ধাক্কা খেয়েছে আলম। ভুল দেখছি না তো। চোখদুটো কচলে আবার তাকাল সে। ভাবল এতরাতে আমার ঘরে তো কোনো তরুণী আসার কথা নয়। সে সামলে ওঠার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল তরুণী। মধুঢালা কিন্নরীকণ্ঠে বলে উঠল, 'স্যার, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে, আপনার দুটি পায়ে পড়ি,' মেয়েটা সত্যি সত্যি আলমের দিকে এগিয়ে এল। যেন পায়ে ধরবে।

আলম তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল। বলল, 'আরে, কী করছেন।'

আলম ওরফে রফিকুল আলম পেশায় একজন শিক্ষক। বি.সি.এস. পাস করে এবারই একটা সরকারি কলেজে জয়েন করেছে। প্রথম পোস্টিং পেয়েছে একটা মফস্বল শহরের কলেজে। বেশ পুরনো একটা কলেজ। মফস্বল শহরটা বলতে গেলে পরিপূর্ণ একটা শহরই। শহুরে আধুনিক সব সুবিধাই আছে এখানে। প্রথমবারেই এত ভালো একটা জায়গায় সাধারণত পোস্টিং হয় না, লবিং ছাড়া তো নয়ই। কিন্তু মামা চাচা কিংবা টাকা কোনোটারই জোর নেই আলমের, তাই এত ভালো জায়গায় পোস্টিং পেয়ে একটু অবাকই হয়েছিল ও। কলেজের পাশেই একটা কোয়ার্টার পেয়েছে। গাছগাছালি ঘেরা এই বাসাটিও অসাধারণ।

ওর কলেজে ওই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক। বাদবাকি সবাই শিক্ষিকা। কলেজে শিক্ষকদের রেজিস্ট্রি বুকটা ঘাঁটতে গিয়ে একটা অদ্ভুত তথ্য পেয়েছে ও। অনেকদিন এই কলেজে কোনো পুরুষ শিক্ষক ছিল না। দেড়বছর আগে প্রথম একজন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় এখানে। তারপর একে একে আরও পাঁচজন পুরুষ শিক্ষক এখানে ঘুরে গেছেন। কেউই টেকেননি। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পোস্টিং নেবার কিছুদিন পর সবাই বদলি নিয়েছেন। এর কারণটা কলেজের শিক্ষিকা ও ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছে আলম। কিন্তু কেউই এর সঠিক কারণ জানে না। শুধু একজন শিক্ষিকা ঠাট্টা করে বলেছেন, হয়তো এখানকার শিক্ষিকাদের সাথে পেরে ওঠে না তাই।

হেসে উড়িয়ে দিলেও আলমের মনে একটা খুঁতখুঁতানি ছিলই। কিন্তু দুমাস

চাকরি করার পর ওর সব সন্দেহ কর্পূরের মতোই উবে গেল। এত সুন্দর একটা মফস্বল শহর, ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। শহুরে সব সুযোগসুবিধাই পাওয়া যায়, এখানকার লোকজনগুলোও বেশ ভালো। সংসারে আপনজন বলতে মা বড় ভাই ভাবী। মা বড়ভাইয়ের সাথে ঢাকায় থাকেন। এখনও বিয়েথা করেনি আলম, তাই বেশ একা একা ছিমছাম জীবন কাটাচ্ছিল।

একটু ধাতস্থ হয়ে আলম খেয়াল করল, ওর গায়ে কোনো জামা নেই। লুঙ্গি পরে খালিগায়েই দরজা খুলেছিল। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা জামা পরে নিল। এবার মেয়েটির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আলম। সুন্দরী, সন্দেহ নেই, কিন্তু মতলবটা আগে জানা দরকার, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

মেয়েটি হড়বড় করে বলে উঠল, 'পাশের গ্রামে, আপনাকে যেতেই হবে স্যার, আপনার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের প্রাণপ্রিয় শাহেরজাদীর জীবন।'

চমকে উঠল আলম, উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শাহেরজাদীর?'

শাহেরজাদী আলমের এক ছাত্রী। এই ছাত্রীর সাথে আলমের পরিচয় বেশ অদ্ভুতভাবে। একদিন এক তরুণী আলমের সাথে দেখা করতে আসে। বেশ সসঙ্কোচে ইনিয়ে বিনিয়ে জানায় ও আলমের কাছে পড়তে চায়। আলম সোজা মানা করে দেয়, ও আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে কখনও প্রাইভেট পড়াবে না। মেয়েটাকে বলল, 'তুমি কলেজে আমার ক্লাস কোরো, তাতেই হবে, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করবে কেন?'

মেয়েটা বলে, 'তা সম্ভব নয়, স্যার, আমি এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম। শুধু অঙ্কে ফেল করেছি।'

আলম তখন পরিষ্কার জবাব দিয়ে দেয়, 'আমার পক্ষে তোমাকে পড়ানো সম্ভব নয়।'

এতবড় মেয়ে ওর সামনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ওকে নাকি এবারে পাস করতেই হবে, যদি পাস না করে, তবে ওর নাকি এ বছরই বিয়ে হয়ে যাবে। ও আরও পড়ালেখা করতে চায়।

এবার বেশ ভাবনায় পড়ে আলম। শেষমেশ রাজি হয়, তবে একটা শর্তে, ও কোনো টাকাপয়সা নেবে না।

তরুণী অবশ্য টাকাপয়সার অভাবও অন্যভাবে পুষিয়ে দেয়। প্রায়ই আলমের জন্য এটা-সেটা রান্না করে নিয়ে আসে। ওর ঘরকন্নার যাবতীয় কাজই করে দিয়ে যায়। প্রথম প্রথম হালকাভাবে তারপর কড়াভাবে মানা করে শেষমেশ হাল ছেড়ে দেয় আলম। তবে মেয়েটা ছাত্রী হিসেবে খুব ভালো। হয়তো পর্যাপ্ত গাইডেন্সের অভাবে ফেল করেছে।

মেয়েটার প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে আলমের। কোনো কোনোদিন

যদি বিকেলে মেয়েটা পড়তে না আসে তবে দিনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে আলমের। মেয়েটাকে একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু করেছে আলমের। গত চারদিন মেয়েটা পড়তে আসেনি ওর কাছে। উদ্বিগ্ন স্বরে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল আলম, 'কী হয়েছে শাহেরজাদীর?'

মেয়েটা বলল, 'শাহেরজাদীর প্রচণ্ড জ্বর, জ্বরের ঘোরে ও শুধু আপনার নামই বকছে। ডাক্তার বলেছে এই সময় আপনি ওর পাশে থাকলে ভালো হয়, না হলে প্রচণ্ড মানসিক শক থেকে ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।'

আলম মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'শাহেরজাদী আপনার কে হয়?'

মেয়েটা বলল, 'আমি শাহেরজাদীর সখী, শাহেরজাদী আমাদের জমিদার হুজুরের একমাত্র সন্তান।'

'জমিদার, কোন্ জমিদার?'

'জমিদার আশরাফ খান, এ এলাকার জমিদার উনি।'

আলম ভাবল, এ নাম তো আগে শুনিনি। তা ছাড়া জমিদারি প্রথা তো অনেক আগেই উঠে গেছে, তবে এখনও অনেকে জমিদারের বংশধরদের জমিদার বলেই সম্বোধন করে। তা ছাড়া পুরুষানুক্রমে কিছু জমি পাওয়ায় সেগুলো থেকে খাজনাও নিয়মিত পেয়ে থাকে একালের নামসর্বস্ব জমিদাররা। আলম ভাবল, এ মেয়েটার সাথে এত রাতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মফস্বল শহর, লোকলজ্জার ভয় আছে। তা ছাড়া কে কোন্ মতলবে মেয়েটাকে পাঠিয়েছে কে জানে।

মেয়েটা ওর মনোভাব কী করে যেন বুঝে গেল। বলল, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার। আমার সাথে নায়েব চাচা আছেন আর যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে।'

এরপর আর কথা চলে না। প্রস্তুত হয়ে এসে মেয়েটাকে বলল, 'চলুন।' বাইরে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আলম।

এই যাতায়াতের সুব্যবস্থা? একটা সেকেলে দুচাকার ঘোড়ার গাড়ির টমটম দাঁড়িয়ে। দুটো শাদা ঘোড়া অধৈর্যভাবে পা ঠুকছে মাটিতে। টমটমেরও সামনে যাত্রার দলের লোকদের মতো আগেকার আমলের রাজকীয় পোশাক পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, লোকটা বোধহয় নায়েব। টমটমের চালকের একই রকম পোশাক। হঠাৎ আলমের মনে একটা খটকা লাগল। মেয়েটার পরনেও সেকেলে লম্বা লম্বা ঝুলওয়ালা শাদা সিল্কের লেহেঙ্গা। এদের সবার পোশাকআশাক দেখে মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে এরা। আজকাল কেউ এরকম পোশাক পরে নাকি। হঠাৎ মেয়েটা অধৈর্য হয়ে তাড়া দিল, 'উঠুন না, সার।'

আর কিছু চিন্তা না করে টমটমে উঠে বসল আলম। ওর পাশে বসল নায়েব সাহেব আর তরুণীটি।

ওরা বসার সাথে সাথেই ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করল টমটম। আগে কখনও টমটমে চড়েনি আলম। টমটম যে এত জোরে ছুটতে পারে এটা ওর ধারণার বাইরে ছিল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আলম। চেঁচিয়ে চালককে জোরে চালাতে মানা করতে যাবে, এমন সময় টমটমটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আলম দেখল একটা বিশাল রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টমটম। এই এলাকায় এতবড় একটা রাজবাড়ি আছে জানত না ও। টমটমটার তো পাঁচ মিনিটও সময় লাগেনি এখানে আসতে। তার মানে এ জায়গাটা ওর বাসা থেকে খুব দূরে নয়। তা হলে এতদিন কেন চোখে পড়েনি বাড়িটা? ও তো প্রায় পুরো এলাকাটাই চষে বেড়িয়েছে, কখনও দেখেনি বা কারও কাছ থেকে শোনেওনি এ বাড়ির কথা।

পাশে দাঁড়ানো নায়েবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আলম, 'বলুন তো এটা ঠিক কোন্ জায়গা?'

কোনো জবাব পেল না। বরঞ্চ পলকহীন দৃষ্টিতে আলমের দিকে তাকিয়ে রইল নায়েব। বিনা কারণেই হঠাৎ শিউরে উঠল আলম। লোকটার চোখের দৃষ্টি ঠিক মরামানুষের মতন। আলম সাহসী মানুষ, সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আজ কেন জানি ভয়ের একটা স্রোত ওর বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এল। হঠাৎ করেই ওর মনে হল এতদিন ধরে ও শাহেরজাদীকে পড়াচ্ছে, কিন্তু কখনও মেয়েটা বলেনি সে জমিদারের সন্তান। তা ছাড়া ওর আচরণ এত স্বচ্ছন্দ ছিল যে ওকে কোনো গ্রাম্য সহজ সরল মেয়ে বলেই মনে হত। ওর পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করলে বলত সংসারে ওর বৃদ্ধ বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু কেন এই লুকোচুরি? নাকি এই মেয়েটাই মিছে কথা বলে ওকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসেছে? কিন্তু কেন? হঠাৎ পাশ থেকে কার খ্যানখ্যানে গলা শুনে চমকে তাকাল আলম। বৃদ্ধ নায়েব ওকে ভাঙা গলায় বলছে, 'চলুন, ভেতরে চলুন।'

আলমের ইচ্ছা হল ঘুরে দৌড় দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী।

নায়েবের সাথে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল আলম। গ্রামাঞ্চলের গভীর রাত, চারদিকে শুনশান নীরবতা। কী আশ্চর্য, একটা ঝিঁঝির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকেই অনেক মানুষ দেখে একটু স্বস্তিবোধ করল আলম। মানুষগুলোর পরনে সেকেলে পোশাক। সবাই কেমন মাথা নিচু করে হাঁটছে, কেউ আলমের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছেও না। নায়েব বড় একটা হলঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটা সিঁড়ি বেয়ে রাজবাড়ির দোতলায় উঠতে শুরু করল, পিছনে চলছে আলম। ওর গা ঘেঁষে চলছে তরুণীটি। কী মনে হতে তরুণীটির মুখের দিকে তাকাল আলম। সাথে সাথেই ভয়ে শিউরে উঠল। তরুণীটির মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে, কিছুক্ষণ আগের সেই কমনীয়তা আর নেই, তার বদলে মুখের চামড়া মরা মানুষের

মতো ফ্যাকাশে, চোখের দৃষ্টি মরামানুষের মতো।

আলমের হঠাৎ মনে হল, ও এদের সাথে এসে বিরাট ভুল করেছে। পালাবার কথা মনে হতেই পিছন ফিরে তাকাল আলম, দেখল সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টমটমের চালক, সেই একই দৃষ্টি নিয়ে, পলকও পড়ছে না চোখের।

হঠাৎ কী হল আলমের, সম্মোহিতের মতো নায়েবের পিছু পিছু দোতলার শেষপ্রান্তে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ও।

বিরাট একটা ঘর, একটা প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে ঘরটায়! স্বল্প আলোতে দেখল একটা খাট, তার উপর আপাদমস্তক চাদরে মোড়ানো একজন মানুষ শুয়ে। আলম যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সম্মোহিতের মতো খাটের দিকে এগুলো ও। খাটের পাশে গিয়ে হঠাৎ ধাতস্থ হয়ে নিজের মধ্যে ফিরে এল ও। সত্যিই এ শাহেরজাদী। চোখদুটো বোজা, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে। আলম ভাবল, ধুর, শুধুশুধু এতক্ষণ ভয়ে কাবু হয়ে ছিলাম। জ্বরটা বোঝার জন্যে শাহেরজাদীর কপালে একটা হাত রাখল ও সাথে সাথেই বরফের মূর্তির মতো জমে গেল।

শাহেরজাদীর গা মরামানুষের মতো ঠাণ্ডা! শাহেরজাদীর চোখদুটো খুলে গেল, দৃষ্টিটা ঠিক মরামানুষের চোখের মতো। হঠাৎই শাহেরজাদীর গায়ের চাদরটা সরে গেল। সাথে সাথেই একটা আর্তচিৎকার গলা নিয়ে বেরিয়ে এল আলমের। চাদর সরে যাবার পর দেখা গেল শুধু একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে বিছানায়। প্রচণ্ড ভয়ে জ্ঞান হারাতে বসল ও। জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে পেল চারদিকে বীভৎস অশ্লীল মেয়েলি হাসির শব্দ। জ্ঞান হারিয়েই যেন নিশ্চিন্ত হল আলম।

জ্ঞান ফিরলে আলম দেখল ও এক ভাঙাচোরা বাড়ির মধ্যে পড়ে রয়েছে। চারদিকে কড়া রোদ উঠে গেছে। ঘুমের ঘোরে কিছুতেই মনে করতে পারল না ও এখানে কেন। তারপর হঠাৎ সবকিছু মনে পড়াতে তড়িঘড়ি করে উঠে বসল আলম। সাথে সাথেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল। সারা গায়ে অসম্ভব ব্যথা। কিন্তু তারপরও পাগলের মতো ছুটে ওই পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, দেখল সামনে শুধু ধু-ধু বিস্তীর্ণ মাঠ। পাগলের মতো সেই মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল আলম। ওই পোড়োবাড়ি থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে বেশিক্ষণ ছুটতে পারল না ও। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে ওর ফুসফুসটা, চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে ও। হঠাৎই দেখল কিছুদূরে এক চাষি হাল চষছে। সেদিক লক্ষ করে প্রাণপণে দৌড়ুতে লাগল। কোনোমতে চাষির কাছে পৌঁছেই আবার জ্ঞান হারাল ও।

জ্ঞান ফিরলে আলম দেখল ও এক মাটির ঘরে পাটির ওপর শুয়ে আছে। ওর মাথার পাশে দুই বুড়োবুড়ি গম্ভীর উদ্বেগে ওর দিকে চেয়ে আছে। তাদের পাশে

দাঁড়িয়ে এক জোয়ান লোক, সেই চাষিটি। আলম উঠে বসার চেষ্টা করলে বৃদ্ধাটি বলল, 'থাক, বাবা, থাক, তুমি শুইয়া থাকো।' বৃদ্ধা এক গ্লাস গরম দুধ এনে আলমকে খাইয়ে দিল।

শরীরে একটু শক্তি পেল ও। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখানে কেন?'

বৃদ্ধা বলল, 'তুমি বাবা মাঠের মইধ্যে অজ্ঞান হয়া পইড়া গেছিলা, আমার পোলায় তুমারে তুইলা আনছে। তা বাবা তুমার বাড়ি কই, থাকো কই?'

আলম বলল, ও থাকে মতিগঞ্জে।

'মতিগঞ্জ,' বৃদ্ধা অবাক হল, 'সে তো ম্যালা দূর, এইখানে আইছিলা ক্যান?'

আলম একটু চিন্তা করল বলবে কি না। শেষে স্থির করল বলবে, পুরো ঘটনা বৃদ্ধাকে খুলে বলল ও। বৃদ্ধা সব শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। আলমকে বলল, 'তুমারে একটা কথা কই, বাবা! তুমি মতিগঞ্জ ছাইড়্যা চইলা যাও। নইলে জানে বাঁচবা না।'

আলম জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

তখন বৃদ্ধা এক কাহিনী বলতে শুরু করল, 'আমিও এই ঘটনা আমার আব্বার মুখ থেইকা হুনছি। এইটা ইংরেজ আমলের ঘটনা। এই এলাকার জমিদার আছিল ওসমান খান। তার একটা মাত্র মেয়ে ছিল, নাম শাহেরজাদী। এই শাহেরজাদীকে পড়াইত গ্রামের এক বি.এ. পাস ছেলে। ছেলেটার কাছে পড়তে গিয়া শাহেরজাদী প্রেমে পইড়া গেল। জমিদারও শাহেরজাদীর সাথে পোলাটার বিয়া দিয়া দিল। জমিদারের কোনো ছেলে নাই, তাই হেও এইরকম একটা ঘরজামাই চাইছিল। পোলাটা ছিল খুবই ভালা, কিন্তু একটু পাগলা গোছের। রাইত দিন খালি চিন্তা করত এদেশের লোক, বিশেষ কইরা মুসলমানদের কেমনে শিক্ষিত করা যায়, যাতে হেরা ইংরেজদের হাত থেইকা বাঁচতে পারে। জমিদারি প্রথা হে ঘেন্না করত। জমিদারগো মনে করত ইংরেজদের দালাল। ওর একটা জন্মের শখ ছিল এই গেরামে একটা স্কুল করব, তাই জমিদারের কাছে গিয়া টাকা চাইল। জমিদার সোজা মানা কইরা দিল, কারণ তখন ইংরেজ আমলের শেষদিক, জমিদারী শান-শওকত পড়তির দিকে। ছেলেটা এরপর খুব খেইপা গেল। এইর মইধ্যে হঠাৎ কইরা জমিদার মইরা গেল। জমিদারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইল তার মেয়ে শাহেরজাদী। কিন্তু শাহেরজাদী পোলাটারে খুব ভালোবাসত। সমস্ত সম্পত্তি লেইখা দিল পোলাটার নামে। সম্পত্তি হাতে পাইয়া পোলাটা করল কী, সব বেইচা দিল, বাকি রাখল শুধু জমিদারবাড়িটা। ওই টাকা দিয়াই সে ওই স্কুলটা বানাইল, যেটা এখন আপনাগো কলেজ। সে নিজে ওই স্কুলের হেডমাস্টার হইল, শাহেরজাদীর সাথে আর কোনো সম্পর্কই সে রাখল না। এদিকে শোকে দুঃখে শাহেরজাদী যে বিছানা নিল আর উঠতে পারল না। একদিন বিছানাতেই মইরা পইড়া থাকল। ওইদিকে এসব কোনো খবরই রাখত না

পোলাটা, হে আছিল স্কুল নিয়া খুবই ব্যস্ত। কিন্তু একদিন তারে মরা অবস্থায় পাওয়া যায় ওই জমিদারবাড়ির মইধ্যে। কেমনে মরল কেউ জানে না। কিন্তু ঘটনা এইখানেই শেষ হয় নাই। তারপর থেইকা এই স্কুল পরে যখন কলেজ হইলো, তখনও কোনো পুরুষ শিক্ষক থাকতে পারে না। কী কারণে যেন হেরা সবাই এই জমিদারবাড়ি আইয়া বেহুঁশ হইয়া পইড়া থাকে আর কলেজ ছাইড়া পলায়। এই হইলো গিয়া ঘটনা।' বৃদ্ধা থামল।

এতক্ষণ সম্মোহিতের মতো কথাগুলো শুনছিল আলম। অন্য সময় হলে ও হেসেই উড়িয়ে দিত কথাগুলো কোনো গ্রাম্য বৃদ্ধের কুসংস্কার বলে। কিন্তু আজ পারল না। সিদ্ধান্ত নিল, আজই মতিগঞ্জ ছেড়ে যাবে, তারপর বদলির ব্যবস্থা করবে। তবে কর্তৃপক্ষের কাছে কী কারণে বদলি চাইবে তা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে। আজকের এই ঘটনা যদি দরখাস্তে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে, তবে ওর মানসিক সুস্থতা নিয়েই যে চিন্তাভাবনা শুরু করবে কর্তৃপক্ষ!!

তোফাজ্জেল হোসেন

সুরাইয়া আমার স্ত্রী। বিয়ের মাস দেড়েক পর ওকে নিয়ে কক্সবাজারে এসেছি। হানিমুনে। এই মাস দেড়েকের বিবাহিত জীবনে ওকে নিয়ে আমি এক অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছি। বিয়ের ক'দিন পর থেকেই লক্ষ করে আসছি, ও মাঝে-মাঝেই হঠাৎ কেমন যেন ভাবলেশহীন ও আনমনা হয়ে পড়ে। এবং তখন এমন একটা অদ্ভুত বিষণ্ন ঘোরের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকে যে হাজার প্রশ্ন করেও ওর মুখ থেকে কোনো কথা বের করা যায় না। ওকে কথা বলাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ অবধি যখন হাল ছেড়ে দিতে হয়, তখন হঠাৎ করেই ও আবার স্বাভাবিকতার মাঝে ফিরে আসে। ব্যাপারটা নিয়ে দিনে-দিনে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি। এ নিয়ে ঢাকার একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও ধরনা দিয়েছি বারকয়েক। ওকে নিয়ে নয়, আমি একা। কিন্তু, আমার মুখ থেকে বারবার সবকথা শোনার পরও তিনি ব্যাপারটিকে তেমন একটা আমল দেননি। বলেছেন, সেটেল ম্যারেজের ক্ষেত্রে জীবনের নতুন একটা অধ্যায়ে প্রবেশ করে কমবেশি সব মেয়েকেই সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষ এবং সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিবেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে অনেক সময়ই মানসিকভাবে নানা ধরনের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে কোনো কোনো মেয়ে, বিশেষ করে একটু ইন্ট্রোভার্ট প্রকৃতির মেয়েদের অবস্থা এরকম হতে পারে। কিন্তু, এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। সময়ের ধাপেধাপে নিজের সংসারজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হতে একসময় সবকিছুই আপনা থেকে ঠিক হয়ে যায়। তবে, এই আপাত উদ্ভুত পরিস্থিতিকে ওভারকাম করার জন্যে সহজ একটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে, হাওয়া বদল। বলা বাহুল্য, তাঁর সাজেশান অনুযায়ী হাওয়া বদল করতে গিয়েই আমাদের এই হানিমুনে আসা।

আমরা যখন রেস্টহাউসে উঠি, তখন পরিপূর্ণ বিকেল। সূর্যের সোনালি আঁচল ছড়িয়ে পড়েছে অনেকদূর পর্যন্ত। জায়গাটি, যেমনটি শুনে এসেছি, সত্যি তাই। মন কেড়ে নেয়ার মতো। আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে সবুজ গাছগাছালি ঢাকা পাহাড়ের ওপর বড়সড় বাংলো-প্রাঙ্গণ। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে প্রাঙ্গণের কিছুটা ভেতরেই দোতলা বাংলো। বাংলোটি ছাড়াও প্রাঙ্গণের দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষে রয়েছে দুটি তিনতলা বিল্ডিং। সেখানে একটি টেনিস-কোর্টও চোখে পড়ে। বাংলোর চারপাশ ঘিরে কেয়ারি

করা ফুলের বাগান। ঝাউগাছ। ইউক্যালিপটাসের সারি। সবকিছুতে সোনা-রং রোদ মাখামাখি হয়ে পরিবেশনটা হয়ে উঠেছে জলরঙা ছবির মতো।

রেস্টহাউসের অ্যাকোমোডেশানও মন্দ নয়। রুমগুলো মোটামুটি প্রশস্ত। প্রত্যেকটি রুমের সঙ্গেই অ্যাটাচড্ বাথরুম। ভেতরে আধুনিক রীতির আসবাব, সবকিছুই খুব গোছালো এবং পরিপাটি। অতএব, মন আমাদের ভরে উঠেছে সহজেই।

তবে, আরও বেশি খুশি হতাম, যদি পাশের রুমটি পাওয়া যেত। রেস্টহাউসের দোতলার রুমগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ওই রুমটির সঙ্গেই একটি রেলিং-ঘেরা ঝুলবারান্দা রয়েছে। সাগরের দিকে মুখ ফেরানো। সকাল-বিকেল চায়ের আসর, মায় কোনোকিছু লিখতে মন চাইলে চমৎকার কাজে লাগতে পারে বারান্দাটি। কিন্তু দুর্ভাগ্য! রেস্টহাউসের ম্যানেজার শিকদার সাহেব জানিয়েছেন, ওই ঝুলবারান্দাযুক্ত রুমটি সবসময়ই ব্যবহৃত হয় তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে। সে-কারণে বোর্ডারদের জন্যে ওই রুমটি কখনও দেয়া হয় না। তবে, রুমটি না-পেলেও আমি মনে-মনে ঠিক করেছি, সুরাইয়াকে নিয়ে এই ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে যাব।

রুমে ওঠার পর, বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে প্রথমে খানিকটা বিশ্রাম, তারপর বিকেলের চা-পর্ব শেষ হয়েছে। বেয়ারা এসে ট্রে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। বন্ধ রুমের ভেতরে আমরা স্বামী-স্ত্রী এতক্ষণ পরস্পরকে আদর-সোহাগ করছিলাম। আদর-সোহাগে পরিপূর্ণ ভরে উঠে সুরাইয়া এইমাত্র ছাড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে। কথা বলতে বলতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে। আমি একটি সিগারেট ধরিয়ে, সুটকেস থেকে কয়েকটি বই বের করে টেবিলের ওপর সাজাচ্ছি, তখনই সুরাইয়া 'এই যে সাহিত্যিক সাহেব! এদিকে এসো।' বলে ডাকল জানালার পাশ থেকে। আমি বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে এগিয় গেলে ও বলল, 'দেখো, এই শেষবেলায় বাইরের পরিবেশটা কী অপরূপ সেজে উঠেছে!'

আমি জানালা দিয়ে তাকালাম। বাইরে বিকেলটা এখন কোনোরকমে লটকে আছে আকাশের সঙ্গে। সূর্যটা জমাট মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে লুকোচুরি খেলছে। চারপাশে ছোট-ছোট পাহাড়, বনজ গাছগাছালিতে ঢাকা। অদূরে প্রাচীন বৌদ্ধকৃষ্টির স্বাক্ষর, একটি পুরানো বৌদ্ধমন্দির উঁকি মেরে আছে গাছগাছালির আড়াল থেকে। সামনের পাহাড়ি এলাকাটি ছাড়িয়ে উপত্যকার সমতল ভূমিতে উপবন। খাড়া-খাড়া গাছপালাগুলো সায়াহ্নের কালচে-নীল চাদর মুড়ি দিয়ে একে অপরকে জড়িয়ে রেখেছে নিবিড় মমতায়। ওইসব গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দূরে সাগরের জলরেখা চোখে পড়ে। একটু পরেই সূর্যটা টুপ করে ডুব দেবে সাগরের কালচে-নীল জলে। মেঘের ভারী ঘোমটার ফাঁকফোকর দিয়ে তার লাজরাঙা রক্তিমাভা এখন

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে নিসর্গের বিশাল পটভূমিকায়।

সুরাইয়া আবার বলল, 'কক্সবাজারের এ জায়গাটা ভারি সুন্দর, তাই না?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। দেখেছ তো, এই প্রাকৃতিক শোভার জন্যেই এই রেস্টহাউসটাকে আমি সিলেক্ট করেছিলাম।'

'তোমার সিলেকশান সত্যি পারফেক্ট!'

'কিন্তু, তুমি তো প্রথমে এই রেস্টহাউসের কথা শুনে বেঁকে বসেছিলে। গোঁ ধরেছিলে মোটেলে ওঠার জন্যে।'

'দূর, পেছনের কথা তুলো না তো। আমার একদম ভাল্লাগে না!'

'ঠিক আছে বাবা, আর তুলব না। এখন বলো, তুমি এখানে এসে সত্যি খুশি হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, জায়গাটা আমার কাছে খুউব ভালো লাগছে। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সত্যি অতুলনীয়!' সুরাইয়া একটু থামল। তারপর আমার একটা হাত নিজের শরীরের মধ্যে টেনে নিয়ে আবার বলল, 'আচ্ছা সাহিত্যিক, তুমি তো উপন্যাস লেখো, এই সুন্দর জায়গাটাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারো না?'

'হ্যাঁ, পারি।'

'তাহলে এই ক'দিনে লিখে ফেলো না একটা উপন্যাস।'

'এই ক'দিনে একটা উপন্যাসে? হ্যাঁ, একটা লেখার পরিকল্পনা আমার আছে। তবে, সেটা এ-জায়গার পটভূমিতে নয়। গ্রামের চরাঞ্চলের পটভূমিতে, নদীর ভাঙনকে নিয়ে। বিষয়টি আমার মাথায় আছে। মুড পেলেই ঝেড়ে ফেলব।'

'না, না। তুমি এখানকার পটভূমিতে লিখবে। চরাঞ্চল নিয়ে অন্য সময় লিখো। এখানে থাকতে থাকতেই এই সুন্দর জায়গাটাকে ধরে রাখতে হবে তোমার লেখায়।'

'কিন্তু, বললেই তো আর একটা জায়গাকে পটভূমি করে উপন্যাস লিখে ফেলা যায় না। সেজন্যে ভাবতে হয়, মাথার মধ্যে প্লট সাজাতে হয়। আর প্লট সাজাতে হলে লাগসই একটা বিষয়ও দরকার। সেই বিষয়টা আমি হুট করে কোথায় পাব?'

'কেন, লাগসই বিষয় তো তোমার পকেটের মধ্যেই রয়েছে।'

'মানে?'

'কেন, আমাদের এই হানিমুনটা? এই হানিমুনকে বিষয় করেই তো লিখতে পারো।'

'উঁ...হ্যাঁ। তা লেখা যায়।'

'তাহলে লিখে ফেলো না।'

'ভালো কথা বলেছ তো—আমাদের এই হানিমুনকে নিয়ে একটা উপন্যাসে—ফেনটাস্টিক আইডিয়া! আমি লিখব। দাঁড়াও, আজ থেকেই ভাবব আমি। দারুণ একটা প্লট দাঁড় করাব মাথার মধ্যে। তারপরেই বসে যাব। লিখে ফেলব গড়গড় করে।'

'ওহ্, যা দারুণ হবে না! উপন্যাসটার নাম দেবে তুমি "হানিমুন"। না, "হানিমুন" না, নামটা দেবে বাংলায়— "মধুচন্দ্রিমা"। বাংলা নামটাই সুন্দর হবে। আর, উপন্যাসটা কিন্তু উৎসর্গ করতে হবে আমাকে!'

'সে তো অবশ্যই। আমাদের বিয়ের পরে আমার প্রথম উপন্যাস, তা-ও আবার আমাদের হানিমুনকে নিয়ে—সেটা তো তোমাকেই উৎসর্গ করব!' বলেই আমি আলতো করে একটা চুমু এঁকে দিলাম সুরাইয়ার গালে।

ও সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতের এক ঝটকায় আমার মুখটাকে ধাক্কা মেরে কপট রাগে বলে উঠল, 'এই, জানালার সামনে এসব কী অসভ্যতা হচ্ছে।'

আমি ওর ধাক্কা খেয়ে কিছুটা দূরে সরে এসে হাসতে লাগলাম। তখন ও আমার হাত ধরে আমাকে আবারও কাছে টেনে নিল, এবং নিজেও ভরে উঠল নিঃশব্দ হাসিতে।

জানালার কাছ থেকে সরতে ইচ্ছে করছে না। দুজনে দাঁড়িয়ে আছি পাশাপাশি। সায়াহ্নের মুহূর্তগুলো ঘন হচ্ছে ক্রমে। বাইরের বিশাল প্রকৃতি কালচে-নীল আবরণে ঢেকে গিয়ে রচিত হয়েছে এক স্বপ্নিল পরিবেশ। সুরাইয়ার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ওর মনটা এখন উড়ুউড়ু। মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখছে চারদিক। আর আমি, একধরনের ঘোরলাগা আবেশের মধ্যে নিস্তব্ধ, কখনও বা গুঞ্জরিত হয়ে উঠছি গুনগুন সুরে।

'দেখো দেখো, কত্তো পাখি! কী বিরাট ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে!' সুরাইয়া হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক যেন একটা সুতোকাটা মালা ভেসে যাচ্ছে শূন্যের মধ্যে দিয়ে, তাই না?'

আমি তাকালাম। 'হ্যাঁ। ওগুলো সামুদ্রিক পাখি। ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে হয়তো কোনো অচেনা দ্বীপের ঠিকানায়।'

দুজনে তাকিয়ে থাকলাম। প্রসারিত দৃষ্টি গিয়ে ঠেকল দিগন্তজোড়া মেঘপুঞ্জের মধ্যে। বেশ কালো হয়ে জমেছে মেঘ। আঁধার নামছে দ্রুত। পাখিরা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে—বহু দূরে।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। সুরাইয়া আর কোনো কথা বলছে না, সুতরাং আমিও বলছি না। একসময় সুরাইয়ার মৌনতা টের পেয়ে আমি ওর দিকে চোখ ফেরালাম। আর অবাক হলাম সঙ্গে সঙ্গে। সুরাইয়াকে কেমন আনমনা দেখাচ্ছে হঠাৎ। মনে হচ্ছে, গভীরভাবে ভাবছে কিছু। চোখের কোলজুড়ে করুণ আভা ফুটে উঠেছে ওর। হালকা বাতাসে কপালের কয়েকটি চুল কাঁপছে তিরতির।

'এই, কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

সুরাইয়া চমকে উঠল। নিজেকে সামলে নিতে গিয়েও শঙ্কা জেগে রইল ওর চোখে।

'দেখেছ, কেমন মেঘ করেছে!' বলল ও।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?'

'মনে হচ্ছে আবহাওয়াটা সুবিধের নয়।'

'সাগরপাড়ে এটা কোনো ব্যাপারই নয়। এখানকার আবহাওয়া হরহামেশাই এরকম।'

'কিন্তু, আমার যে ভীষণ ভয় করছে!'

'কেন, কিসের ভয় সুরাইয়া?'

'ঝড়! ভয়ংকর বিভীষিকা, হাসান!'

'আরে দূর পাগলি, কীসব আলতুফালতু চিন্তা করছ তুমি। দেখছ না আমরা এখানে কত নিরাপদ একটা জায়গায় আছি। ঝড় উঠলেও এখানে আমাদের কোনো ক্ষতিই হবে না।'

'না হাসান, তুমি জানো না ঝড় কত ভয়ংকর! আমার ভয়...ভীষণ ভয় হাসান, ভীষণ ভয়...!' সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর মুহূর্তে কেমন ভিজে গেল।

আমার মনে পড়ল, সত্তুর সালের সেই হারিক্যানের কথা। জলোচ্ছ্বাসের সেই ভয়াবহ তাণ্ডব! যার হিংস্র থাবায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল উপকূলীয় অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ প্রাণী। লোকালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষ, পশু, পাখি কেউই রক্ষা পায়নি।

সেই ঝড়ের তাণ্ডবলীলার কথা মনে পড়তেই একটা প্রশ্নও উঁকি মেরে উঠল মনের ভেতর থেকে সুরাইয়ার মনে কি তবে ওরকম কোনো ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ের বিশেষ কোনো স্মৃতি সুপ্ত হয়ে ছিল, যা আজ এই সাগরপাড়ের আবহাওয়া দর্শনে জেগে উঠেছে বীভৎস রূপ নিয়ে? কিন্তু প্রশ্নটি আমি সুরাইয়ার কাছে প্রকাশ করলাম না। বরং, ওর মনের অবস্থাকে স্বাভাবিক করার জন্যে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'শোনো, ঝড় যখন উঠবে, তখন তোমাকে আমি এইভাবে আমার বুকের মধ্যে আগলে রাখব। আমার বুকের বাঁধন থেকে কোনো ঝড়ই তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

সুরাইয়া আর কোনো কথা বলল না। বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা নিশ্চিন্ত আবেগানুভূতির শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে সঁপে দিল আমার আলিঙ্গনের মধ্যে। আমি ওকে ওভাবে নিয়ে এলাম বিছানার মধ্যে।

রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে উঠতে উঠতে নয়টা বেজে গেছে। বাইরে চঞ্চল বাতাস নেচে বেড়াচ্ছিল। তার ঝাপটা এসে লাগছে আটকানো জানালার শার্সির ওপর। রেকর্ডপ্লেয়ারে কোমল সুরে রবীন্দ্রসংগীতের ফোয়ারা উঠছে 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে...।' সুরের নিবিড় মূর্ছনা বাতাসের আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে রাতের গাঢ়তাকে মোহময় করে তুলেছে। স্নিগ্ধ আবেশ ঘরের ভেতরে। আমার ডানহাঁটুর ওপর মাথার রেখে গভীর আবেশে চোখ বুজে আছে সুরাইয়া। আমি ওর ঘন চুলের

গভীরে আঙুলের লুকোচুরি খেলছি পরমানন্দে।

'এই,' হঠাৎ মাথা তুলে সুরাইয়া বলে উঠল, 'কালকে আমরা মোটেলে উঠব।'

'কেন,' আমি বললাম, 'এখানটায় ভালো লাগে না?'

'দূর, এখানে কেমন যেন একটা দম! আটকানো পরিবেশ...?

'দম-আটকানো পরিবেশ!' আমি খানিকটা অবাক হলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই বিস্মিতভাব কাটিয়ে বললাম, 'ওহ্ বুঝেছি, এই বাংলোটা বেশ পুরনো বলে তুমি এখানে খুব ইনসিকিওরড ফিল করছ, তাই না?'

'না, তা না ঠিক, তবে...' সুরাইয়ার কথা শেষ হল না।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে বাবা, "তবে"-র আর দরকার নেই। আমরা মোটেলেই চলে যাব কালকে।'

'গুড!' সুরাইয়া আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'দেখবে, মোটেলে গেলে তোমার লেখারও অনেক সুবিধে হবে। ওখানে আরও কত কাপল, আরও কত মানুষজন পাওয়া যাবে। তোমার কাহিনীর জন্যে কিছু-কিছু চরিত্রও পেয়ে যাবে তুমি।'

'বাহ্ বাহ্, দারুণ বুদ্ধি তো! তোমার মাথায় দেখছি ফ্যান্টাস্টিক সব আইডিয়া। এই তো চাই। নইলে কিসের তুমি একজন লেখকের স্ত্রী, অ্যাঁ?'

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। চমকে ওঠা স্বাভাবিক। সুরাইয়া আমাকে জাপটে ধরে তাকাল ভয়ার্ত দৃষ্টিতে।

'এই!' বলল ও। 'কে চিৎকার করছে ওভাবে?'

আমি বিমূঢ়ের মতো কান পেতে আছি। গোঙানির শব্দ একটু স্পষ্ট হয়ে এলে বোঝা গেল, পাশের রুমে কেউ কাতরাচ্ছে। গলার স্বর পুরুষের। উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'দাঁড়াও,' আমি বললাম। 'দেখে আসছি ব্যাপারটা।'

'এই, কী করছ!' সুরাইয়া আমাকে টেনে ধরল, 'এত রাতে না-জেনেশুনে কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'মনে হচ্ছে পাশের রুমে একটা কিছু ঘটেছে।' ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। 'এক্ষুনি আসছি আমি।'

দরজা খুলতেই অপ্রশস্ত প্যাসেজ। একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব আলোকিত করে রেখেছে। বাইরে থেকে দরজা টেনে দিলাম। পাশের রুমের দরজা আগে থেকেই খোলা। ভেতরে প্রবেশ করেই দেখি, শিকদার সাহেব বিছানার ওপর বুক চাপড়ে কাতরাচ্ছেন। হা-হুতাশ করছেন। কিন্তু রুমে তিনি একা, আর কেউ নেই। তাঁর এই রুমে আসবাবপত্র বলতে একটি সিঙ্গেল খাট, পাশে একটি ড্রয়ারযুক্ত বক্স-সাইড টেবিল, তারপাশে একটি হাতলযুক্ত চেয়ার। বক্স-টেবিলের খোপের মধ্যে কয়েকটি

ভাঁজ-করা দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন। টেবিলের ওপরে একটি পানির জগ, একটি কাচের গ্লাস ও কয়েকটি ঔষুধের ফাইল। আর রুমের এককোণে কর্নার শেলফের ওপরে দাঁড় করানো একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্প্যানিশ গিটার। ব্যস্, আর কিছু নেই। আমি পলক চাউনিতে সবকিছু দেখে নিয়ে তাকালাম শিকদার সাহেবের দিকে। কিন্তু তাঁর কোনো মনোযোগ নেই আমার প্রতি। যেন বা টেরই পাননি আমার উপস্থিতি। হয়তোবা যন্ত্রণার কারণে বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন পারিপার্শ্বিকতার প্রতি। আমিও বুঝতে পারছি না, কী আমার করণীয়।

কয়েকটি বিমূঢ় মুহূর্ত কেটে গেলে, দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার দিকে চোখ ফেরাতেই রুমের মধ্যে প্রবেশ করলেন একজন ডাক্তার। সঙ্গে শিকদার সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি, আলাউদ্দিন। সে আমাকে দেখে তার উৎকণ্ঠিত চেহারার মধ্যে এমন একটি ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল, যার অর্থ, আমি এই সংকটময় মুহূর্তে খোঁজখবর নিতে আসায় সে খুব খুশি।

ডাক্তার এসেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে লেগে গেছেন রোগীকে। আমি আলাউদ্দিনকে কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, শিকদার সাহেব হার্ট ট্রাবলসে ভুগছেন অনেকদিন ধরে। মাঝেমধ্যে তাঁর বুকে মারাত্মক পেইন শুরু হয়ে যায়, সেইসঙ্গে শ্বাসকষ্ট। তখন বর্ণনাতীত যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকেন। ডাক্তার এই কম্পাউন্ডেরই সার্ভিস-হোল্ডার। রেস্টহাউসে আগত অতিথিদের মধ্যে যাঁরা এক সপ্তাহ বা পক্ষকাল ধরে এখানে থাকেন, তাঁদের চিকিৎসার সুবিধে প্লাস এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি এখানে নিয়োগপ্রাপ্ত । কম্পাউন্ডের ভেতরে দক্ষিণদিকে রেস্টহাউসের কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের জন্যে যে দুটো কোয়ার্টার বিল্ডিং রয়েছে, তার মধ্যে কর্মকর্তাদের বিল্ডিঙের একটি ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন সপরিবারে। দুটো বিল্ডিঙের মাঝখানেই তাঁর ক্লিনিক। কাজেই শিকদার সাহেবের অসুস্থতার সময় খুব সহজেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ডাক্তার বেশ মনোযোগ দিয়ে তদারক করছেন রোগীকে। আমার অন্য এক প্রশ্নের জবাবে আলাউদ্দিন জানাল, শিকদার সাহেব গিটার বাজান না। তাঁকে তারা কেউ কখনও গিটার বাজাতে দেখেনি, কিংবা তাঁর গিটার বাজানো শোনেওনি। কোনো কালে তাঁর গিটার বাজানোর শখ ছিল কি-না, তা-ও তাদের জানা নেই। তবে, তাঁর এই বিশ্রামকক্ষে যে-গিটারটি তিনি সাজিয়ে রেখেছেন, এটিকে তিনি খুব যত্ন করেন, মাঝেমধ্যেই নিজহাতে এটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দেন না। গিটারটির গোলাকার পেটের নিচে আটকানো একটি ছোট্ট পেতলের পাতের ওপরে খোদাই করা ইংরেজি হরফে লেখা আছে 'মাহতাব চৌধুরী'। আলাউদ্দিনের চোখে বারকয়েক পড়েছে এই নামটি। কে জানে মাহতাব চৌধুরী নামের কেউ হয়তো বা এই গীটারটির প্রকৃত মালিক। কিন্তু শিকদার সাহেবের সে

কে, বা, তিনি কোত্থেকে কীভাবে এই গিটারটি পেয়েছেন, সে সম্পর্কে কারও কোনো ধারণা নেই। কারণ, এ ব্যাপারে সে-ও যেমন কোনোদিন কৌতূহল প্রকাশ করেনি, তেমনি শিকদার সাহেবও তাকে কোনোদিন কিছু বলেননি। তো, শিকদার সাহেবের শখ বা অভ্যাসের মধ্যে একটি জিনিসই এযাবৎকাল তাদের চোখে পড়েছে, সেটি হচ্ছে পত্রপত্রিকা পড়া। তিনি যখনই অবসর পান, সেই সময়টা কাটান পত্রপত্রিকা পড়ে।

ডাক্তারের কুশলী তদারকিতে রোগীর অবস্থা বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এসেছে। কাৎরানি আর গোঙানির তীব্রতা কমে এসেছে অনেকখানি। শুধু থেকে থেকে হাহুতাশ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমনি সময় হঠাৎ দপ করে দাপাদাপি থেমে গেল বাতাসের। নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই শুরু হল শোঁ-শোঁ আওয়াজ। আলাউদ্দিন জানালার শার্সি আটকাবার আগেই বাতাসের ঝাপটা এসে হুমড়ি খেল রুমের ভেতরে। ঝড় শুরু হয়ে গেল বিকট শব্দে। তখনই ব্যাপার ঘটল অন্যরকম। শিকদার সাহেব শোয়া অবস্থায় দুলে উঠলেন প্রচণ্ড। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত বইতে শুরু করল তাঁর।

'ওহ্ ডাক্তার, ঝড়!' কাৎরাতে কাৎরাতে বলতে লাগলেন তিনি, 'হাউ টেরিফিক সাউন্ড! আই অ্যাম ডায়িং, ডক্টর!...আমি মরে যাব...!'

'ম্যানেজার সাহেব, প্লিজ! প্লিজ! ডোন্ট বি নার্ভাস!' ডাক্তার দ্রুত ধরে ফেললেন তাঁকে। 'আপনার কিছু হয়নি। আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আমি এক্ষুনি ওষুধ দিচ্ছি—দেন ভেরি সুন ইউ উইল বি অল রাইট।'

শিকদার সাহেব শুয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিন তৎক্ষণে এসে বুক ম্যাসেজ করতে লেগে গেছে। ডাক্তার দ্রুতহাতে গ্লাসে পানি ঢেলে একটি ওষুধ খাইয়ে দিলেন শিকদার সাহেবকে। ধীরে ধীরে অবস্থা আবার আয়ত্তে চলে এল। শিকদার সাহেব মৃদু শব্দে গোঙাতে লাগলেন। হাঁপাতে লাগলেন। হাহুতাশ করতে লাগলেন। ডাক্তার আলাউদ্দিনকে বললেন, 'আর আশঙ্কার তেমন কারণ নেই। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বেন উনি।'

বাইরে ক্ষিপ্র ঝড়। সুরাইয়ার কথা খেয়াল হল আমার। আমি আলাউদ্দিন এবং ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম শিকদার সাহেবের রুম থেকে। প্যাসেজে এসে ভাবলাম, সুরাইয়া নির্ঘাত গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে রয়েছে আমার জন্যে।

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেই অবাক বনে গেলাম আমি রুমের মধ্যে কেমন এলোমেলো অবস্থা। রেকর্ডপ্লেয়ারে সুর নেই। বাইরে ঝড়োবাতাস সত্ত্বেও কেমন একটা নিস্তব্ধতা রুমের মধ্যে। সুরাইয়াকে দেখা যাচ্ছে, জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে। আমার উপস্থিতি যেন টেরই পায়নি। পর্দা সরিয়ে আটকানো জানালার কাচের মধ্যে

দিয়ে ঝড় দেখছে বাইরে। আমি পা টিপেটিপে ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। বাইরে চোখ পড়তেই দেখলাম, ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবী। চাঁদ তারার চিহ্নমাত্র নেই। দূরে সাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সুরাইয়ার কাঁধের ওপর আস্তে করে টোকা মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মাটিতে আছাড় খাওয়ার অবস্থা হল আমার। সুরাইয়া ঘাড় বাঁকাতেই দেখলাম, ওর চোখে অশ্রু, গালের ওপর গড়িয়ে পড়েছে। আমি বিমূঢ় হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, 'কী ব্যাপার, সুরাইয়া? তোমার চোখে জল!'

সুরাইয়া নিরুত্তর। আমি কিছু না-বুঝেই সহজ করতে চেষ্টা করলাম ওকে। 'প্লিজ সুরাইয়া, আমি তো শুধু এই গেলাম আর এলাম। এর মধ্যে কী হল তোমার?'

সুরাইয়া চুপ। মনে হল, আমার কথাও যেন ওর কানে যায়নি। একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'পাশের রুমে তেমন কিছুই ঘটেনি, বুঝেছ? রেস্টহাউসের ম্যানেজার শিকদার সাহেব থাকেন ওই রুমে। তিনি অনেকদিন থেকে হার্ট ট্রাবলসে ভুগছেন। হঠাৎ করে বুকে পেইন শুরু হয়ে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল বলে কাৎরাচ্ছিলেন। চিকিৎসা হচ্ছে দেখে এলাম।'

সুরাইয়া চুপচাপ শুনল। কিন্তু আশ্বস্ত হলো কি-না বোঝা গেল না। কথাবার্তা থেমে রইল। পাশের রুমেও কোনো সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না। আমি সুরাইয়ার চোখে চোখ রাখলাম আবার। বললাম, 'তোমার কী হয়েছে, সুরাইয়া? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

সুরাইয়া চোখ ফিরিয়ে নিল। উত্তর দিল না।

আমি নীরবে চেয়ে রইলাম। সুরাইয়ার চোখে জল! কেমন বিষণ্ন আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। দেখে আমি মমতায় আপ্লুত হয়ে গেলাম। ওর দু-গাল দু-করতলে চেপে ধরে অন্তরের সোহাগ ঢেলে বললাম, 'তোমার কী হয়েছে, বলবে তো আমাকে! এমন বিষণ্ন লাগছে...!'

সুরাইয়া কোনো কথা বলল না এবারও। আমার করতলের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

আমি অসহায়ের মতো দুর্ভাবনার ঘোলাজলে হাবুডুবু খেতে থাকলাম।

আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল এই ভেবে যে, হানিমুনে এসে সুরাইয়া কোথায় সারাক্ষণ আনন্দে ভরে থাকবে, তা না করে এখানে এসেও ও অযথাই সেই অদ্ভুত ভাবলেশহীনতা আর বিষণ্নতায় বিভোর হচ্ছে। অথচ, এর যদি কোনো কারণও থেকে থাকে, তা-ও বলছে না মুখ ফুটে। ওর এই একগুঁয়ে মানসিকতা দেখে এই প্রথম নিজের মধ্যে একধরনের অভিমানবোধ টের পেলাম আমি। কিন্তু তারপরেও আমি চেষ্টা করলাম আবার। বারবার কাকুতি-মিনতির স্বরে বিভিন্নভাবে জানতে চাইলাম ওর বিষণ্নতার কারণ। অথচ ওর মুখ থেকে কোনো কথাই বেরোল না।

বাকশক্তিহীনের মতো ও গুটিয়ে যেতে থাকল নিজের মধ্যে। শেষে, সবদিক বেগতিক দেখে বললাম, সুরাইয়া, এসো শুয়ে পড়ি। রাত অনেক হয়েছে।'

কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হল না। ও সেই একই রকম—একদম একরোখা ভাব। ওর এই আচরণ ক্ষুণ্নই করল আমাকে। চোখেমুখে আমার ফুটে উঠল অভিমান। সে-কারণে, আর কোনো কথা না-বাড়িয়ে একাই এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ভাবলাম, থাকগে দাঁড়িয়ে। সময় হলে আপনিই এসে শোবে। কী দরকার অত গদগদ হয়ে তোষামোদ করার।

একটু পরে, শুয়ে শুয়ে কপালের ওপর রাখা ডান হাতের কনুইর ভাঁজের নিচ দিয়ে আমি লক্ষ করলাম সুরাইয়াকে। জানালা ঘেঁষে অন্ধকারের মুখোমুখি ওর মুখ। বাইরের বিদ্যুৎ-চমকানো আলো রুমের উজ্জ্বল আলোকে উপেক্ষা করে ঘন-ঘন ছিটকে পড়ছে ওর মুখের ওপর। সে আলোতে লক্ষণীর হয়ে উঠেছে ওর গালের ওপর মৌন ভঙ্গিতে ঝুলে পড়া অশ্রুর ধারা।

মন সত্যি খারাপ হয়ে গেল আমার। বিগত দেড়মাসে ঠিক এরকম অবস্থা আর কখনও দেখিনি। এই প্রথম আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে, সুরাইয়ার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে অনেক দুঃখ। অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির মেয়ে, তাই মুখ ফুটে বলেনি মনের কথা।

আমার ইচ্ছে হল, আবার ওকে আদর করে জিজ্ঞেস করি কী হয়েছে, কেন এমন করছে, কী বেদনা লুকিয়ে রেখেছে মনের মধ্যে।

কিন্তু ইচ্ছেটা ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেল। আমি শুয়েই থাকলাম। তবে শুয়ে শুয়ে ভাবনার অলিগলি ধরে অনেকভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম সুরাইয়ার মনোজগতের রহস্য ভেদ করতে।

হঠাৎ মাসখানেক আগের একটি বিকেলের আসর জেগে উঠল মনের মধ্যে। মালিবাগের নতুন ভাড়া-নেয়া বাড়ির লনে বসে মতিনের সঙ্গে চা খাওয়া আর খোশগল্প চলছিল। মতিন সুরাইয়ার খালাতো ভাই। সিনেমায় ছোটখাটো অভিনয় করে, ভিলেন টাইপের ক্যারেক্টারে। চালচলনে দারুণ স্মার্ট, কথা বলে বেশ রুচিশীল ঢঙে। সে সেদিন এটা-সেটা আলাপের একপর্যায়ে হঠাৎ করে সুরাইয়ার প্রসঙ্গে এক উদ্ভট প্রশ্ন করে বসল। '...আমার এই বোনটাকে নিয়ে সুখী হতে পারবেন তো?'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'না মানে, জানেনই তো মেয়েরা ভালোবাসে একজনকে, আর তাদের বিয়ে হয় আরেকজনের সঙ্গে।'

'ও কাউকে ভালোবাসত নাকি?'

'তা জানি না। তবে বছরখানেক আগে ওকে একবার সাইকোথেরাপি করাতে হয়েছিল মানসিক জটিলতার কারণে।'

'কী হয়েছিল ওর?'

'কী হয়েছিল, তা পরিষ্কার করে কিছুই বোঝা যায়নি। ও যে-অদ্ভুত কাণ্ডটা করত, তা হল, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ-হঠাৎ নিজের ঘরে দরজায় খিল এঁটে পড়ে থাকত একাকী, নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত সব। দেখে মনে হত, সমগ্র পৃথিবীটা বুঝি ওর শত্রু হয়ে উঠেছে। অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা খুলতে চাইত না। শেষে, অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে দরজা খোলাতে হত।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এরকম করত।'

'কিন্তু কেন, কেন এরকম করত ও? কী কারণ ছিল ওর এই আচরণের পেছনে?' প্রশ্নটি উচ্চারণ করতে গিয়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম।

তখনই উচ্চস্বরে হেসে উঠল মতিন। 'আপনাকে খুব ভড়কে দিলাম, তাই না? আসলে সত্য কিছুই না। মাঝেমধ্যে পিলে চমকানো কথা বলে কাউকে ভড়কে দিতে আমার খুব মজা লাগে, বুঝলেন?'

মতিনের কথাকে উদ্ভট রসিকতা ভেবে আমিও হেসেছিলাম সেদিন। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, মতিন আসলে ধুরন্ধর। সত্যিকথা বলতে গিয়েও চেপে গেছে। ব্যাপারটা আমার তলিয়ে দেখা উচিত ছিল।

সমস্ত রহস্যের মূল উদ্‌ঘাটনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা গভীর এক তন্ময়তার মধ্যে আমাকে কেমন উতলা করে তুলল। তখনই আমার মগ্ন চৈতন্য আন্দোলিত হল দু'টি কণ্ঠস্বরের আবেশ জাগানো নিঃশব্দ অনুরণনে। একটি সুরাইয়ার 'না হাসান, তুমি জানো না, ঝড় কত ভয়ংকর! আমার ভয়...ভীষণ ভয় হাসান, ভীষণ ভয়...!' অন্যটি শিকদার সাহেবের 'ওহ্ ডাক্তার, ঝড়! হাউ টেরিফিক সাউন্ড! আই অ্যাম ডায়িং ডক্টর...আমি মরে যাব...!'

দুটি কণ্ঠস্বরের নিঃশব্দ অনুরণন যেন এক আবহ-সংগীতে রূপান্তরিত হল সহসা। এবং তা দ্রুতলয়ে আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে শুরু করল রোমাঞ্চকর এক সংঘাতময় ঘটনার ধারা—যার সূচনা হল এ-ভাবে :

সুরাইয়া আতঙ্কিত। বলল, 'চলো হাসান, আমরা মোটেলে চলে যাই!'

আমি বললাম, সে নাহয় যাওয়া যাবে, কিন্তু এখানে কিসের অসুবিধা?'

'এই রেস্টহাউস একটা হেলিস ট্র্যাপ, ভয়ংকর সব ক্রিমিনালদের আখড়া, এখানকার সবাই খুনি, হাসান।'

'হেলিস ট্র্যাপ,...ক্রিমিনালদের আখড়া,...খুনি...!' অস্ফুট উচ্চারণে ভুরু কুঁচকে গেল আমার। শিকদার সাহেবের চেহারাটা মনে করতে থাকলাম প্রৌঢ় বয়সের লোকটা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ-দাড়ি। মোটা ভুরু নিচে উজ্জ্বল দুটো চোখ! কিন্তু তিনি তো হার্টের রোগী!

এই প্রশ্নের আড়ালেই আছে এই নাটকীয় কাহিনীর মূল নায়ক। হ্যাঁ, ওই তো শোনা যাচ্ছে : 'আহ্ আর না, আর গেয়ো না ওই গান,...ওহ্ দোহাই আল্লাহর, গান থামাও!...আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে...!' শিকদার সাহেবের বিলাপ। তিনি এখন আসলেও কাৎরাচ্ছেন কি-না, সে-ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই, আমি তাঁর বিলাপের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করছি। তখনই সামনে এসে দাঁড়াল আলাউদ্দিন। বলল, 'স্যার, আপনাদেরকে কাল সকালের মধ্যেই চলে যেতে হবে এখান থেকে।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আপনারা না গেলে শিকদার সাহেবকে আর বাঁচানো যাবে না।'

'অর্থাৎ?'

'না, মানে, আপনার স্ত্রীকে দেখেই তাঁর অবস্থা এমন সিরিয়াস হয়ে গেছে। তার ওপর আবার ঝড় শুরু হওয়াতে এখন একেবারে মরণাপন্ন অবস্থা দাঁড়িয়েছে।'

'আমার স্ত্রীকে দেখে তাঁর হৃদরোগ চাগিয়ে উঠেছে, এই বলতে চাও তোমরা?'

'হৃদরোগ?—হ্যাঁ, আপনাকে বোঝানো হয়েছে তাই। তবে আসল রোগটা অন্যরকম।'

'তার মানে?'

'কেন, ওই যে, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, শিকদার সাহেব হা-হুতাশ করে কী বলছেন—'

আমি শুনলাম, শিকদার সাহেব বলছেন 'মাহতাব, দোহাই আল্লাহর, তোমার সুর বন্ধ করো। আমি সহ্য করতে পারছি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি মরে যাচ্ছি,...দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার...!'

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'মাহতাব!' এই তো মূল নায়কের নাম। কিন্তু আমি তার সম্পূর্ণ পরিচয় চাই। 'কে মাহতাব? কে গান গাইছে? কোথাও তো কোনো সুর শুনতে পাচ্ছি না?'

আলাউদ্দিন বলল, 'মাহতাব নামে একজন ছিল। এখন নেই। তবে শিকদার সাহেবের কাছে সে অশরীরী হয়ে প্রায়ই আসে। গান গেয়ে যায়। শিকদার সাহেব ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না সে-গান।'

'এসব কথার অর্থ?'

'শিকদার সাহেবের রোগের কথা বললাম।'

'কিন্তু তাঁর রোগের সঙ্গে আমার স্ত্রীর কী সম্পর্ক?'

'সে কথা বলা যাবে না আপনাকে। শিকদার সাহেবের নিষেধ আছে। তাছাড়া, ব্যাপারটা আমাদের পুরোপুরি জানাও নেই।'

আমি বুঝতে পারলাম, আলাউদ্দিন আসল সত্যকে ঢেকে ফেলতে চাইছে। তাই ক্ষিপ্তস্বরে বললাম, 'তুমি না বললেও সবকথা জানতেই হবে আমাকে। এক্ষুণি যাচ্ছি

আমি।'

শিকদার সাহেবের রুমে পৌঁছে দেখি তিনি হঠাৎ করে চুপ মেরে গেছেন। আমার রাগত চাউনি দেখেই আঁৎকে উঠেছেন। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না। ডাক্তারকে দেখা গেল, স্টেথোস্কোপ গলায় নিয়ে বসে আছেন। আমি অগ্নিজ্বলা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম তাঁর মুখের ওপর।

'আপনি এখন আসুন, ডাক্তার সাহেব।'

'কিন্তু হার্টের রোগীর এভাবে ফেলে রেখে...?'

'আহ্, রাখুন আপনার হার্টের রোগী! আমার ভালো করেই জানা আছে আসল রোগটা কী!'

ডাক্তার চলে গেলেন। আমি উত্তপ্ত চোখ ফেরালাম শিকদার সাহেবের দিকে। তাঁর দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আমি ভারিক্কি চালে বললাম, 'বলুন, আপনার মুখ থেকেই শুনতে এসেছি সব। আশা করি, কোনোরকম তালবাহানা না করে স্পষ্ট বলে ফেলবেন আসল ঘটনা।'

'আপনি এতরাতে...মানে, আমার কাছে...?'

'ইয়েস, আপনার কাছে, এত রাত করেই এসেছি। এখন সত্যি করে বলুন, আপনি কোনো রোগে ভুগছেন? "মাহতাব, গান গেয়ো না" বলে যে বিলাপ করে দিব্যি দিচ্ছিলেন, এর আসল তাৎপর্য কী? ঠিক-ঠিক করে বলুন সব কথা।'

'বিশ্বাস করুন, আমি হার্টের রোগী।' অসহায়ের মতো ভান করলেন শিকদার সাহেব। 'সত্যি বলতে কি, রোগযন্ত্রণার সময় বিলাপ করে কখন কী বলে ফেলি, নিজেই জানি না।'

'দেখুন, ধানাইপানাই রেখে খুলে বলুন সব ঘটনা, নইলে এই যে দেখেছেন...?' শিকদার সাহেব সন্ত্রস্ত হয়ে দেখেন, আমার হাতে উঠে এসেছে চকচকে ধারালো ছুরি। আমি গর্জে উঠলাম, 'তাড়াতাড়ি বলুন সব, নইলে এক্ষুনি খুন করে ফেলব।'

ছুরি উঁচিয়ে ধরতেই শিকদার সাহেব আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওহ্ ডোন্ট,...প্লিজ ডোন্ট কিল মি! দয়া করে মারবেন না আমাকে। বলছি, সবই বলব আমি। আপনি ছুরি চালাবেন না দয়া করে...!'

ঘটনাটা বছর তিনেক আগের। দুজন যুবক-যুবতী এসে উঠেছিল এই রেস্টহাউসে। যুবকের নাম ছিল মাহতাব চৌধুরী। আর যুবতীর নাম সুরাইয়া জামান, যে বর্তমানে আমার স্ত্রী। শিকদার সাহেবের এই রুমেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন তারা কাটিয়েছিল এখানে। তাদেরকে বেশ সুখী মনে হত। সামনের ওই খোলা বারান্দায় প্রতিদিন সকাল-বিকেল চায়ের আসর জমে উঠত। চুড়ির রিনিঝিনি আর হাসির শব্দে ছড়িয়ে পড়ত তাদের আনন্দময় কলতান। রাতের বেলায় দেখা

যেত, আরও মধুময় হয়ে উঠেছে দু'টি হৃদয়। ঘরের ভেতর গিটারের তার ঝংকৃত হতে শুরু করত সন্ধ্যা থেকে। মাহতাব মিহিন সুরে গান গাইত। আর সুরাইয়া সুরের মায়াজালে জড়িয়ে যেত আচ্ছন্নের মতো। অনেক রাত অবধি সুরের অপার্থিব আবেশে ভরে থাকত এই ঘরটি।

বড় মধুময় ছিল তাদের সেই গতিপ্রকৃতি। দুজনকে খুব ভালো লেগেছিল শিকদার সাহেবের। কিন্তু একটি ব্যাপার ছিল বড় আশ্চর্যের। শিকদার সাহেব তাদেরকে কখনও বাইরে বেরোতে দেখেননি। বলা চলে, রেস্টহাউসের ভেতরেই নিজেদের ভুবন তৈরি করে নিয়েছিল তারা। বাইরের বিশাল নৈসর্গিক শোভা, সমুদ্রের অপার নীল রহস্য, কারও হাতছানিই যেন সাড়া জাগাতে পারত না তাদের প্রাণে। এ ব্যাপারে সামান্য কৌতূহল জাগলেও সেদিকে কোনও মনোযোগ ছিল না শিকদার সাহেবের।

একদিনের ঘটনা। শিকদার সাহেব তাদের রুমের সামনে দিয়ে নিচতলায় অফিস-চেম্বারে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখলেন, তাদের রুমের দরজা বন্ধ। কী মনে করে দাঁড়ালেন একটু। ভেতরে জমাট নীরবতা। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। ভাবলেন, সৈকতে বেড়াতে গেল নাকি আজকে। কিন্তু হঠাৎ ফিসফিস শব্দ কানে এসে কৌতূহলকে খোঁচা দিল। বেশ ক্ষীণ কণ্ঠের কথাবার্তা, অস্পষ্ট, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত ঘাপটি মেরে থেকে আশ্চর্য হতে হল। কেমন কান্নাভেজা ধ্বনি, নারীকণ্ঠের। পুরুষটির কণ্ঠস্বরও বড় করুণ।— অনেক চেষ্টা করেও শিকদার সাহেব বুঝতে পারলেন না, তাদের প্রেমাবেশটি কেমন ছিল।

এই ঘটনার দুদিন পর এক অকল্পনীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়। তখন সকালবেলা। সূর্য তার নরম রোদের সোনালি আঁচল ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে। শিকদার সাহেব নাস্তার টেবিলে বসে চায়ে চুমুক আর সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। হঠাৎ নজরে পড়ল 'পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার!'

বিজ্ঞপ্তিটির সারমর্ম ছিল এরকম মাহতাব চৌধুরী নামে জনৈক যুবক ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আশিকুজ্জামানের একমাত্র কন্যা সুরাইয়া জামানকে অপহরণ করেছে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সুরাইয়া জামান ও তার অপহরণকারীর সন্ধান দিয়ে অপহৃতাকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে তার অভিভাবকপক্ষকে কার্যকরিভাবে সহায়তা করতে পারেন, তা হলে সেই ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিটির সঙ্গে দুজনের ছবিসহ অভিভাবকপক্ষের ঠিকানা, ফোন নাম্বার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যোগাযোগ-সূত্র সবকিছুই ছেপে দেয়া হয়েছিল।

আগাগোড়া পড়ে শিকদার সাহেবের মাথায় কোনো দুর্বুদ্ধি খেলে গেল কি-না, তিনি বুঝতে পারলেন না, ছুটে বেরোলেন চেম্বার ছেড়ে।

সাতটা বেজে গেছে। দু'পা এগোতেই দেখেন, মাহতাব এগিয়ে আসছে সিঁড়ির

ওদিক থেকে। অন্যান্য দিন মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাতের সময় শিকদার সাহেবই প্রথমে হৃদ্যতা দেখাতেন, কিন্তু এখন ব্যস্ততা দেখিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। অথচ মাহতাব তা হতে দিল না। জোর করে মুখোমুখি হল। একটা চাপা অস্থিরতা সহজেই ধরা পড়ে তার কণ্ঠস্বরে। শিকদার সাহেবের হাত চেপে ধরে বলল, 'শুনুন, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।...মানে, কথাটা হচ্ছে গিয়ে,...আমরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছি!'

'হঠাৎ, এই সাত-সকালে!' শিকদার সাহেব সরল উপায়ে অবাক হওয়ার চেষ্টা করলেন। 'এখন তো কোনো ট্র্যান্সপোর্ট পাবেন না!'

'না, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। খুব একটা জরুরি প্রয়োজনে এক্ষুনি আমাদেরকে চলে যেতে হবে। তাই, মানে...।'

'লেনদেনটা মিটিয়ে নিতে চান, এই তো?'

'জি।'

শিকদার সাহেব মুহূর্তে চেহারা-চক্কর পাল্টে, সবকিছু জেনেও যেন সহানুভূতিশীল, এমন একটা ভাব ধরে বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার পেছনে খুব একটা বিপদ তাড়া করে আসছে, তাই খুব...।'

'দেখুন, শুধু বিপদ নয়,' মাহতাব থামিয়ে দিল শিকদার সাহেবকে। 'রীতিমতো ভয়ংকর রকমের বিপদ ধাওয়া করে আসছে আমাদের দিকে। আপনি যদি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি সরে পড়তে সাহায্য করেন...।'

মাহতাব বিগত ক'দিনের হৃদ্যতার ভিত্তিতে করুণা চাইল। এই সুযোগে শিকদার সাহেবও পরিপূর্ণ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

'খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছেন আপনি। কিন্তু বিপদ এলেই চোখে সরষেফুল দেখা কোনো কাজের কাজ নয়। বরং ঠাণ্ডা মাথায় বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু, এ অবস্থায় কী করব আমরা?'

'আমি বলি, আপনারা আপাতত এখানেই থেকে যান। কোনো অসুবিধাই হবে না। আমি সবরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। পরে আপনারা ধীরেসুস্থে একটা উপায় বের করে নিতে পারবেন।'

শিকদার সাহেবের প্রস্তাব মাহতাবের চোখে-মুখে চিন্তার রেখা আঁকল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে একটু ধরাগলায় বলল, 'দেখুন শিকদার সাহেব, সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, আমরা এখনও বিয়ে করিনি। আইন আমাদের পক্ষে নেই। সুতরাং, এ-অবস্থায় আপনিই বা কেমন করে আশ্রয় দেবেন?'

মাহতাবের কথা শুনে আকস্মিক আনন্দের তাড়নায় শিকদার সাহেবের চোখ কপালে উঠে আসতে চাইল (যেহেতু তিনি তাদেরকে বিবাহিত মনে করেছিলেন), মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক হওয়ার ভান করলেন। 'আপনারা বিয়ে করেননি এখনও?'

'না, এখনও করিনি। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়েই এ

অবস্থা হয়েছে।'

চমৎকার সুযোগ! শিকদার সাহেব হঠাৎ নিবিষ্ট চিন্তাক্রান্তের মতো চুপ হয়ে গেলেন। মাহতাবের ছলছল চোখদুটো ব্যাকুল আশা নিয়ে তাঁর গম্ভীর নিস্তব্ধতা দেখতে থাকল।

বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড সময় নিলেন শিকদার সাহেব। তারপর অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মাহতাবের ব্যাকুল চোখে নিজের আশ্বাসভরা দৃষ্টি যোগ করলেন।

'ঠিক আছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা এখানেই থেকে যান। আমি খুব তাড়াতাড়ি আজকের মধ্যেই আপনাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব।'

শিকদার সাহেবের আশ্বাস পেয়ে মাহতাব কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকণ্ঠ।

'পারবেন! পারবেন আপনি আজকের মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে?'

'হ্যাঁ। কোনো অসুবিধাই হবে না।'

'কিন্তু কেউ যদি থানায় খবর দেয়?'

সেরকম কোনো আশঙ্কাই নেই। কারণ, আপনারা খুব একটা বাইরে বেরোননি। বাইরের কেউই চেনে না আপনাদেরকে। আর, এই রেস্টহাউসের যারা কর্মচারী, তারা সবাই আমার কব্জার মধ্যে, আমার কথার বাইরে কারুরই একচুল নড়ার ক্ষমতা নেই এখানে।'

'তাহলে তো খুব ভালো কথা! আপনার উপকার সত্যি...!' মাহতাব কৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে ধরল শিকদার সাহেবকে।

'যান, এখন রুমের ভেতরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন।' শিকদার সাহেব ছাড়িয়ে নিলেন নিজেকে। কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা সেরে ফেলব।'

মাহতাবকে পাঠিয়ে দিয়ে শিকদার সাহেব চলে এলন তাঁর চেম্বারে। তারপর দরজা বন্ধ করে ছটফট করতে লাগলেন অস্থির চিন্তাভাবনার মধ্যে।

কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী জুটিয়ে নেয়া হল মূল উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে। একটা পাকাপোক্ত পরিকল্পনামাফিক অল্পসময়ের মধ্যেই প্রাথমিক সব কাজ সেরে ফেলা হল। ট্রাঙ্কল যোগাযোগের মাধ্যমে স্থির হয়ে গেল, সুরাইয়ার অভিভাবকরা বিকেলের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন।

বেলা গড়িয়ে দুপুর পার হল। কেমন একটা থমথমে ভাব। ষড়যন্ত্রের আভাস। কিন্তু সবকিছু ঢেকে থাকল শিকদার সাহেবের সুকৌশল চতুরতার আবরণে। দুটি অসহায় হৃদয় সারাক্ষণ আশা নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে নিরুপায় বন্দি হয়ে রইল।

এরপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। সন্ধ্যার আকাশে জমেছে মেঘ। মেঘে-মেঘে ছেয়ে যাওয়া আকাশ ঝড়ের পূর্বাভাস হয়ে এক বিকট চেহারা দেখাতে থাকে। এতক্ষণে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে তারা। শিকদার সাহেবও খুব বিব্রতবোধ

করছেন।

অবশেষে শিকদার সাহেবেরই জয় হল। একটি ফ্যামিলি মাইক্রোবাস ও একটি জিপ গাড়িতে করে চলে এসেছে সবাই। ছুটোছুটি। তাড়াহুড়ো। কয়েক মুহূর্তেই ঠিকঠাক হয়ে গেল সব। মাহতাবকে তার রুমের মধ্যেই আটক করা হল। আর সুরাইয়াকে সরিয়ে আনা হল অন্য একটি রুমে। সুরাইয়া মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল বারবার।

সবদিক ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়ে সবাই মিলিত হল শিকদার সাহেবের অফিস-চেম্বারে। বাইরে তখন বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মেঘলা আকাশ থমকে আছে বিকট রূপ নিয়ে।

সুরাইয়ার অভিভাবকদের মধ্যে ছিলেন তার বাবা, দুই চাচা... এক মামা ও তিন ভাই। তিন ভাইয়ের একজন অবশ্য খালাত ভাই, যার নাম মতিন। মতিন সঙ্গে করে জুটিয়ে এনেছিল তার তিন বন্ধুকে, যাদের ভাব-চক্কর ছিল ভিন্ন ধরনের। চেহারার রকমসকমে প্রথমে থেকেই তা প্রকাশ পাচ্ছিল।

প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের রুদ্ধ-দ্বার শলাপরামর্শ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটার ছক তৈরি করে দিল। ফলে, শিকদার সাহেবের পাওনা দাঁড়াল অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশ হাজার।

রাত হয়ে গেছে পরিপূর্ণ। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করেছে। ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে শোঁ-শোঁ শব্দে। খুব দ্রুত ঘটতে থাকল সবকিছু। শিকদার সাহেব মাহতাবকে তুলে দিলেন মতিনদের হাতে। মতিনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার তিন বন্ধু এবং শিকদার সাহেবের দুজন বিশ্বস্ত চেলা। তারা মাহতাবকে জরুরি কাজের কথা বলে তাদের সঙ্গে নিয়ে সেই ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল জিপগাড়িতে করে।

ঝড় চলল অনেকক্ষণ। বাতাস শান্ত হওয়ার পর সবাই ফিরে এল। কিন্তু ফিরে এল না একজন, মাহতাব চৌধুরী, সেই গান গাওয়া, মিষ্টিভাষী সুদর্শন যুবকটি।

পরদিন সকালে সংবাদপত্রে দেখা গেল, সুরাইয়া জামানকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং অপহরণকারী মাহতাব চৌধুরী বিপদ টের পেয়ে কোনো এক কৌশলে সটকে পড়েছে পুলিশের নাগাল থেকে। সে বর্তমানে পলাতক। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। আরও দেখা গেল, ফলাও করে ছাপা হয়েছে রেস্টহাউসের ম্যানেজারের প্রশংসামালা আর তাঁর নগদ পুরস্কার প্রাপ্তির কথা।

ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু শিকদার সাহেবের কারণে এর পরিণতি গড়িয়েছে আরও কিছুদূর। এরপর থেকে শুরু হল শিকদার সাহেবের আরেক রকম জীবন। বলাবাহুল্য, এক লক্ষ টাকার স্বপ্ন-রঙিন জীবন নয় তা। তাঁর পৈশাচিক পাপ, অশরীরী শক্তিরূপে আপতিত হল তাঁর ওপর। অভিশাপে জর্জরিত হতে থাকলেন

তিনি। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা, জেগে থাকা অবস্থায় ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা। সব মিলিয়ে তাঁর ঘৃণ্য পাপ ইহজীবন থেকেই শুরু করল তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের পথে তাড়িয়ে নিতে। অথচ, তাঁর এ অবস্থার কথা তিনি প্রকাশ করতে পারলেন না কারও কাছেই।

সেই থেকে এই রুমটিকে শিকদার সাহেব রেস্টহাউস থেকে আলাদা করে ফেলেছেন। কাউকেই আর থাকতে দেয়া হয়নি এখানে। দুটি মানব-মানবীর প্রেমের করুণ ইতিহাস নিশ্চুপে বন্দি হয়ে রইল রুমের ভেতর, যার নীরব সাক্ষী ওই জড় বস্তুটি, মাহতাবের ফেলে যাওয়া সেই স্প্যানিশ গিটারখানা।

আজ কেন জানেন না, সম্ভবত এই করুণ ইতিহাস উদ্ধার পাবে বলেই হয়তো শিকদার সাহেব মোহগ্রস্তের মতো রাত্রি-যাপনে অভিলাষী হয়ে পড়লেন এই রুমে। পরে, সুরাইয়া ও আমি এলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝড়ও হল শুরু এবং নিয়মিত নির্ধারিত উপায়ে প্রকাশিত হয়ে গেল মর্মন্তুদ প্রেমের কাহিনীটি।

শিকদার সাহেবের কথা ফুরাল। চক্ষু ভিজে এসেছে তাঁর। নত হলেন তিনি আস্তে আস্তে।

আমার বিস্মিত ভাব কাটেনি তখনও। জিজ্ঞেস করলাম, 'মাহতাবের কী হয়েছিল? সে কি তবে মারা গিয়েছিল?'

'এখনও বুঝতে পারেননি?' শিকদার সাহেব চোখ তুললেন। 'মারা যায়নি সে। তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই দিন, সেই ঝড়ের রাতেই তাকে খুন করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল সমুদ্রের লোনা পানিতে।'

চমকে উঠলাম আমি। আর তখনই আমাকে আরও ভীষণভাবে চমকে দিয়ে তীক্ষ্ণ এক নারীকণ্ঠের চিৎকার 'মাহতাব...! মাহতাব...!!' রাতের নৈঃশব্দকে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়ল রেস্টহাউসের বাইরে। বোঝা গেল, সুরাইয়ার চিৎকার। ওপাশের রুম থেকে সে পুরো কাহিনীটিই শুনতে পেয়েছে।

শিকদার সাহেবকে মনে হল, সত্যি-সত্যি নিষ্ঠুর এক জঘন্য পাপী। আমি মুহূর্তে ছুরি উঁচিয়ে ধরলাম তাঁকে খুন করার জন্যে। কিন্তু তিনি আর আগের মতো শিউরে উঠলেন না। ভয়ে জড়সড়ও হলেন না। অসহায়ের মতো মৃত্যু কামনা করতে থাকলেন শুধু।

আমি পারলাম না। হাত কাঁপতে লাগল আমার। কাঁপতে-কাঁপতে চকচকে ধারালো ছুরিটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে। আমি সেটা কুড়িয়েও নিতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম শিকদার সাহেবের ঘর ছেড়ে।

ঘরে ঢুকে দেখি, সুরাইয়া মেঝেতে লুটিয়ে আছে। আমি দ্রুত হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সুরাইয়ার ওপর। কিন্তু একী! সুরাইয়ার হাত-পা শিথিল। শীতল প্রায়।

চমকে উঠলাম আমি। নাড়ি টিপলাম। বুকে কান ঠেকিয়ে হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শোনা গেল না।

সব স্তব্ধ! পাথর!!

'তবে কি সুরাইয়ারও মৃত্যু হল?' ধ্বনিময় হল না এই প্রশ্ন। ডুকরে কেঁদে উঠলাম আমি। পড়ে রইলাম সুরাইয়ার বুকের ওপর।

খানিকক্ষণ পরে কোথা থেকে একটা ক্ষীণসুর জেগে উঠল। আস্তে আস্তে মধুময় হয়ে তা আমার কানকে মাতিয়ে তুলতে লাগল। এবং সুরের ছন্দময় তালে-তালে সবকিছু কেমন যেন পাল্টে যেতে থাকল, দ্রুত খুব দ্রুত।

হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, আমার বাহুবন্ধনে সুরাইয়া নেই। বিছানাটাকে খামচে ধরে শুয়ে আছি আমি।

তড়াক করে উঠে বসলাম। এবার কানে এল সংগীতের পরিপূর্ণ সুর 'সে-দিন দুজনে দুলেছিনু বনে...!'

সামনের ছোট্ট চেয়ারটিতে বসে মেঝেতে আলতোভাবে পা ঠুকে ঠুকে সুরের সঙ্গে তাল রক্ষা করছে সুরাইয়া। সুখের আবেশ জড়ানো হাসি ছড়িয়ে আছে ওর চোখে-মুখে।

কয়েক মুহূর্ত আমার শূন্য বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সে অশ্রুতপূর্ব মিষ্টি স্বরে বলল, 'কী, কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলে বুঝি?'

'না, আমি তো ঘুমাইনি।' বললাম আমি।

'তবে কি গানের সুর শুনতে পেয়ে উঠে বসেছ?'

'না, তা নয়, মানে...।'

'ওহ্ বুঝেছি, মনে মনে তোমার "মধুচন্দ্রিমা" উপন্যাসের প্লট সাজিয়ে ফেলে খুশিতে লাফিয়ে উঠেছ।'

'মধুচন্দ্রিমা উপন্যাসের প্লট!' আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, উপন্যাসের প্লট,...কিন্তু...!'

'ঠিক আছে, কোনো কিন্তু-টিন্তুর কারণ নেই। কাগজ-কলম নিয়ে বসে যাও।' আমাকে থামিয়ে দিয়ে সুরাইয়া বলল, 'আজ তুমি রাতভর লিখবে, আর আমি বসে বসে গান শুনব। এরকম একটা রাতে গান শুনতে খুব ভালো লাগছে আমার!'

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম এই কি সেই নারী!

বাইরে ঝড়ো-হাওয়া শান্ত হয়ে এসেছে তখন।

আহমদ আজাদ

পাশের ঘরে কে

নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন বাহলুল ইয়াজদানী। কাজ আর কী, হরর-সিরিয়ালের একটা স্ক্রিপ্ট ঘষামাজা করা। তবে কাজটায় মজা পাচ্ছেন না মোটেও। কারণ স্ক্রিপ্টটা খুব একটা আহামরি কিছু নয়। কাহিনী খুবই শাদামাঠা। তার ওপর সংলাপ লিখতে গিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়েছে স্ক্রিপ্টরাইটার। একেকটা বাক্য মাইলখানেক লম্বা। আওড়াতে গেলে জান বেরিয়ে যাবে পারফরমারদের। প্রচুর কাটাকুটি করতে হচ্ছে। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসেছেন বাহলুল ইয়াজদানী। এরমধ্যে অন্তত বারতিনেক স্ক্রিপ্টটা ছিঁড়ে ফেলার দুর্দমনীয় ইচ্ছেটাকে কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে তাঁকে। একবার ভেবেছিলেন, সিরিয়াল-টিরিয়াল আর করবেন না। কিন্তু বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেলের সাথে চুক্তির কথা ভেবে শেষপর্যন্ত কাজে হাত দিয়েছেন।

এমনিতে বাহলুল ইয়াজদানীর মন-মেজাজ তেমন ভালো নেই। এ মুহূর্তে যে সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট তিনি দেখছেন, এই সিরিয়ালটি আসলে লেখার কথা ছিল অন্য একজনের। জনপ্রিয় এক তরুণ লেখক-সাংবাদিককে তেরো পর্বের এই হরর-সিরিয়াল লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ইয়াজদানী। নাম তার কবির আহমেদ। স্ক্রিপ্ট লেখার দায়িত্বটা নেয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে করে কবির। তাই হানিমুন আর স্ক্রিপ্ট তৈরি–দুটোই একসঙ্গে পুষিয়ে নেয়ার জন্যে মধুপুরের সেই নির্জন 'রায়ভবন' এ গিয়েছিল নববধূকে নিয়ে। এর আগে 'কাটা হাত' সিরিয়ালের শুটিং করতে সদলবলে ওই বাড়িটায় গিয়েছিলেন ইয়াজদানী। তখন জঙ্গলের ওই নিঝুম পরিবেশে একগাদা লোকের সামনে ঘটে যায় এক অবিশ্বাস্য নারকীয় ঘটনা, যা পরে ব্যাপক আলোড়ন তোলে জনমনে। কিন্তু কবির আহমেদ সস্ত্রীক গিয়ে জন্ম দিল তার চেয়েও রোমহর্ষক ঘটনার। বলা নেই কওয়া নেই, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ওই বাড়ি থেকে হুট করে হাওয়া। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, মার্থা গোমেজের প্রেতাত্মার খপ্পরে পড়েছিল তারা। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ অন্যরকম। এখনও জোর তদন্ত চলছে এ নিয়ে। ইয়াজদানীকেও কম ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে না। সিআইডি এরই মধ্যে বারতিনেক শক্ত জেরার মুখে দাঁড় করিয়েছিল তাঁকে। যুক্তিতে আটকাতে পারেনি বলে ছেড়ে দিয়েছে। তবে নজর আছে এখনও। এতসব উটকো ঝামেলার মধ্যে কি আর সৃজনশীল কাজে মন বসে?

তবে বেচারা কবির আহমেদের জন্যে সত্যিই কষ্ট হয় ইয়াজদানীর। রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের দারুণ এক প্রতিভা ছিল ছেলেটি। সে আচম্বিতে নিখোঁজ হওয়ায় বড্ড বেকায়দায় পড়ে যান তিনি। কারণ হরর-সিরিয়ালের লেখক এমনিতেই দুর্লভ, তার ওপর কবিরই ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। ওই স্যাটেলাইট কোম্পানির প্রবল চাপে শেষমেষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বসেন ইয়াজদানী। যে তেরো পর্বের হরর-সিরিয়ালের ভালো একটি স্ক্রিপ্ট দিতে পারবে, আকর্ষণীয় সম্মানী দেয়া হবে তাকে। পাঁচ-পাঁচটি শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় দৈনিকে দেয়া হয় বিজ্ঞাপনটি। সময় বেঁধে দেয়া হয় এক মাস। এই একমাসে মাত্র তিনটে স্ক্রিপ্ট জমা পড়ে। এঁদের মধ্যে একজন তো রীতিমত বড়মাপের লেখক। কিন্তু এই লেখক তাঁর স্ক্রিপ্টে সাহিত্যের এমন প্যাঁচ কষেছেন, ওটা হরর-সিরিয়াল না হয়ে হয়েছে রগড়-সিরিয়াল। দু-নম্বর স্ক্রিপ্ট পড়া তো দূরের কথা, ধরারও অযোগ্য। এই লেখকটি অবশ্যি টিভি-নাটক লিখে অভ্যস্ত। একসময় টিভিতে লোককাহিনী-ভিত্তিক সিরিজ লিখতে প্রচুর। এজন্যেই বোধহয় তাঁর স্ক্রিপ্টে রূপকথার ভূত-প্রেত এসে গেছে। কাজেই এই স্ক্রিপ্টও বাতিল। বাকি এই স্ক্রিপ্টটা লিখেছে এক নবীন লেখক। জিটিভি'র হরর-শো আর সনি-টিভি'র 'আহাত'-এর অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি করেছে এই স্ক্রিপ্ট। বলা যায়, হরর-সিরিয়াল লেখার অদম্য স্পৃহা থেকেই স্ক্রিপ্টটা তৈরি। কিন্তু অনুসরণ করলে যা হয়, পুরো স্ক্রিপ্টেই ওই হিন্দি স্যাটেলাইট চ্যানেল দুটোর ব্যাপক প্রভাব। এজন্যেই স্ক্রিপ্টটা ঘষামাজা করতে গিয়ে ব্যতিক্রমী ধারার অনুসারী বাহলুল ইয়াজদানী এ মুহূর্তে মহাবিরক্ত। এখন তার মনে হচ্ছে, অন্যের ওপর ভরসা না করে নিজেই চেষ্টা করলে এতদিনে একটা জুতসই স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে যেত। খুব ভালো না হলেও অন্তত দর্শকদের ধরে রাখার মতো কিছু একটা হত। এটুকু আত্মবিশ্বাস তাঁর আছে। ঠিক এই মুহূর্তেও যদি ভালো কোনো স্ক্রিপ্ট তাঁর হাতে আসে; তাহলে এই বস্তাপচা কাহিনী ছুড়ে দিতে একমুহূর্তও দ্বিধা করবেন না তিনি।

'আসতে পারি, স্যার?'

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কণ্ঠ চমকে দিল ইয়াজদানীকে। হাতের একতাড়া কাগজ থেকে চোখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন তিনি। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে একটা কৌতূহলী মুখ।

'কী চাই?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ইয়াজদানী।

'আপনার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, স্যার,' বলেই ইয়াজদানীর অনুমতির তোয়াক্কা না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল যুবকটি। মরকত আলীর ওপর মনে মনে বেশ রুষ্ট হলেন ইয়াজদানী। বাইরে বসে বসে করছে কী হতচ্ছাড়া? তিনি তাকে কড়াভাবে বলে দিয়েছেন, বিকেল তিনটের আগে কোনো দর্শনার্থী যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে। অথচ বেটা উজবুক এই দুটোর সময়ই অচেনা এক যুবককে দিব্যি ছেড়ে দিয়েছে!

যুবকটি ইয়াজদানীর চেহারা দেখে কী বুঝল সে-ই জানে, বিনয়াবনত হয়ে বলল, 'আপনার পিওনটার কোনো দোষ নেই, স্যার। গালমন্দ করতে হলে আমাকে করুন। সে আমাকে ফেরানোর জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি অনেকটা জোর করেই ঢুকে পড়েছি। কথাগুলো আপনাকে না বললেই নয়।'

ইতিমধ্যে যুবকের আপাদমস্তক মেপে নিয়েছেন ইয়াজদানী। গায়ের রঙ কালো, লম্বাটে চেহারা, চোখেমুখে কেমন একটা ভয়কাতুরে ভাব। যেন কারও ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। লম্বা টিঙটিঙে গড়ন। ঢলঢলে শার্ট-প্যান্ট পরেছে বলেই হয়তো একটু বেশি রোগা দেখাচ্ছে। পায়ের কালো জুতোজোড়ায় ধুলো লেগে আছে। তার মানে এখানে আসার আগে দীর্ঘক্ষণ ধুলোভরা পথ ভেঙেছে সে।

ইয়াজদানী তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ছেলেটি সম্পর্কে যা আন্দাজ করলেন, তা হচ্ছে— ছেলেটি এসেছে মফস্বল থেকে। খুব সম্ভব দু-একটি দৃশ্যে অভিনয়ের আবদার নিয়ে এসেছে। এ ধরনের ছেলেরা খুবই ঝামেলা করে থাকে। খসাতে বেগ পেতে হয়। এজন্যেই মেজাজটা আরও তিরিক্ষি হয়ে গেল তাঁর। এদের প্রশ্রয় দিলেও মরণ, আবার না দিলেও বাইরে গিয়ে বদনামের ঝড় তুলবে।

অন্য কোনো সময় হলে যুবকটিকে অন্তত চা খেতে বলতেন ইয়াজদানী। বাইরে তিনি ভীষণ বদমেজাজি হলেও, ভেতরে ভেতরে অতটা নির্মম কখনোই হতে পারেন না। এজন্যে মাঝেমধ্যে নিজের ওপরই খুব রাগ হয় তাঁর।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা। যুবকটি এমন একটা সময়ে উঁকি দিয়েছে দরজায়, ঠিক যে মুহূর্তে স্ক্রিপ্টে আগুন ধরাতে ইচ্ছে করেছিল ইয়াজদানীর। তাই ভদ্রতা রক্ষা করা এ মুহূর্তে সম্ভব হল না। তিনি বেশ কর্কশকণ্ঠেই যুবকটিকে বললেন, 'হাতে সময় নেই। তাই বসতে বলতে পারব না। কী বলবে, এক মিনিটের মধ্যে বলে ঝটপট কেটে পড়ো।'

ইয়াজদানীর রুক্ষ আচরণে কোনো ভাবান্তর হল না যুবকটির মাঝে। সে নাছোড়বান্দার মতো বলল, 'কিন্তু আমাকে যে একটু বসতেই হবে, স্যার!'

ইয়াজদানী অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন ছেলেটির দিকে। কিন্তু ছেলেটি তাঁর দৃষ্টির আগুনে পুড়ল না। বরং তার চেহারায় কী এক অজানা আকুতি ফুটে উঠল, রাগ একদম পানি হয়ে গেল ইয়াজদানীর। সস্নেহে ছেলেটিকে বসতে বললেন তিনি। সে মুখোমুখি বসল তার।

দুকাজ একসঙ্গে করতে ভালোবাসেন না ইয়াজদানী। তিনি নাটকের পাণ্ডুলিপিটা টেবিলে রেখে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিলেন। মনে মনে স্থির করলেন, যত কষ্টই হোক পাঁচটা মিনিট এ ছেলেকে সময় দেবেন, তার এক সেকেন্ডও বেশি না। 'হুঁ, এবার শুরু করো।' তাগাদা দিলেন তিনি। 'সময় কিন্তু বেশিক্ষণ পাচ্ছ না। মাত্র পাঁচ মিনিট।'

'জ্বি, স্যার। শুনুন তাহলে— আমার নাম আসিফ নূর। সবাই নূর বলেই ডাকে। ক'দিন ধরে অদ্ভুত একটা সমস্যায় ভুগছি আমি।'

'কী রকম?'

'কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর সাথে তার নানার বাড়ি বেড়াতে যাই আমি। এখানে একটা কথা বলে রাখি, স্যার। আমার বাড়ি টাঙ্গাইলে। তো, শহর থেকে বেশ দূরে, এক গ্রামে বন্ধুটির নানার বাড়ি। তার নানার পূর্বপুরুষ ছিলেন জমিদার। এখন আগের সেই শান-শওকত নেই। তবে বিশাল সেই বাড়িটা আছে। বন্ধুর সাথে একরাত ছিলাম ওই বাড়িতে। রাতে দোতলার একটা ঘরে থাকতে দেয়া হয় আমাদের। ওই ঘরটির সাথেই তালা দেয়া আরেকটি ঘর। ঘরটি এমনভাবে তালা দেয়া— যেন দামি কোনোকিছু খুব যত্নের সাথে সংরক্ষিত আছে ওখানে। আমি স্বভাবতই কৌতূহলী হলাম। অবশ্যি আমি সব ব্যাপারেই বরাবর একটু বেশি জানতে চাই। এজন্যে খেসারতও জীবনে কম দিতে হয়নি। তবে এবারকার খেসারতটা ছিল সবচেয়ে বেশি। যাকগে, যা বলছিলাম— আমি ওই ঘরটি সম্পর্কে আমার বন্ধু রিপনকে জিজ্ঞেস করলে সে জানাল, একসময় খুব সংস্কৃতি-চর্চা হত ওই বাড়িতে। বিশেষ করে তার মামারা যুবকবয়সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে নাটক-থিয়েটার খুব করতেন। প্রতিবছর অঘ্রাণের শেষে বার্ষিক থিয়েটার হত হাটখোলার ময়দানে। বেশ জাঁকালো মঞ্চ সাজানো হত। উৎসব উৎসব আমেজ ছড়িয়ে পড়ত গ্রাম জুড়ে। তখন ঘটা করে নাটকের মহড়া চলত ওই তালাবদ্ধ ঘরটায়। এখনও নাটকের ওই সাজসজ্জা, মুখোশ এবং আনুষঙ্গিক জিনিস সযত্নে সংরক্ষিত আছে মহড়া-ঘরে। শোনামাত্র ওই জিনিসগুলো দেখার প্রচণ্ড লোভ হলো আমার। সেকালে গাঁয়ের বনেদি পরিবারের ছেলেরা কী ধরনের সাজ-পোশাক পরে নাটক করতেন— এটা দেখার সুযোগ পেয়ে হাতছাড়া করে কে? রিপনকে বলতেই সে চাবি আনতে গেল ছোটমামার কাছে। বাড়িতে এখন শুধু রিপনের ছোট মামা-মামিই থাকেন। বাকিরা সবাই শহরে সেটলড। কেউ কেউ ঢাকায়ও আছেন। তো যাই হোক, আমাকে অবাক করে দিয়ে খালিহাতে ফিরে এল রিপন। ছোট মামা চাবি দেননি তাকে।'

'কেন?' অনেকটা ঝোঁকের বশেই বলে ফেললেন ইয়াজদানী। ইতিমধ্যে নূর নামের এই যুবকের একটা গুণ আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। তার কথা বলার কায়দাটা চমৎকার। আশ্চর্য এক সম্মোহনী-শক্তি আছে নূরের কথা বলার ঢঙে। শ্রোতাকে টেনে রাখে চুম্বকের মতো। যেমন— এ পর্যন্ত নূর যা বলেছে, তাতে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু খুঁজে পাননি ইয়াজদানী। তবু তিনি কোনোরকম বিরক্তিবোধ ছাড়াই শুনে যাচ্ছেন ছেলেটির কথা। এটাই তার কৃতিত্ব।

নূর বলে চলল, 'এমনিতে কিন্তু রিপনের ওই ছোটমামা খুবই ভদ্র আর আন্তরিক। যদি তিনি রূঢ় প্রকৃতির হতেন, তাহলে চাবি না-দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে

একটুও অবাক হতাম না। তাছাড়া এর আগে দেখেছি, বনেদি পরিবারের মানুষ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বা গর্ব করার মতো কিছু দেখানোর সুযোগ পেলে, সহজে হাতছাড়া করে না। আর রিপনের মামার বেলায় দেখা গেল ঠিক তার উল্টোটি। কাজেই ওই রিহার্সাল-রুমটার ব্যাপারে প্রচণ্ড কৌতূহল হলো আমার। কেবলই মনে হতে লাগল, রহস্যজনক কিছু একটা যেন আছে ওই রুমটাতে।

'তো, যাই হোক, রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে কৌতূহলটা অপূর্ণ রেখেই শুতে গেলাম। জার্নির ধকলে ক্লান্ত ছিলাম। তাই বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তখন ক'টা বাজে জানি না, বিকট এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। দেখি, একটা শিরহীন দেহ পিছু নিয়েছে আমার। আমি যেখানে যাই, সেখানেই ভোজবাজির মতো হাজির হয় ওই কন্ধকাটা। বোবার মতো অ-অ শব্দ করে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। আমার পাশে রিপন তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। এদিকে তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। পানির জন্যে দেয়াল-লাগোয়া টেবিলটার দিকে এগোলাম, হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে, মানে ওই রিহসাল-রুমটায় বেশ একটা আলোড়ন। যেন রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে ঘরটায়। ভাবলাম, চোর-ডাকাত। ঘাবড়ে গিয়ে ডাকতে গেলাম রিপনকে, কিন্তু পরক্ষণে আবার সামলে নিলাম নিজেকে। সেই রহস্যের ব্যাপারটা ঘাই মারল মাথায়। মামা যেহেতু চাবিটা দেননি, কাজেই নিগূঢ় কোনো ব্যাপার তো আছেই ঘরটায়। কাজেই কাউকে না-জানিয়ে গোপনেই দেখা যাক ব্যাপারটা।'

ইতিমধ্যে নূরের কথায় মজে গেছেন ইয়াজদানী। মনে মনে আরও পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ করেছেন ছেলেটির জন্যে। দরকার হলে আরও কিছুটা সময় দেয়া যেতে পারে। আগে দেখা যাক, কী বলে সে। 'চা খাবে, ছেলে?'

কঠিন প্রকৃতির মানুষটার হঠাৎ আন্তরিকতা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হলো নূরের। হ্যাঁ কি না বলবে— সহসা জবাব খুঁজে পেতে হিমশিম খেতে লাগল। ইয়াজদানী তার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে টেবিলের ডান ধারে রাখা ফ্লাস্কটা তুলে নিলেন। দুটো কাপ সবসময় তৈরিই থাকে তাঁর টেবিলে। একটা তাঁর জন্যে, আরেকটা অতিথির জন্যে। তিনি ফ্লাস্ক থেকে দুটো কাপে চা ঢেলে একটা এগিয়ে দিলেন নূরের দিকে।

ছেলেটি লাজুক ভঙ্গিতে চায়ের কাপটা নিয়ে ধন্যবাদ জানাল ইয়াজদানীকে। তারপর আবার শুরু করল, 'আমাদের ওই ঘরটা থেকে রিহার্সাল-রুমে যাওয়ার সরাসরি কোনো দরজা নেই। কাজেই সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। প্রশস্ত টানা বারান্দার সাথে পাশাপাশি দুটি ঘর। জোছনারাত থাকায় বারান্দায় চাঁদের আলো ছিল। সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। রিহার্সাল-রুমের ভেতরকার হুটোপুটির শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। দরজায় গিয়ে কান ঠেকাতেই মনে হল, কেউ যেন প্রবল আক্রোশে তছনছ করে বেড়াচ্ছে ঘরের সমস্ত জিনিস। রীতিমতো গা-শিউরোনো একটা ব্যাপার। দরজায় তালা ছিল দুটো। একটা একদম ওপরের

দিকে— শেকল তুলে দিয়ে লাগানো হয়েছে। আরেকটা তালা দরজার কড়ায়। দরজাটা কিছুটা খড়খড়ি ধাঁচের। ওপরের অর্ধাংশে খড়খড়ি, বাকিটুকু নিশ্ছিদ্র কাঠ।

'তো, কতক্ষণ দরজায় কান পেতে ছিলাম জানি না, একসময় মনে হল— ঘরের ভেতরকার ওই লঙ্কাকাণ্ডের হোতা বেশ ক্লান্ত। থপ্ থপ্ করে এলোমেলো পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ওই অজ্ঞাত লোকটি বলে উঠল, "ওভাবে আড়িপাতা ঠিক নয়।"

' "কে?" অজান্তেই আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল।

' "ভয়ের কিছু নাই," আমাকে অভয় দেয়া হল ভেতর থেকে। কণ্ঠস্বরটা বেশ ভারী আর শীতল। সে বলল, "আমি আপনার ওপর রাগ হই নাই। নিশি-রাত্রে পাশের ঘরে শব্দ শুইনা বাইর হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এমন কাজ আর কখনও করবেন না।"

'লোকটির ভদ্র ব্যবহারে কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আপনি কে? এত রাতে রিহার্সাল-ঘরে কী করেন?"

' "একখান জিনিস খুঁজি।"

' "কী জিনিস?"

' "সেইটা বলা যাবে না। ভয় পাবেন। অজ্ঞানও হইতে পারেন।"

' "তবু বলেন।"

' "বলব না। বেশি জানতে ইচ্ছা করলে ঠিকই জানতে পারবেন।"

' "আচ্ছা, আপনি এই তালাবদ্ধ ঘরটায় ঢুকলেন কী করে?"

' " ঢুকিনি, গত পরশু আমাকে ঢোকানো হয়েছে।"

' "বলেন কী! কে ঢোকাল আপনাকে?"

' "সে অনেক কথা। এবার আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। বিছানায় ফিরে যান আপনি।"

'আমার সহসাই মনে হল, ঘুমের ঘোরেই রয়ে গেছি আমি। আর দেখছি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন। কিন্তু গায়ে চিমটি কাটতেই সে সন্দেহ দূর হল। তবে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। একটা মানুষ দুদিন ধরে আটকা পড়ে আছে তালাবদ্ধ একটা ঘরে, অথচ তার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই কারও। বন্দি যত খারাপই হোক, বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার তারও আছে। রিপনের মামার প্রতি মনটা বিষিয়ে উঠল আমার। কেন তিনি রিহার্সাল-রুমের চাবি দেননি, বুঝতে আর বাকি রইল না। কিন্তু লোকটির ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমার। রিপনের মামা না হলে হয়তো দুচার কথা বলা যেত। তো, ক্ষোভ মনে চেপেই শুতে গেলাম। যাওয়ার আগে বিদায়সূচক সৌজন্য জানালাম লোকটিকে। কিন্তু লোকটি কোনো কথা বলল না। কয়েক সেকেন্ড পর কাঠের ভারী কিছু পতনের শব্দ পেলাম। ও নিয়ে কোনো মাথা না

ঘামিয়ে ফিরে এলাম ঘরে।

'পরদিন সকালে রিপনকে রাতের ঘটনা খুলে বলতেই সে আকাশ থেকে পড়ল। কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না ঘটনাটা। বরং দুঃস্বপ্ন দেখে আমার মাথা বিগড়ে গেছে— এ নিয়ে হইচই করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল আমাকে। রিপনের ছোটমামা এমনিতেই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, আমার কাণ্ডে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল দৃষ্টিতে বারবার তাকাতে লাগলেন আমার দিকে। শেষে ঘরটা খুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন আমাকে। রিপনও সঙ্গে গেল। দেখি, বাক্স-পেটরাসহ রাজ্যের জঞ্জাল ভেতরে। দুটো কাঠের আলমারি ভর্তি নাটকের বিভিন্ন পোশাক, রাজমুকুট, মুখোশ। দেয়ালে দেয়ালে আবার ঢাল-তলোয়ার-বল্লম সাজানো। লম্বা একটা কাঠের কফিনও দেখতে পেলাম ভেতরে। কফিনের ডালাটা সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল বলে আমার সামনেই চাকর দিয়ে পেরেক ঠুকে ডালাটা ভালো করে আটকে দিলেন ছোটমামা।

'বেরিয়ে আসার সময় একচিলতে রহস্যময় হাসি ফুটল ছোটমামার ঠোঁটে। কৌতুকের ভঙ্গিতে তিনি আমাকে ভুরু নাচিয়ে বললেন, "কই, তোমার সেই অজ্ঞাত দেহধারীকে তো পেলাম না!"

'লজ্জায় মাটির সাথে মিথে যাওয়ার অবস্থা হল আমার। সেদিনই ওই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পুনর্বার কৌতুক-দৃশ্যের অবতারণা হওয়ার ভয়ে বাড়ি ফিরে কাউকে আর বললাম না ঘটনাটা। অনেকটা জোর করেই ওই অবিশ্বাস্য বাস্তবকে দুঃস্বপ্ন বলে মেনে নিলাম। কিন্তু আমার বিধি বাম। বুঝতেই পারিনি যে, দুর্ভাগ্যকে সাথে করেই বাড়ি ফিরেছি আমি।'

'কী রকম?'

'ওই রাতের পর থেকেই অশুভ একটা কিছু সওয়ার হয়েছে আমার ওপর। আমি যেখানেই যাই, এমনসব কাণ্ড ঘটে— যার সাথে বাস্তবের কোনো, মিল নেই।'

'যেমন?'

'এ মুহূর্তে কোনো উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়, স্যার। তবে আশা করি, শিগগির এর একটা নমুনা দেখতে পাবেন।'

'তোমার কাহিনী কি শেষ?'

'জ্বি, স্যার।'

'তুমি কি আমাকে এই কাহিনী শোনাতেই এসেছ?'

'জ্বি না, স্যার।'

'তাহলে কীজন্যে এসেছ?'

'আমার বিশ্বাস, রিপনের নানার বাড়ি— মানে ওই পুরনো জমিদারবাড়ির রিহার্সাল-রুমে অবশ্যই অশুভ কিছু একটা আছে।'

'উম-ম্‌, হ্যাঁ, থাকতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কী করার আছে?'

'আপনি গিয়ে রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করুন, স্যার। নইলে আমার মতো আরও অনেকেই হয়তো শাপগ্রস্ত হবে।'

'তা আমিই যে ওই রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতে পারব— তোমার মাথায় হুট করে এ চিন্তা উদয় হল কেন?'

'হুট করে উদয় হয়নি, স্যার। আপনার সম্পর্কে আমি খুব ভালো করে জানি। আমি মফস্বলের ছেলে হলেও দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখি। ছড়া-টড়াও লিখি, স্যার। ঢাকার বড় বড় পত্রিকায় বেশকিছু ছড়া ছাপা হয়েছে আমার। এমনিতে এবার বি.কম. পাস করেছি। আপনি যে, স্যার, হরর-সিরিয়াল নিয়ে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন— এ তো শুধু আমি নই, দেশের অজস্র লোক জানে। তাছাড়া সবাই ভূত-প্রেতের কাহিনী অসম্ভব-অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেও, আপানর কাছে এর বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। এজন্যেই আপনার কাছে আসা।'

'হুঁম।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ইয়াজদানী। নূরের আশার আলোকে দপ্‌ করে নিভিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ তোমার কাছ থেকে যা শুনলাম, তা সত্যিই একটা চমৎকার কাহিনী। দেখো, তুমি আমাকে সরাসরি বললেই পারতে যে একটা ভূতুড়ে কাহিনী দিতে এসেছ। নাটক না করলেও চলত। তবে তোমার অভিনয়ে আমি মুগ্ধ। দেখি, আগামীতে কোনো সিরিয়ালে তোমাকে কাস্ট করা যায় কিনা।'

'স্যার, আমি...মানে, স্যার...আমি...' ব্যাকুল হয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল নূর।

কিন্তু হাত তুলে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ইয়াজদানী। সকৌতুকে বললেন, 'অত বিব্রত হওয়ার কিছু নেই, ছেলে। তোমার গল্পটা পছন্দ হয়েছে আমার। আশা করি, এ থেকে চমৎকার একটা কাহিনী দাঁড় করাতে পারব। আর এজন্যে উপযুক্ত সম্মানীও দেব তোমাকে। তোমার ঠিকানাটা রেখে যাও। শিগগিরই যোগাযোগ করব তোমার সাথে। আর এখন কিছু আগাম নিয়ে যাও।'

এই বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে টাকার ওয়ালেটটা বের করলেন ইয়াজদানী। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল নূর। বিনয়ী ভাবটা মুছে গিয়ে চাপা অসন্তোষ ফুটে উঠল তা চেহারায়। আহত কণ্ঠে বলল, 'আপনার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, স্যার। কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করলেন না!'

'বোসো, বোসো, অযথা মন-খারাপ করছ তুমি। আমি তো তোমাকে গালমন্দ করিনি, বা তোমার সম্পর্কে খারাপ কোনো মন্তব্যও করিনি।'

'বাদ আর রেখেছেন কোথায়, স্যার! কারও কথা অবিশ্বাস করলে এরচেয়ে বড় অপমান তার জন্যে আর কী হতে পারে? তার ওপর টাকা বের করে কাটা ঘায়ে নুন ছিটাচ্ছেন!'

'আগে বোসো তো, ছেলে! বোসো।'

নূর বসল আবার। ইয়াজদানী একটা রাইটিং প্যাড আর কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার নাম-ঠিকানাটা এখানে দিয়ে যাও। তোমাকে গুরুত্ব না দিলে তো আর এসব লিখে দিতে বলতাম না।'

নূর তার নাম-ঠিকানা লিখে দিল প্যাডে। ইয়াজদানী তাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, এর আগে তোমার মতো বেশ কজন এসে এ-ধরনের গল্প ফেঁদে গেছে। তবে তোমার কল্পনাশক্তি সত্যিই চমৎকার! তোমাকে দিয়ে মনে হচ্ছে ভালোই কাজ হবে আমার।'

'স্যার, আপনি এখনও...'

'আহা-হা, তুমি আবারও উত্তেজিত হচ্ছ কেন! ব্যাপারটাকে আমার মতোই সহজভাবে নাও। ওই জমিদারবাড়ি, রিহার্সাল-রুম— সব ঠিকই আছে। বাকিটা তোমার কল্পনা।'

'আপনার ওপর আমার খুবই শ্রদ্ধা ছিল, স্যার!' ফট করে আবার দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা। 'কিন্তু আপনি দেখছি...'

কথাটা শেষ না করে ঠিক যেভাবে দমকা হাওয়ার মতো এসেছিল, সেভাবেই বেরিয়ে গেল নূর।

মনটা খারাপ হয়ে গেল ইয়াজদানীর। ছেলেটাকে তিনি সরাসরি এভাবে না বললেও পারতেন। শেষে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মরকত আলীর ওপর। তাকে ডাকার জন্যে বেল বাজালেন তিনি। একবার, দুবার, তিনবার। কিন্তু কোনো সাড়া নেই তাঁর।

মেজাজটা এবার সত্যিই খিঁচড়ে গেল ইয়াজদানীর। ঘন ঘন বেশ কবার বেল টিপলেন তিনি। কিন্তু তবু মরকত আলীর দেখা নেই। নির্ঘাত কোথাও আড্ডা মারতে গেছে। কিন্তু এত সাহস তো তার হবার কথা নয়।

ইয়াজদানী পরিষ্কার উপলব্ধি করলেন, মরকতের ওপর তার রাগটা এ মুহূর্তে এতই চরমে পৌঁছেছে যে, বেটা উজবুক সামনে এলে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলতে পারেন।

রাগ প্রশমনের জন্যে নিজস্ব একটা পন্থা আছে ইয়াজদানীর। এর আগে বহুবার ফল পেয়েছেন। তিনি তাঁর রুম-সংলগ্ন বাথরুমের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আয়নায় নিজের রাগী চেহারা দেখলে আপনাআপনি রাগ কমে যায়।

কিন্তু আয়নায় যে মুখ দেখলেন, তাতে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হল। বেসিনের ওপর বসানো ডিম্বাকার দেয়াল-আয়নায় বীভৎস একটা মুখ। যেন নরক থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে!

সঙ্গে সঙ্গে ইয়াজদানীর মনে হল, হয় জাদুর কোনো ব্যাপার ঘটেছে আয়নায়,

নয় তো এ তার মতিভ্রম। হ্যালুসিনেশন! সারাদিন ভূতুড়ে কাহিনী নিয়েই আছেন, তার ওপর এইমাত্র একটা ছেলে তাকে গা-ছমছমে কাহিনী শুনিয়ে গেল। কাজেই অবচেতন মনে এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এদিক-ওদিক নজর বুলিয়ে আবার আয়নাটার দিকে তাকালেন ইয়াজদানী। আবারও সেই কুৎসিত চেহারা! আগের চেয়ে আরও বিকট হয়ে উঠেছে। রাজ্যের ঘৃণা আর আক্রোশ যেন জড়ো হয়েছে ওই নিষ্ঠুর মুখে।

এই ভয়ংকর প্রতিবিম্বটি তাঁর— এই উপলব্ধিটা এতক্ষণে নাড়া দিল ইয়াজদানীর বোধশক্তিতে। আর তখুনি উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'না-না, এ হতে পারে না!'

এক দৌড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন ইয়াজদানী। টেবিলে পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখা পানির গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেললেন সবটুকু পানি। তারপর হাঁপাতে লাগলেন কামারশালার হাপরের মত। তাহলে কি নূর নামের ওই ছেলেটির কথাই ঠিক? পুরনো সেই জমিদার বাড়িতে যে ঘরটিতে সে একরাত ছিল, তার পাশের ঘরে সত্যিই কি রহস্যজনক কিছু আছে?

নিশ্চয়ই আছে। নইলে তাঁর চেহারাটা এমন হঠাৎ করে বিকৃত হয়ে যাবে কেন? এ নিশ্চয়ই ছেলেটার ওপর সওয়ার হওয়া অশুভ শক্তির প্রভাব। এই রহস্যটা তাঁকে অবশ্যই ভেদ করতে হবে। কিন্তু তার আগে নিজের বিকৃত বীভৎস চেহারাটির কী করা যায়? আচানক এই দুর্গতিতে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

বাথরুমে দ্বিতীয়বার যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ইয়াজদানীর। কিন্তু কী এক দুর্নিবার টান আবার বাথরুমে নিয়ে গেল তাঁকে। আবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সেই বীভৎস মুখটা এখন আর নেই। তার বদলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি বুদ্ধিদীপ্ত চিরচেনা মুখ। নিজের প্রতিবিম্ব। জীবনে এত স্বস্তি আর কখনও বুঝি পাননি তিনি।

নিজের অতিপ্রিয় নাক-মুখ-চোখ বারবার ছুঁয়ে দেখলেন ইয়াজদানী। তারপর তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এলেন চেম্বারে। ইতিমধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করতে ওই ছেলেটাকে। পুরনো সেই জমিদারবাড়ির রিহার্সাল-রুমের রহস্য উদ্‌ঘাটন না করে শান্তি নেই তাঁর।

রাইটিং প্যাডটা উঠিয়ে নূরের ঠিকানাটা পড়তে গেলেন ইয়াজদানী। কিন্তু ঠিকানা কোথায়? এর বদলে রয়েছে চার লাইনের একটি রহস্যময় ছড়া—

অবিশ্বাসীর পরিণাম
জানি আমি সেটা,
ভবিতব্য রুখতে পারে
কোনো বাপের বেটা!

ছড়াটি পড়ে গায়ের রোমগুলো ফড়ফড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল ইয়াজদানীর। এই ছড়ার মাধ্যমে তাঁকে কী ইঙ্গিত করেছে নূর?

ইয়াজদানী ছড়া নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে পারলেন না। তার আগেই বাইরে থেকে একটা হুলস্থূলের শব্দ এসে মনোযোগ কেড়ে নিল। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দেখেন, তাঁর অফিসের সদর দরজার ঠিক পাশেই মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মরকত আলী। তাকে ঘিরে আছে সাত-আটজন। দু-তিনজন ইতিমধ্যে লেগে গেছে মরকতের মূর্ছা ছাড়াতে।

ইয়াজদানী তাঁর ব্যক্তিত্ব ভুলে মরকতের পাশে গিয়ে বসলেন। শুশ্রূষারত একজনের মগ থেকে খানিকটা পানি নিয়ে ছিটালেন মরকতের চোখেমুখে। তারপর তার গালে মৃদু চাপড় মেরে কোমল কণ্ঠে ডাকলেন, 'মরকত, মরকত!'

দু-মিনিটের মাথায় চোখ মেলল মরকত আলী। মেলেই দিল চিৎকার, 'সাপ, সাপ!'

তার ভয়ার্ত চিৎকারে গোল হয়ে দাঁড়ানো দু-তিন জন লাফিয়ে উঠল তিড়িং-বিড়িং। যেন সত্যি সত্যিই সাপ এসেছে অফিস বিল্ডিংটায়।

ইয়াজদানী ধমকে উঠলেন মরকতকে, 'এই বেটা, কিসের সাপ! কোথায় সাপ!'

মনিবের ধমক খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হল মরকত আলী। তারপর সবাইকে খুলে বলল ব্যাপারটা।

খানিক আগে দুপুরের খাওয়া সেরে সে মাত্র এসে বসেছে টুলটায়, এমন সময় অচেনা এক যুবক এল তার মনিবের সাথে দেখা করতে। মরকত মনিবের পূর্ব-নির্দেশের কথা জানিয়ে দিল যুবককে। কিন্তু যুবকটি নাছোড়বান্দা। দেখা সে করবেই। এদিকে মরকত আলীও পথ ছাড়বে না। শেষে যুবক মরকতকে বলল, যদি সে একটা তাক-লাগানো ম্যাজিক দেখাতে পারে, তাহলে তাকে ভেতরে যেতে দেবে কিনা?

মরকত ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখার আগেই যুবকটি হাত মেলাতে চাইল মরকত আলীর সাথে। সৌজন্য বিনিময়ে দোষ কী? নিশ্চিন্তে হাত বাড়িয়ে দিল মরকত। কিন্তু যুবকের হাতের স্পর্শে চমকে উঠল সে। তার হাতটা মরা মানুষের মতো ঠাণ্ডা। হাতটার দিকে ভালো করে তাকাতেই আতঙ্কে জমে যাবার উপক্রম হল মরকতের। হাত কোথায়, এ যে বিষধর সাপের ফণা! তার মুঠোর ভেতর মোচড় খাচ্ছে ক্রমাগত। টুঁ শব্দটি না করে ধপাস করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল মরকত আলী। সোজা দাঁত-কপাটি! লাঞ্চের বিরতি চলছিল বলেই তখন আশেপাশে আর কেউ ছিল না। এই সুযোগে নিশ্চিন্তে ভেতরে ঢুকে পড়ে যুবক।

মরকত আলীর গল্প শুনে হাসাহাসি শুরু করে দিল সবাই। শুধু ইয়াজদানী হাসলেন না। তিনি তো ভালো করেই জানেন, একবর্ণও মিথ্যে বলেনি মরকত আলী।

বিরসবদনে চেম্বারে ফিরে এলেন ইয়াজদানী। স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসলেন আবার। কাটাকুটির ভেতর ডুবে গিয়ে ভুলে যেতে চেষ্টা করলেন খানিক আগের অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু অস্বস্তি যেন ক্রমেই চেপে ধরছে তাঁকে। কেবলই মনে হচ্ছে, নূর নামের ছেলেটি যায়নি এখনও। এই অফিসেই লুকিয়ে আছে। স্ক্রিপ্টের পাতায় চোখ রাখতেই মনে হচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে সকৌতুকে বারবার উঁকি দিচ্ছে নূর।

স্ক্রিপ্ট দেখা গোল্লায় গেল ইয়াজদানীর। বেশ ক'বার দরজার দিকে তাকানোর পর কেমন তরাস-খাওয়া একটা ভাব এসে গেল তাঁর মাঝে। ভীতদৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে নজর বোলাতে লাগলেন তিনি। তাঁর ঠিক বাঁ-পাশেই লোহার স্ট্যান্ডের সাথে একটা মনুষ্য-কঙ্কাল ঝোলানো। হঠাৎ মনে হল, এই কঙ্কালটি যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

এমন সময় প্রপসম্যান লালটু এসে ঢুকল ইয়াজদানীর চেম্বারে। ঢুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সে। এতদিন ঘটেছে ঠিক এর উল্টোটি। বেঁটে-খাটো, রোগা-পটকা গড়নের লালটু দেখতে বড়ই অদ্ভুত। তার উষ্কখুষ্ক চুল দেখলে যে-কেউ ভাববে, ওই কেশদামে কস্মিনকালেও চিরুনি পড়েনি। কপালের দুপাশের রগগুলো যেন কালো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে উদ্‌গ্রীব। টিয়ার ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক। ঠোঁটে সারাক্ষণ দুর্বোধ্য হাসি। এই হাসির বাড়তি অলঙ্কার আবার কেলেছোপ দুপাটি দাঁত। বড় বড় লালচে চোখদুটোতে যেন রাজ্যের খিদে। এই খিদেটা যে কিসের— তা সেই জানে।

লালটুর বয়স তিরিশের মতো। কিন্তু দেখায় চল্লিশোর্ধ্ব। বছরদুয়েক ধরে ইয়াজদানীর প্রপসম্যান হিসেবে কাজ করছে সে। শুটিংঙের সময় আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহ করে। এমনিতে ইয়াজদানীর শুটিং না-থাকলেও সপ্তায় অন্তত বার তিনেক দেখা করতে আসে লালটু। আজও তাই এসেছে।

দু-বছর ধরে দেখতে দেখতে লালটুর মুখটা ইয়াজদানীর কাছে পুরনো হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে দু-তিন দিন বিরতি নিয়ে দেখা করতে এলেই প্রথমে একটু চমকে যান তিনি। তাকে দেখলেই শেওড়া-গাছের পাতিভূতের কাল্পনিক মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে চোখে। লালটু অবশ্যি ভূতপ্রেতের একটি চরিত্রের জন্যে দীর্ঘদিন ধরেই লালায়িত। ইয়াজদানী শুধু 'দেব দেব' বলে আসছেন। তিনি ঠিক করেছেন, ব্যক্তিত্বহীন ছ্যাঁচড়া ভূতের কোনো চরিত্র হাতে এলে লাগিয়ে দেবেন লালটুকে।

ভড়কে যাওয়া লালটু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, না থেকেই যাবে— এ নিয়ে বেশ দ্বিধায় পড়ে গেল। শেষে অনেকটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বলে ফেলল, 'স্যা-আ-আ-র কো-কোথায়!'

'চোখে ধুলি এঁটেছ নাকি।' চেয়ার থেকে গর্জে উঠলেন ইয়াজদানী। 'আমাকে কি

স্যার বলে মনে হচ্ছে না?'

'জ্বি, স্যার!' পটাপট দুটো ঢোক গিলে ফেলল লালটু। 'কিন্তু চে-চে-চে-হা-রা-টা...

ভয়ে কথাটা শেষও করতে পারল না বেচারা। ইয়াজদানী টের পেলেন, তাঁর মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে আবার। অকস্মাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন, এরকম একটা ভয়ংকর মুখ দর্শকদের সামনে হাজির করার পরিকল্পনা তাঁর দীর্ঘদিনের। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সেই চরিত্রও পাননি, এরকম মেক-আপেরও সুযোগ ঘটেনি। তাহলে কি তাঁর কল্পনাশক্তির ওপর প্রভাব খাটাচ্ছে নূরের ওপর ভর করা সেই অশুভশক্তি?

'স্যার কি কোনো দামি মুখোশ পরেছেন নাকি?' ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে লালটু।

'হুঁ, অনেকটা ওরকমই,' বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিলেন ইয়াজদানী।

'ফ্যান্টাস্টিক! আপনাকে যা লাগছে না, স্যার! হরর ছবির রিয়্যাল হিরো!'

লালটুর প্রশংসার বহর দেখে হেসে ফেললেন ইয়াজদানী। কিন্তু নিজের হাসিতে চমকে উঠলেন নিজেই। এমন খনখনে শোনাচ্ছে কেন তাঁর হাসি?

এদিকে লালটু তো বিষম খেতে শুরু করেছে। মুখটা ঘুরিয়ে সে খক্-খক্ করছে, আর আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছে ইয়াজদানীর দিকে। ভাবসাবে মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে ঝেড়ে দৌড় লাগাবে।

ইয়াজদানী লালটুর ভীতসন্ত্রস্ত ভাবটা কাটানোর জন্যে বসতে বললেন তাকে। ধপ্ করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল সে।

'চা খাবে?' কোমল কণ্ঠে বললেন ইয়াজদানী। লালটু কোনো কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল দ্রুত। তিনি সামনের খালি কাপটা দেখিয়ে বললেন, 'একটু আগে একজন চা খেয়ে গেছে। তুমি বাথরুম থেকে ধুয়ে নিয়ে এসো কাপটা।'

সুবোধ বালকের মতো কাপটা নিয়ে বাথরুমে গেল লালটু। ফিরে এল মিনিটখানেকের মধ্যেই। ইয়াজদানীর দিকে তাকিয়ে কেলেছোপ হাসি উপহার দিল সে। বলল, 'তেলেসমাতি কারবার! এরই মধ্যে মুখোশটা খুলে ফেলেছেন, স্যার! ওহ্ গড, কি ভয়ংকরই না হয়েছিল চেহারাটা! মুখোশটা একটু দেখতে পারি, স্যার?'

'নেভার, আমার একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস কাউকে দেখাই না আমি। এবার বলো, কোনো খবর-টবর আছে কিনা।'

'জ্বি, স্যার, আছে।'

'কী?'

'একটা কফিন।'

'কফিন?'

'জ্বি, স্যার। মাত্র আজই—এই ঘণ্টাখানেক আগে কিনেছি। নিচে রেখে এসেছি ওটা।'

'তা হঠাৎ কফিন কিনলে কী মনে করে?' রসিকতার সুযোগটা ছাড়লেন না ইয়াজদানী। 'শিগ্‌গিরই পটল তোলার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'অলক্ষুনে কথা বলবেন না, স্যার,' বিব্রত ভঙ্গিতে ঘাড় চুলকাল লালটু। 'এমনিতেই কফিনটা কেনার পর থেকে মনটা বড় অশান্ত।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'গিয়েছিলাম মহাখালি বাস টার্মিনালে। শেরপুরের এক বন্ধুকে তুলে নিয়ে এলাম বাসে। তো, সেখানে দেখি, ক'জন কুলি ধরাধরি করে একটা কফিন নামাচ্ছে একটা বাস থেকে। কফিনটা বেশ পুরনো, আর ওটার কাঠে খুব সুন্দর কারুকাজ। কৌতূহল কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার মতো আরও অনেকেই এগিয়ে গেল। সবারই এক প্রশ্ন—লাশটা কার?

'তখন ফর্সা এক যুবক এগিয়ে এল। দেখে অভিজাত ঘরের ছেলে বলেই মনে হল তাকে। সে বলল, কফিনে আসলে কোনো লাশ-টাশ নেই। একদম খালি। বিক্রি করার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে এটা। বিক্রির কথা শুনে অমনি ঝাঁ করে মাথায় উদয় হল, আমাদের হরর কর্মকাণ্ডের চমৎকার একটা আইটেম হতে পারে কফিনটা। তাই একরকম, দরকষাকষি না করেই কিনে ফেললাম কফিনটা। অবশ্যি সেই ছেলেটিও তেমন একটা খেঁচাখেঁচি করেনি।'

'তা কত নিয়েছে কফিনটা?'

'এই হাজার দুয়েক, স্যার। সৌভাগ্যক্রমে ওই হাজার দুয়েকই ছিল পকেটে। রিকশা-ভ্যানের ভাড়াটা, স্যার, মরকত আলীর কাছ থেকে নিয়ে দিয়েছি।'

'বলো কী তুমি! দুহাজার টাকা দিয়ে একটা কফিন কিনে ফেললে!'

'দুহাজার কেন, স্যার, ওই কফিন পাঁচ হাজার দিয়ে কিনলেও ক্ষতি নেই। দেখলে বুঝবেন।'

'কিন্তু তোমার একটা জিনিস বুঝলাম না।'

'কী জিনিস, স্যার?'

'কফিন কিনে বাহাদুরি ফলাচ্ছ, আবার ওটাই তোমার টেনশানের কারণ—ব্যাপারটা কী?'

'টেনশানটা আসলে ওই রিপন ছেলেটির জন্যেই শুরু হয়েছে, স্যার।'

'রিপন আবার কে?'

'যার কাছ থেকে কফিনটা কিনলাম। আমি, স্যার, কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলে ফেলেছিলাম, কফিনটা আমাদের ভূতুড়ে কর্মকাণ্ডে লাগানো হবে। বাস্, ছেলেটি ঝেড়ে দিল কফিনের পূর্ব-ইতিহাস।'

'কী রকম?'

'কফিনটার মালিক আসলে ওই ছেলেটির মামারা। কফিনটা রিপনের মামারা পেয়েছিলেন এক ম্যাজিশানের কাছ থেকে। অঘ্রাণের শেষে তার নানার বাড়িতে নাকি থিয়েটার-উৎসব হত। ওই উৎসবেই ম্যাজিক দেখাতে আসে এক ম্যাজিশান। তার ম্যাজিকগুলোর মধ্যে কফিনের জাদুটাই ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর। তো, উৎসব শেষে বিদায় নেয়ার ঠিক আগের দিন রাতে রহস্যজনকভাবে খুন হয় ওই ম্যাজিশান। রাতে দিব্যি ভালোমানুষ ঘুমোতে গেল সদরবাড়ির এক কুঠুরিতে। সক্কালবেলা বাড়ির এক চাকর গিয়ে দেখে, ম্যাজিশানের রক্তাক্ত ধড়টি পড়ে আছে বিছানায়। আর তার মুণ্ডুটি নিয়ে খুনি পগার-পার।

'অনেক চেষ্টা করেও নাকি পুলিশ ওই ম্যাজিশানের হত্যা-রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। এদিকে ওই ম্যাজিশানের বাড়িটি ছিল অনেকদূর। ওই গ্রাম থেকে পাক্কা তিনিদিনের পথ। কাজেই আত্মীয়স্বজনের কাছে লাশটি পাঠানোও সম্ভব হল না। শেষে এই কফিনে করেই ম্যাজিশানকে কবর দেয়া হয়। কিন্তু তিনদিন পরই ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য রোমহর্ষক কাণ্ড! এক ভোরে দেখা গেল, কফিনটা উঠে আছে কবরের ওপর। কন্ধকাটা লাশটি বেমালুম উধাও। অনেকে অনেক কথাই বলল এ নিয়ে। রিপনের মামারা ওসব কেয়ার না করে কফিনটি নিয়ে এলেন বাড়িতে। কফিনটা এতদিন ওই বাড়ির পরিত্যক্ত ভাঁড়ার-ঘরেই পড়েছিল। কিছুদিন আগে বিশেষ কারণে ভাঁড়ার-ঘর থেকে এটাকে নিয়ে আসা হয় দোতলার রিহার্সাল-রুমে। এরপর থেকেই ওই রুমটিতে ঘটতে থাকে ভূতুড়ে সব কাণ্ড। এজন্যেই রিপনকে দিয়ে কফিনটি বিক্রি করতে পাঠানো হয়েছে। গ্রামে এবং আশেপাশের শহরে কোনো খদ্দের পাওয়া যায়নি এ কফিনের। লোকজন দরদাম করবে কী, কফিনের কারুকাজ দেখেই দমে যায়। এজন্যেই রাজধানীতে কফিনটি নিয়ে আসা হয়। আর আমিও বোকার মতো কিনে ফেলি এটা।'

'তা এতই যখন ভয় পাচ্ছ,' চাপা ভর্ৎসনা ইয়াজদানীর কণ্ঠে, 'ওই রিপন না-কি, তার কাহিনী শোনার পর ফিরিয়ে দিলেই পারতে এটি।'

'টাকা-পয়সা ক্লিয়ার করে একবার কিনে ফেলেছি। তারপর আবার ফিরিয়ে দিই কী করে? তবু একবার ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভাবলাম...'

'কী ভাবলে?'

'আপনি তো আবার হরর-সিরিয়াল বা ফিল্মে আসল জিনিসটাকেই বেশি প্রাধান্য দেন। 'কাটাহাত' সিরিয়ালে যেমন ঘটেছিল, স্যার। এজন্যেই শেষপর্যন্ত নিয়ে এলাম। ভালো করিনি, স্যার?'

'হুঁ,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ইয়াজদানী। তাঁর বুঝতে আর বাকি নেই, রিপন নামের এই কফিন বিক্রেতাই নূরের সেই বন্ধু। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে লালটুকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'রিপন ছেলেটির বাড়ি কি টাঙ্গাইলে?'

'আপনি কী করে জানলেন, স্যার?' কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল লালটুর চেহারা।

'জানি না। আন্দাজ ঢিল ছুঁড়লাম আর কী।'

'ওহ্, তাই বলেন, স্যার। আমি তো ভাবলাম...'

'কী ভাবলে?'

'না, কিছু না, স্যার।'

'আচ্ছা, আসিফ নূর নামে কাউকে চেনো তুমি?'

'আসিফ নূর!' আকাশ থেকে পড়ল যেন লালটু। 'কই, না তো! এমন নামের কারও সাথে পরিচয় নেই আমার!'

ইয়াজদানী আর কোনো কথা না বলে চোখ বুজে আপন ভাবনায় ডুব দিলেন। লালটু ছেলেটিকে তিনি যদ্দূর জানেন, সে নিঃসন্দেহে করিতকর্মা। শুটিঙের সময় অসাধ্য সাধনের মতো অনেক দুর্লভ উপকরণের যোগান দিয়েছে সে। কিন্তু টাকা-পয়সার প্রতি কিছুটা লোভ আছে তার। আর এজন্যে ছোটখাটো ছলচাতুরীর আশ্রয়ও নিয়ে থাকে। এর আগেও দু-চারবার প্রমাণ মিলেছে। বলা যায় না, এই কফিনটা তাঁর কাছে গছিয়ে দেয়ার জন্যেই একটা চাল চালছে সে। আসিফ নূর নামের ছেলেটি হয়তো তারই সাজানো কোনো চরিত্র। হরর-সিরিয়ালের সাথে দীর্ঘদিন ধরেই লালটু জড়িত। কাজেই এ ধরনের একটা কাহিনী দাঁড় করানো তার কাছে তেমন কঠিন কিছু নয়। আসিফ নূর কিছু টু-পাইসের বিনিময়ে একটা গল্প ঝেড়ে গেল তাঁর কাছে। আর লালটু এসে কফিনটা নিয়ে এমন কাহিনী ফাঁদল, তাতে বোঝা গেল— নূরের সাথে তার কোনো যোগসূত্র নেই, অথচ তিনি ঠিকই বুঝলেন— নূরের সেই রিহার্সাল-রুমের কফিনই এটা। আর এতে কফিনটার প্রতি তাঁর কৌতূহল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

এদিকে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, পুরনো ঢাকার যে বাড়িতে তিনি থাকেন, সেটার দোতলায় তাঁর বেডরুমের ঠিক পাশেই প্রপস-রুম। এখানে হরর-নাটক বা ফিল্মের জন্যে দুর্লভ কিছু প্রপস রাখা আছে। মুখোশ, কঙ্কাল, পোশাক— আরও অনেক কিছুই সযত্নে সংরক্ষিত। দরজায় কোনো খড়খড়ি নেই। লালটু এখান থেকেই গল্পটার থিম পেয়েছে। আর লালটুর ধড়িবাজির বড় প্রমাণ হচ্ছে, রিপনের বাড়ি টাঙ্গাইল ধরে ফেলায় তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া। ওই মুহূর্তে সে নির্ঘাত ঠাওরেছিল, তার চালবাজি বুঝি সবই টের পেয়েছেন তিনি।

তবে লালটুর ধড়িবাজিতে রুষ্ট না হয়ে বরং মুগ্ধই হলেন ইয়াজদানী। এত সুন্দর গল্প নিয়ে হতচ্ছাড়া বসে আছে কেন?

ইয়াজদানী ঠিক করলেন, লালটুকে বলে দেবেন— তার এরকম কফিনের দরকার নেই আপাতত। কিন্তু পরক্ষণে নিজের মুখ-বিকৃতি আর মরকত আলীর সর্প-দর্শনের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর বিকৃত মুখ দেখে খানিক আগে লালটু নিজেই তো

আঁতকে উঠেছিল। তবে কি নূরই আসলে কোনো ম্যাজিশান?

কফিনটার প্রতি সহসাই তীব্র একটা আকর্ষণ অনুভব করলেন বাহলুল ইয়াজদানী। লালটু ওটা নিয়েই যখন এসেছে, দেখাই যাক না— কী রহস্য আছে কফিনটার ভেতর?

পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা সবসময় সাথেই থাকে ইয়াজদানীর। তিনি লালটুকে কফিনের দাম বাবদ আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'যাও, ওটা আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসো।'

টাকাটা হৃষ্টচিত্তে পকেটে পুরে লালটু দাঁত বের করে বলল, 'নিচে গিয়ে কফিনটা একবার দেখবেন না, স্যার?'

'এখন ওই কফিন-টফিন দেখার মনমানসিকতা নেই। তুমি ওটা নিয়ে আমার প্রপস-রুমে রেখে এসো। পরে দেখব একসময়।'

লালটু চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই বড্ড ক্লান্তি অনুভব করলেন ইয়াজদানী। এরই মধ্যে চারটে বেজে গেছে। গত কয়েকটি ঘণ্টা ধরে নার্ভের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল যাওয়ায় ঝিমুনি এসে গেছে। মরকত আলীকে ডেকে তিনি কড়াভাবে বলে দিলেন, 'আমি একটু বিশ্রাম নেব। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও আমাকে যেন কেউ ডিস্টার্ব করতে না আসে।'

এরপর ইজিচেয়ারে গিয়ে গা ছেড়ে দিলেন ইয়াজদানী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। একটানা তিনঘণ্টা ঘুমোলেন তিনি। ঘুম ভাঙল বিকট দুঃস্বপ্ন দেখে। দেখেন, এক মুণ্ডুকাটা ধড় পিছু নিয়েছে তাঁর। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই ভোজবাজির মতো হাজির হয় সেই মুণ্ডুকাটা।

দুঃস্বপ্ন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামালেন না ইয়াজদানী। এরকম দুঃস্বপ্ন তিনি প্রায়ই দেখে থাকেন। আর আজ এই দুঃস্বপ্ন দেখার যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে।

মরকত আলীকে বিদায় দিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলেন তিনি। ঘড়িতে এখন সাতটার মতো বাজে। রাস্তায় এসে কিছুটা অবাক হলেন ইয়াজদানী। মাঝারি ধরনের কালবৈশাখী বয়ে গেছে গোটা শহর জুড়ে। অথচ কিছুই জানেন না তিনি। ইলেকট্রিসিটি না-থাকায় হরর-ফিল্মের মতোই ভূতুড়ে লাগছে পথঘাট। নিজের পুরনো মডেলের কাছিম-গাড়িটা নিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ তাঁর মনে হল, সত্যিই যেন কোনো হরর-মুভির রোমহর্ষক দৃশ্যে অভিনয় করছেন তিনি।

সূত্রাপুরের হরিদাস লেনের এক আদ্যিকালের বাড়িতে বাস করেন ইয়াজদানী। নিচতলায় কেউ থাকে না। এমনি খালি পড়ে আছে। দোতলায় একাই থাকেন তিনি।

দোতলায় গিয়ে ঘরদোর সব খোলা পেলেন ইয়াজদানী। লালটুকে বলেছিলেন কফিনটা রেখে দোতলায় তালা লাগিয়ে চাবিটা যেন দরজার বাঁ-পাশে ইঁটের তিনটে ফোকরের কোনো একটায় রেখে যায়। কিন্তু তালা না দিয়েই ভেগেছে সে। খুব সম্ভব

ঝড় শুরু হওয়ায় তালা দেয়া পর্যন্ত তর সয়নি তার। আর কফিনটাসহ ঝড়ের সময় বাড়িতে একা থাকতেও হিম্মতে কুলোয়নি।

নিজের ঘরে গিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে চার্জারটা জ্বাললেন ইয়াজদানী। ঠিক তখুনি পাশের ঘরে হুটোপুটির শব্দ পেলেন তিনি। যেন তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে ঘরটায়।

চার্জার হাতে বেরিয়ে এলেন ইয়াজদানী। পাশের ঘর, মানে প্রপস-রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তবে কি লালটু রয়েই গেছে ঘরটায়?

'কে, লালটু নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরটা। ইয়াজদানী আবার শুধোলেন, 'কে, লালটু?'

'জ্বি না, স্যার। আমি।'

কণ্ঠস্বরটা পরিচিতই মনে হল ইয়াজদানির। কিন্তু সহসা চিনতে পারলেন না। জানতে চাইলেন,

'আমি কে?'

'দেখলেই চিনবেন।'

'তাহলে দেখি সুরতখানা। দরজাটা খোলো।'

'আগে একটু খুঁজে দেখি জিনিসটা।'

'কী জিনিস?'

'শুনলে ভয় পাবেন, স্যার। অজ্ঞানও হইতে পারেন।'

'তবু শুনি।'

'মুণ্ডু খুঁজি, স্যার। সাইজ মতো— মানে আসল মুণ্ডু পাইতেছি না।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডুই তো বুঝতে পারছি না। আবার মুণ্ডু খোঁজো! এখানে মুণ্ডু আসবে কোত্থেকে?'

'থাকতেও তো পারে।'

'না, এখানে কোনো মুণ্ডুফুণ্ডু নেই। আর তুমি যেই হও, তোমার সুরতখানা আগে দেখি।'

'সুরতখানা দেখার আগে পরিচয়টা দিয়াই ফেলি, স্যার। আমি সেই ম্যাজিশান। যার মুণ্ডু কাটা হইছিল।'

'মুণ্ডুকাটা হলে তুমি কথা বলো কী করে?'

'কথা কি আর নিজের মুখ দিয়া বলি, স্যার। অন্যের মুণ্ডু ফিট করে করেই তো এই পর্যন্ত আসলাম। কিন্তু সাইজমতো একটাও পাইতেছি না, স্যার। এর আগে এক ফাজিল লোকের মুণ্ডু লাগাইছিলাম। ওই বেটার মাথায় খালি লোকজনের বেকায়দায় ফেলার চিন্তা। এইবার পাইছি একজন ক্রিয়েটিভ লোকের মুণ্ডু। এর মাথায় কোনো বদচিন্তা নাই।'

'কিন্তু তোমার মুণ্ডু কাটা হল কেন?'

'নারীঘটিত ব্যাপার, স্যার। ওই বাড়ির এক সুন্দরী মেয়েকে পটিয়ে ফেলেছিলাম। তারই শাস্তি, স্যার। বড়কর্তা নিজে হাজির ছিলেন আমার মুণ্ডু কাটার সময়। কিন্তু ওটা যে কোথায় গাপ করা হল—আজ পর্যন্তও হদিস পেলাম না।'

'কিন্তু তুমি এত জায়গা থাকতে আমার এখানে মুণ্ডু খুঁজতে এসেছ কেন?'

'এই কফিনটার জন্যেই আমার আসা, স্যার। কফিনটা যেখানে যাবে, সেখানে যে আমাকে যেতেই হবে, স্যার! এটাই তো আমাদের প্রচলিত নিয়ম।'

'তোমার কচকচানি অনেক শুনেছি।' বিরক্তি চরমে উঠেছে ইয়াজদানীর। 'এবার ভদ্রলোকের মতো বেরিয়ে এসো। ভূতুড়ে কাজকারবার নিয়ে থাকি বলে নিরেট বুদ্ধ ঠাওরেছ—না? পেঁদিয়ে তামাশা বের করে দেব। ফটকাবাজ কোথাকার!'

ঠকাস্ করে দরজার হুড়কো খুলে গেল। ফাঁক হল কবাট। চার্জারের আলোতে ইয়াজদানী পরিষ্কার দেখতে পেলেন আসিফ নূরকে। লাজুক হাসি নিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। এজন্যেই কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা লেগেছে।

'কদ্দিন ধরে আছ এ পেশায়?' ভুরু নাচিয়ে ঘৃণা ছুড়ে দিলেন ইয়াজদানী।

'আমি ফটকাবাজ নই, স্যার। আপনার মুখ-বিকৃতি আর মরকত আলীর সাপ-দেখায় কি আমার কথার সত্যতা প্রকাশ পায়নি?'

আচম্বিতে এই প্রশ্নের মোক্ষম উত্তরটা পেয়ে গেলেন ইয়াজদানী। বললেন, 'সম্মোহনী শক্তি বলে যে মনের ওপর প্রভাব খাটানোর একটা বিদ্যা আছে, সেটা কিন্তু আমার অজানা নয়। তা বিদ্যেটা ভালোই রপ্ত করেছ, বাপু!'

'সম্মোহনী-শক্তি না কি—খুব ভালো করেই টের পাবেন!'

এই বলে ইয়াজদানীর চোখের সামনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে গেল নূর। ইয়াজদানী পরিষ্কার উপলব্ধি করলেন, ছেলেটাকে পাকড়াও করে পুলিশে দেয়া দরকার। কিন্তু তাঁর হাত-পা কোনো কথাই শুনল না। তিনি একই সঙ্গে হঠাৎ টের পেলেন, ছেলেটি আবারও সম্মোহন করেছে তাঁকে।

পরদিন একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙল ইয়াজদানীর। বিছানা ছেড়েই পত্রিকা দেখা তাঁর রোজকার অভ্যেস। দৈনিক ইত্তেফাকের পাতা ওল্টাতে গিয়ে ভেতরের পাতায় একটা ছবি দেখে রীতিমতো হোঁচট খেলেন তিনি। ছবির নিচে লেখা—

তরুণ ছড়াকারের মর্মান্তিক মৃত্যু।

গতকাল বিকাল চারটার দিকে কাকরাইলের মোড়ে একটি দ্রুতগামী জীপ পিছন হইতে একটি রিকশাকে ধাক্কা মারিলে, রিকশা-আরোহী প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ছড়াকার আসিফ নূর ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনায় তাঁহার মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এবং মাথাটি রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়া যায়। পরে নিহতের সাথে পাওয়া কাগজপত্র ও ছবি হইতে তাঁহাকে আসিফ

নূর বলিয়া শনাক্ত করা হয়। পুলিশ লাশটিকে ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করিয়াছে এবং এ ব্যাপারে মতিঝিল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। তবে ঘাতক জীপটিকে এখনও আটক করা সম্ভব হয় নাই। উল্লেখ্য যে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রিকশাচালক বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়িতেছে।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

রুমমেট

পাইন ভ্যালি অ্যাকাডেমি ফর ইয়ং লেডিস থেকে আলথিয়া বেনেডিক্টের চিঠি নিউইয়র্কের মিসেস ওয়ার্ডসওয়ার্থ বেনেডিক্টের কাছে :

আমার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলে তুমি। তবে গতকাল মিস অ্যানেটলি তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে নাকি থাকতে হবে আমাকে।

আমার রুমমেট ভিডা সম্ভবত মিস লী-র পুরানো বন্ধু, লুইজিয়ানার ধনী জমিদার ফেলিক্স ডি মনসেরির একমাত্র মেয়ে। মিস লী-র বিশ্বাস আমি আমার নতুন রুমমেটের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারব। তবে ভিডার খুঁত বা দোষ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটি। তাঁকে খুব বিরক্ত মনে হল। বললেন আমার ব্যবহারে তিনি বেশ সন্তুষ্ট; আমার সঙ্গী যদি আমাকে কোনো কারণে জ্বালাতন করে তা হলে যেন সাথে সাথে তাঁকে জানাই। তাঁকে এমন অস্থির লাগছিল, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারছিলেন না। বুঝলাম না ভিডাকে নিয়ে তিনি কোনো সমস্যায় আছেন কিনা।

তবে এখন পর্যন্ত আমার নতুন রুমমেটকে ভালোই মনে হচ্ছে। ওর বাবা খুব ভালোমানুষ আর আমাদের ঘরটিকে প্রতিটি মেয়ে ঈর্ষার চোখে দেখছে। তোমাকে আরও আগে লিখতাম, মা, কিন্তু ঘর গোছাতে সময় লেগে গেল। ভিডা নিজের পছন্দ আর রুচি অনুযায়ী ঘর সাজাতে চাইছিল। বলল নিজের মতো করে ঘর সাজাতে না পারলে ওর নাকি খুব অস্বস্তি হবে। এতে অবশ্য আমার কিছু মনে করার নেই, কারণ ডেকোরেশনের সমস্ত খরচাই ও বহন করছে। আমি বাধা দিইনি। ভিডা নিজের মতো করে অদ্ভুতভাবে সাজিয়েছে ঘর; কমলা আর ম্লান সবুজ রঙের শেড আর রাশি রাশি কুশন দিয়ে। ওর নাকি কুশনের স্তূপের মধ্যে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে, বেড়ালের মতো।

ওকে যদি তুমি দেখতে! ওকে যে দেখবে সে-ই তাকিয়ে থাকবে। ওর চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে শাদা। লিপস্টিক মাখা টকটকে লাল ঠোঁট, কালো চুল আর চোখ— এমন অদ্ভুত চোখ জীবনেও দেখিনি। সরু, লম্বা, ঝুলে

পড়া চোখের পাতা, ঘুম ঘুম একটা ভাব— এমন অদ্ভুতভাবে তাকায় আমার দিকে। চোখের মণি ম্লান সোনালি-বাদামি, আমার কাছে মাঝে মাঝে হলুদ লাগে। সাঁঝবেলায় ওর চোখের পাতা ঝকঝক করে জ্বলে লক্ষ করেছি, চোখের মণিতে ফুটে ওঠে সরু, হলুদ একটা বৃত্ত; মনে হয় মানুষ নয়, বেড়ালের চোখ দেখছি।

এডগার ভাইয়া মিশর থেকে আনা নেকলেসটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে বলেছিল। কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিও। আমার বান্ধবীদেরকে নেকলেসটার কথা বলেছি। ওরা ওটা দেখার জন্য মরে যাচ্ছে।

তোমার আলথিয়া

প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

...পড়াশোনা চলছে বেশ ভালোই। নতুন কিছু ঘটেনি, শুধু আমার রুমমেটের দু-একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছাড়া। মিস লীকে ঘটনাটা জানাবার আগে তোমাকে লেখা সমীচীন মনে করছি। তবে এসব আমার কল্পনাও হতে পারে।

ভিডা সত্যি খুব আজব প্রকৃতির মেয়ে, মা। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ওই অদ্ভুত চোখজোড়া দিয়ে সে অন্ধকারে দেখতে পায়। এমনটি ভাবার কারণ— তুমি জানো আমি আসবাবপত্র একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে রাখতে পছন্দ করি। সেদিন ঘরের সবগুলো আসবাব একটু এদিক-ওদিক করে রাখলাম। ভিডা তখন ঘরে ছিল না। ফিরল হোস্টেলের বাতি নেভানোর ঘণ্টা পড়ার কিছুক্ষণ পরে। আমার তখন ঘুমে দুচোখ ভার, ওকে সাবধানে ঘরে ঢোকার কথা বলার সময়ও পাইনি।

মা, কী বলব, ভিডা এমনভাবে ঘরে ঢুকল যেন আঁধারেও সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা চেয়ার-টেবিলগুলোতে সামান্য ধাক্কাও লাগল না। দিব্যি হেঁটে এল ওগুলোর মাঝখান দিয়ে। আমার গা কেমন ছমছম করে উঠল। আমি বালিশের কাভারে মুখ লুকিয়ে ওকে লক্ষ করছিলাম। মনে হচ্ছিল অন্ধকারে ও আমাকে দেখছে। তুমি হয়তো এ জায়গাটা পড়ে হাসছ, কিন্তু আমার তখন হাসি পাচ্ছিল না। বরং এখনও ভাবতেই শিরশির করে উঠছে গা। ভিডা তো জানত না ঘরের আসবাব ওলটপালট করে রাখা হয়েছে, অন্ধকারে দেখতে পেয়েছে বলেই কোনোকিছুর সাথে সে ধাক্কা খায়নি বা আছাড় খেয়ে পড়েনি।

কাল রাতে আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ময়লা ফেলার ঝুড়িতে বোধহয় রুটি-টুটি ফেলা হয়েছিল, ইঁদুর ঢুকেছিল ওতে, টের পেয়েছি। আলো জ্বালব, শুনতে পেলাম বিছানা থেকে নামছে ভিডা, এগোচ্ছে ঘরের কোণে। আলো জ্বেলে দেখি ময়লা ফেলার ঝুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে একটা ইঁদুর। ইঁদুরটা

মরা! ওকে এমন অস্বাভাবিক লাগছিল আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ভিডা'। লাফিয়ে উঠল সে, ফেলে দিল হাতের জিনিসটা, একছুটে বিছানায়। আলো জ্বালায় ও বোধ হয় বিরক্ত হয়েছিল। পরে, অন্ধকারে ওর কান্নার আওয়াজও শুনেছি, তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

মা, ব্যাপারটা তোমার কাছে ভূতুড়ে মনে হচ্ছে না? মিস অ্যানেট ঘটনাটি শুনলে কী বলবেন বুঝতে পারছি না। আমার বলতেও ইচ্ছে করছে না। কারণ এর মধ্যে নালিশ করার মতো কিছু আছে কি?

...এডগার ভাইয়া কবে নেকলেস পাঠাবে?

প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

...একটি ঘটনা ঘটেছে যার সঙ্গে ভিডার সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে মিস অ্যানেটকে ঘটনাটি জানাতে চাই না আমি। আমার ধারণা শুনলে উনি হাসবেন, বলবেন কল্পনার জগতে বাস করছি আমি।

সেদিন কী যেন নিয়ে ভিডার সঙ্গে নাটালি কানিংহামের কথা কাটাকাটি হয়। ভিডার যুক্তিই সম্ভবত ঠিক ছিল বুঝতে পারার পরেও নাটালি তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে। ভিডা তার দিকে সেই অদ্ভুত, সোনালি জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়েছিল, ঠোঁট কামড়াচ্ছিল শুধু, বলেনি কিছু।

পরে আমাকে ভিডা বলল, 'তুমি জানো আলথিয়া, নাটালির কপালে খারাবি আছে?' একথা শুনে আমি অবাক। ভিডা তখন দ্রুত বলতে লাগল, 'অদৃশ্য কোনো অভিভাবক সবসময় আমার ওপর নজর রাখে, আলথিয়া, কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে জেনে যায়। আমি লক্ষ করেছি কেউ আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে উল্টো সেই বিপদে পড়ে যায়। তাই কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হলে ভয় লাগে আমার। কারণ আমি যদি নিজেকে— মানে আমার ভেতরের মানুষটা যদি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠে, যে আমার সঙ্গে লাগতে আসে, ঝামেলায় পড়ে যায়।'

আমি ওর কথা বিশ্বাস করিনি। বলেছি ও আসলে বোকা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওর মন। কিন্তু মা, ওই রাতেই নাটালি কানিংহামের পোখরাজের সুন্দর আংটিটি হারিয়ে গেল। নাটালি ঘরের বাতি নেভানোর পাঁচ মিনিট পরেই ড্রেসিং টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় ওটা। নাটালি রুমমেটকে দরজা খুলে দিতে উঠেছিল। আলো জ্বালিয়ে দেখে আংটি নেই।

অথচ দরজা বন্ধ ছিল; জানালা খোলা থাকলেও ওটা তিনতলার জানালা, আমাদের বেশির ভাগ ডরমিটরির জানালার নিচে কোনো ব্যালকনিও নেই।

রহস্যময়, তাই না? আমাদের ফ্লোর মনিটর মিস পুরির ধারণা নাটালির আংটি নিশ্চয় মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাটালি অনেক খুঁজেছে। পায়নি। ওর আংটি

কে নিল? কীভাবে? নাটালি এমন ভয় পেয়েছে বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে পারে না।

আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্যের মনে হয়েছে— মেয়েরা যখন আংটি হারানোর গল্প করছে, ভিডা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে ওর সেই 'অদৃশ্য অভিভাবক' এই আংটি চুরি করেছে নাটালিকে শাস্তি দিতে। নাটালি যে ভিডাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে! তোমার ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়? ভিডাকে তোমার কল্পনাপ্রবণ মনে হয় না? আমার নেকলেসের কী হল?

প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

...আমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছি যে গুছিয়ে লিখতেও পারছি না। কাল রাতের ঘটনা নিয়ে গোটা স্কুলে হুলস্থুল কাণ্ড চলছে। অন্যদের চেয়ে ঘটনাটা আমাকে বেশি প্রভাবিত করছে, কারণ ভিডা নিজের সম্পর্কে যা বলেছিল তা বোধহয় সত্যি। ওর সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তার কপালে খারাবি থাকে। আমি নার্ভাস বোধ করছি, ভয় লাগছে কোনো কারণে ভিডা যদি আমার ওপরে রেগে যায়। বুঝতে পারছি না মিস অ্যানেটকে সব কথা খুলে বলব কিনা; উনি হয়তো ব্যাপারটা আমার কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। তুমিই বলো এখন আমার কী করা উচিত?

গতকাল সকালে ভিডার নিগ্রো দাইমা জিনি, একে পাইন ভ্যালিতে পাঠানো হয়েছে ভিডার দেখাশোনার জন্য, এসেছিল ওর জামাকাপড় নিতে। মিস পুরিও ওইসময় ঢুকেছে আমাদের ঘরে। ভিডা তখন ওর নোংরা জামাকাপড়গুলো বাছাই করছে, মিস পুরি ওকে সাহায্য করতে চাইল।

জিনিকে দেখলাম হঠাৎ কেঁপে উঠল। ভিডার দিকে একমুহূর্ত তাকাল কটমট করে। ভিডাও তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার চোখে দপ করে জ্বলে উঠেছে হলুদ আগুন। মিস পুরিকে সে ক্রুদ্ধ গলায় নিজের কাজে যেতে বলল, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করল।

মিস পুরি তো রেগে আগুন। (এজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ভিডা খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে।) মহিলা ভিডার কাঁধ খামচে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। ভিডা কিছু বলল না বটে, তবে এমন ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফ্লোর মনিটরের দিকে, সভয়ে পিছিয়ে গেল সে দুকদম।

'তোমার জন্যে আমার করুণা হচ্ছে, মিস পুরি,' বলল ভিডা তাকে। 'আমার গায়ে হাত তোলার পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে। সম্ভব হলে তোমাকে বাঁচাতাম— কিন্তু পারব না।'

মিস পুরি কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভিডা জামা-কাপড়গুলো তুলে দিল জিনির হাতে। নিগ্রো মহিলা চলে যাবার পরে বিছানায় কাঁপিয়ে পড়ল ভিডা,

ঘণ্টাখানেক কাঁদল অঝোরে। বলল মিস পুরির জন্য তার কষ্ট হচ্ছে। ওর কথার অর্থ তখন বুঝতে না পারলেও গত রাতে–

রাত দুটোর দিকে গোটা ফ্লোর জেগে গেল ভয়াবহ এক আর্তনাদে। চিৎকার করছে মিস পুরি। আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম বিছানা থেকে, দৌড়ে গেলাম হলঘরে। ওখানে অনেক মেয়েকে দেখলাম, ছুটে এসেছে যে-যার ঘর থেকে। দৌড়ালাম মিস পুরির ঘরে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পরে দরজা খুলে দিল সে।

মা, সে যে কী ভয়াবহ দৃশ্য! মিস পুরির মুখ, হাত ফালাফালা হয়ে গেছে কামড় আর আঁচড়ে, ভেসে যাচ্ছে রক্তে। থরথর করে কাঁপছিল মহিলা। বলল কী একটা বুনো জানোয়ার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে, হামলা চালায় তার উপর। অবাক ব্যাপার হল, জানোয়ারটা— যদি সত্যি ওটা জানোয়ার হয়ে থাকে— আমরা হলঘরের দরজা খোলার আগে কী করে তার ঘরে ঢুকল এবং বেরিয়ে গেল? মিস পুরির ঘরের জানালা খোলা ছিল, কিন্তু এটা তিনতলা দালান আর আশপাশে কোনো গাছও নেই যে কোনো প্রাণী গাছ বেয়ে উঠে তার ঘরে লাফিয়ে ঢুকবে।

মিস পুরির এমন দশা হয়েছে, আজ সকালে মিস অ্যানেট আমাদেরকে চ্যাপেলে ডেকে নিয়ে বলেছেন সে কয়েকদিন স্কুলে আসবে না, নার্ভাস শকটা কাটাতে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবে। আজ সবার আলোচনার বিষয় ছিল এই রহস্যময় ঘটনা, বুঝতেই পারছ। এখন ঘটনার অদ্ভুত অংশটা বলছি তোমাকে।

ঘরে ফিরে দেখি ভিডা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এত হৈ-হট্টগোলেও তার ঘুম ভাঙেনি। ঘুমাতেও পারে বটে মেয়েটা। আমি ওকে জাগিয়ে তুললাম। বললাম ঘটনা।

মা, বাকি রাতটা সে জেগে রইল আর ভয়ানক কান্নাকাটি করল। বলল সব নাকি তার দোষ, যদিও এতে তার কোনো হাত ছিল না। ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বলল ওর 'অদৃশ্য অভিভাবক' হামলা চালিয়েছে মিস পুরিকে, অনুরোধ করল আমি যেন কাউকে একথা না বলি। অবশ্য মিস অ্যানেটের কাছে একথা বললে হয় তিনি ভিডাকে পাগল ঠাওরাবেন অথবা আমাকে বোকা ভাববেন।

আমি ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। তবে ঘরের বাতি জ্বালানোই থাকল। শুধু আমি নই; বাকি রাতটা মেয়েরা সবাই তাদের ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখল।

কাকতালীয় ঘটনাগুলো অদ্ভুত, না, মা? নাটালি ভিডার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার পরে রহস্যময়ভাবে তার আংটি গায়েব হয়ে গেছে। মিস পুরি ভিডাকে খেপিয়ে তোলার পরে শারীরিকভাবে হামলার শিকার হয়েছে। কিন্তু যতই কাকতালীয় হোক ঘটনা, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই যে কেন একটা বনবেড়াল ভিডার পক্ষ নিয়ে মিস পুরিকে কামড়ে দেবে! আছে কি? মিস অ্যানেটকে ঘটনাটা বলব কিনা সে ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাইছি। তাড়াতাড়ি লিখো।

তোমার কথামতো ঘটনাটা বলেছি মিস অ্যানেটকে। উনি এ ব্যাপারে অন্য মেয়েদেরকে কিছু বলতে নিষেধ করেছেন। জানিয়েছেন ভিডাকে নিয়ে নাকি আরও কয়েকটি স্কুলে এরকম রটনা হয়েছে। শেষে কোনো স্কুলেই ভিডাকে ভর্তি করতে পারছিলেন না ওর বাবা। ভিডা ডি মনসেরো যার উপরেই অসন্তুষ্ট হয়েছে তার জীবনেই অশুভ ঘটনাটা ঘটেছে। যদিও ভিডা বলে সে কিছু করেনি কিন্তু তার কারণেই ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে অস্বীকারও যায় না।

মিস অ্যানেট জিজ্ঞেস করেছেন আমি একা থাকতে চাই কিনা। ভিডা আমার কোনো ক্ষতি করেনি, তা ছাড়া ঘরটিকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে ও! আমি ওর সঙ্গেই থাকব বলে দিয়েছি। মিস অ্যানেট খুশি হয়েছে। ...তুমি বলোনি কেন এডগার ভাইয়া এসেছে? আমার সঙ্গে রিসেপশন রুমে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন শুনে নিচে গিয়ে দারুণ অবাক হয়েছি!

ভাইয়া চেইনটা আমাকে দিয়েছে। মা, খুবই সুন্দর আর দামি জিনিসটা! তুমি দেখেছ? ছোট ছোট অনেকগুলো বেড়াল খোদাই করা চেইনে, মুখে লেজ গুঁজে রেখেছে, লকেটটা জেড-পাথরের, বড় একটা বেড়ালের মূর্তি ওতে, চোখজোড়া পোখরাজ পাথরের। মেয়েরা নেকলেস দেখে তো পাগল, বিশেষ করে ভিডা। আমাকে ধরে বসেছে আমি যেন ওর জন্য আরেকটা নেকলেস আনিয়ে দিই।

এডগার ভাইয়া একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছে। চেইনটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছে আমাকে কসম খেতে হবে তার অনুমতি ছাড়া এটা আমি কখনোই খুলব না। এরকম কথা বলার কারণ কী? জিজ্ঞেস করলে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়েছে ভাইয়া, বলেছে তোমাকে লেখা কয়েকটি চিঠি পড়েছে সে। আমার চিঠির সাথে বেড়াল-মার্কা চেইন গলা থেকে না-খোলার কসম খাওয়ার সম্পর্ক কী?

কাল এসেছিল সে আমাকে নিয়ে লংড্রাইভে যাবার জন্য। রিসেপশন রুমে ঢুকেই সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝট করে থুতনি উপরের দিকে তুলে বলল, 'এ ঘরে বেড়াল আছে। অথচ শুনেছি মিস অ্যানেট বেড়াল-টেড়াল পোষা পছন্দ করেন না।'

আমি জানি কোনো বেড়াল নেই, কিন্তু সে একই কথা বলতে লাগল বারবার আর ঘরের চারদিকে চোখ বুলাতে থাকল। আর তারপর— সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল, মা! আমরা আমাদের ঘরে ঢুকলাম। ভিডা ডি মনসেরো তখন ফায়ারপ্লেসের ধারে বড় একটি আর্মচেয়ারে ঘুমাচ্ছে। হাঁটু মুড়ে রেখেছিল সে, হাতজোড়া চেয়ারের দুই হাতলের উপরে ঝুলছে, থুতনি হাঁটুর উপরে ভর দেওয়া। যেন একটা বেড়াল ঘুমাচ্ছে আরামের ঘুম।

আমি এডগার ভাইয়াকে বললাম, 'এই যে তোমার বেড়াল।' তারপর হেসে উঠলাম।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল সে ভিডাকে। তারপর মৃদুগলায় আমাকে বলল, 'আলথিয়া, তুমি একটু বেশি কথা বলো। (তুমি তো জানো, মা, ভাইয়া সুযোগ পেলেই আমাকে ফোড়ন কাটে।) পুসির সাথে আলাপ করিয়ে দাও।'

আমি ঘুম থেকে জাগালাম ভিডাকে। বেড়ালের মতো গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে দেখে লজ্জাই পেল ভিডা। পরে আমাকে বলেছে এডগার ভাইয়াকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। এমন সুদর্শন পুরুষ নাকি সে কোনোদিন দেখেনি। ভাইয়াও মনে হয় ভিডাকে পছন্দ করে ফেলেছে। যদিও এ নিয়ে কোনো কথা বলেনি।

ভিডা ভাইয়ার কাছে জানতে চেয়েছে আমার মতো চেইন ভাইয়া তাকে জোগাড় করে দিতে পারবে কিনা। চেইনটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে।

'আলথিয়াকে পটিয়ে চেইনটা নিতে পারো কিনা দেখো। পারলে ওর জন্য আরেকটা চেইন এনে দেব।' ভিডা তখন এমন মিনতিভরা চোখে আমার দিকে তাকাল, আমার কেমন অস্বস্তি লাগল। নাটালি আর মিস পুরির কথা মনে পড়ে গেল। ভিডাকে চেইন না দিলে আমার জীবনেও কোনো ভয়ংকর ঘটনা ঘটে কিনা কে জানে।

আমি সরাসরিই জানতে চাইলাম, 'তোমাকে চেইন না দিলে আমার কী হবে, ভিডা?'

'কিছুই হবে না, আলথিয়া, ডার্লিং। কারণ তোমার উপরে আমি কখনোই রাগ করতে পারব না।' ফিসফিস করে জবাব দিল সে।

'তা হলে আর চেইনটা চেয়ো না দয়া করে,' অনুরোধ করলাম আমি। আমি এডগার ভাইয়াকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। ভিডা করুণ চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। বেচারি ভিডা!

...বুঝতে পারছি না আকর্ষণটা কিসের? এডগার ভাইয়া বলল এদিকে বেশ কিছুদিন থাকবে সে। আশা করি আলমা হেনিং-এর প্রেমে পড়েনি সে   মেয়েটাকে একদম সহ্য করতে পারি না আমি। তবে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়লেও সে নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করে প্রেম করবে না। বেল ব্রাগ ভাইয়ার প্রেমে পাগল আর নাটালির চোখে ভাইয়া অত্যন্ত রোমান্টিক পুরুষ।

ভাইয়া বুড়ো পিটারকে নিয়ে পাইন ভ্যালির ছোট হোটেলটিতে উঠেছে।

প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

...তোমাকে আগে এ ঘটনাগুলো লেখার সাহস করিনি কারণ— কারণ এমনই অবিশ্বাস্য সব ঘটনা! তুমি হয়তো ভাববে খুব বেশি পড়ার চাপে আমার মাথার গিটঠু পাকিয়ে গেছে। কিন্তু এডগার ভাইয়া তা মনে করে না এবং মাথাটা আমার কাঁধের উপরে ঠিক জায়গাতেই আছে। আর আমি যা ভেবেছি তা পুঙ্খানুপুঙ্খনভাবে তোমাকে লিখছি।

মা, ভিডা ডি মনসেরোর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে। তোমাকে আমি বলেছি মাঝে মাঝে ওকে কেমন বেড়ালের মতো লাগে, সে অন্ধকারে বসে থাকতে ভালোবাসে, আঁধারে ঘরে হাঁটতে ফিরতেও তার অসুবিধে হয় না।

সেদিন বাতি নিভে যাবার দশ মিনিট আগে আমি ঘরে ফিরেছি। আলো জ্বালার সময় ঘরে কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমার ডেস্কে গিয়ে দেখি একটা বড়সড় কচ্ছপ-খোলা বেড়াল জানালার ধারে, ভিডার আর্মচেয়ারে বসে অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙছে।

বিদ্যুৎচমকের মত মিস পুরির কথা মনে পড়ে গেল, আমি সভয়ে এগোলাম দরজার দিকে। হলঘরে পা দিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছি, আর— মা, বিশ্বাস করো বা না-ই করো— বেড়ালের কোনো চিহ্নও দেখতে পাইনি। আর্মচেয়ারে বসে, হলুদ চোখ মেলে, অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ভিডা ডি মনসেরো।

দরজার কাছে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলাম। তারপর বললাম, 'মাই গড, ভিডা, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। দেখতেই পাইনি কখন ঘরে ঢুকলে। বেড়ালটা কই?'

'বেড়াল?' হাই তুলল ভিডা। 'কিসের বেড়াল?' হাত উপরের দিকে তুলে অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল সে, তারপর নড়েচড়ে আরাম করে বসল কুশনে।

আমার খুব অবাক লাগছিল। তবে কি চোখে ভুল দেখলাম? ভিডা যেখানে বসে আছে ওখানটাতেই একটু আগে কালো-হলদে ছোপঅলা একটা বেড়াল বসে ছিল। বেড়াল নিয়ে আর কিছু বললাম না ভিডাকে আমাকে ঠাট্টা করবে ভেবে। কিন্তু যতবার বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছি, ততই মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে অবশ্যই ওখানে একটা বেড়াল ছিল।

তবে আর্মচেয়ারে বসে বেড়ালটা যখন আড়মোড়া ভাঙছে, ওই সময় ভিডা কোথায় ছিল? তা ছাড়া জানোয়ারটা ঘরে ঢুকলই বা কী করে? সে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আমি ঘরের চারপাশে ভালো করে চোখ বুলিয়েছি, যদিও ভিডাকে কারণটা বলিনি। ভান করেছি জিমনাশিয়ামে যাবার চপ্পলজোড়া খুঁজে পাচ্ছি না। যদিও চপ্পল সবসময় আমার লকারে থাকে। বিছানার নিচে এবং চারদিকে চোখ বুলানোর সময় মনে হয়েছে ভিডা হলুদ চোখ মেলে আমাকে লক্ষ করছে।

ঘটনাটা এডগার ভাইয়াকে বললাম। সে আবারও সাবধান করে দিল গলার চেইনটা যেন কখনোই না খুলি। এটা নাকি একধরনের তাবিজ, মন্দশক্তিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

তো, মা, এখন আবার আমাকে কম পড়াশোনা করতে বোলো না যেন! এডগার ভাইয়া কিন্তু আমাকে পাগল ভাবে না কিংবা বিকারগ্রস্ত মনে করে না। তুমিও মনে কোরো না!

প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

আজ সকালে এডগার ভাইয়া ফোনে জিজ্ঞেস করল গতরাতে কোনো মেয়ের কোনো কিছু হারিয়েছে কিনা। হারিয়েছে। গ্রেস ড্রিন তার লকেটসহ চেইনটি পাচ্ছে না। ভাইয়া জানতে চাইল লকেটে ঝুটো হিরে দিয়ে তার নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা ছিল কিনা! একথা সে জানল কী করে? বলছি।

গতরাতে ঘুম আসছিল না বলে হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছিল এডগার ভাইয়া। আমার ডরমেটরির পাশটা চাঁদের আলোয় তখন আলোকিত। ভাইয়া দেখল একটা বিরাট কচ্ছপ-খোলা বেড়াল বেরিয়ে এসেছে আমার ঘর থেকে। দালানটাতে খুবই সরু কার্নিশ আছে, জানালার নিচে, ইঞ্চি তিনেক হবে চওড়ায়। বেড়ালটা কার্নিশ ধরে হেঁটে এগোল, থামল গ্রেসের ঘরের জানালার নিচে, তারপর লাফ মেরে ঢুকে গেল ভিতরে। একটু পরে বেরিয়ে এল সে মুখে চকচকে কী একটা জিনিস নিয়ে!

এডগার ভাইয়া হিসহিস করে উঠল, 'ভাগ!' একমুহূর্ত দ্বিধায় যেন ভুগল বেড়ালটা, চমকে উঠল, মুখ থেকে জিনিসটা পড়ে গেল মাটিতে। ভাইয়া দেখল বেড়ালটা আমার ঘরের জানালার নিচে ফিরে গেছে, সে মাটি থেকে তুলে নিল জিনিসটা। ওটাই ছিল গ্রেসের লকেটসহ চেইন। বেড়ালটা গ্রেসের ঘর থেকে ওটা চুরি করেছে! এমন অবাক ঘটনা কখনও শুনেছ, মা? আমি বানরের কথা শুনেছি তারা লোকের জিনিস চুরি করে— কিন্তু বেড়াল!

এডগার ভাইয়া চেইনটা চিঠির খামে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রেসকে। খামের মধ্যে চুরি যাওয়া জিনিস ফিরে পেয়ে মেয়েরা যে কী অবাক!

তুমি এ ঘটনা থেকে কিছু আঁচ করতে পারলে? বেড়ালটা আমার ঘর থেকে বেরিয়েছে, আবার আমার ঘরেই ফিরে এসেছে! এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে সত্যি কোন তাল খুঁজে পাচ্ছি না।

ক্যাপ্টেন এডগার বেনেডিক্টের নোটবই থেকে

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি নিয়ে আলথিয়ার কাছ থেকে নানা অদ্ভুত তথ্য সংগ্রহ করার পরে আমি একটাই ক্লু খুঁজে পাই; এর পেছনে নিশ্চয়ই ভিডার নিগ্রো দাই মা জিনির হাত আছে। প্রতি মঙ্গলবার ভিডার কাছে যায় সে, তাই এক মঙ্গলবার সকালে অ্যাকাডেমির কাছে একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে দেখলাম বুড়ি তার কিশোরী মনিবনীর জামাকাপড় ধোলাই করার জন্য বেশ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। চেহরাটাও বেশ হাসিখুশি।

মহিলা বেশ লম্বা, দেখতে মন্দ নয়, সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ। ঝকমকে চোখজোড়া যেন চুম্বকের মতো, দারুণ সম্মোহক। মুখে অসংখ্য ভাঁজ, তবে সেটা বয়সের কারণে নয়। খুব বেশি চিন্তা করে বলেও চেহারায় বুড়োটে ছাপ পড়তে

পারে। হাইস্কুলের লোকজনের সামনে সে বিনয়ের অবতার, তবে লক্ষ করেছি স্কুলপ্রাঙ্গণের বাইরে আসার পরেই মুখোশ খুলে গেছে তার, বিরাট দেহ নিয়ে, মাথা সোজা করে লম্বা লম্বা কদমে হন হন করে হাঁটতে লেগেছে।

ভিড়ার জন্য পরিষ্কার জামাকাপড় নিয়ে এসেছিল মহিলা, আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে এল ময়লা কাপড়ের ঝুড়ি হাতে। স্কুলপ্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসার পরেই তার পায়ে যেন পাখা গজাল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে গেলাম আমি। মহিলা পাইন ভ্যালিতে এসে নিগ্রো কোয়ার্টার্সের দিকে এগোল, ঢুকল একটা বাড়িতে।

আমিও হাজির হলাম বাড়িটির সামনে। দরজায় কড়া নেড়ে বললাম জামা-কাপড় ধোলাইতে দিতে চাই। মহিলা কাজটা করবে কিনা। সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর নীরস গলায়, অত্যন্ত সংক্ষেপে বলল সে মাত্র একজনের জামাকাপড়ই ধোলাই করে। তারপর আমার মুখের উপরে বন্ধ করে দিল দরজা। এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার মধ্যে ভয়ংকর, অশুভ কী যেন একটা আছে। এর ঘৃণার পাত্র কখনোই হতে চাইব না আমি।

...দাইমা জিনির কুটির থেকে নৈশ-অভিযান শেষ করে মাত্র ফিরেছি। তার জানালার চৌকাঠ বা শার্সি ইঞ্চিখানেক ফাঁক ছিল। ওই ফাঁক দিয়ে বুড়ি ডাইনির কাণ্ডকারখানা সবই দেখতে পেয়েছি। কোনো সন্দেহ নেই স্কুলের রহস্যময় ঘটনার সাথে সে জড়িত।

ডাইনিদের জাদুমন্ত্র পড়ার দৃশ্য এর আগেও দেখেছি তবে এরকম দৃশ্য দেখিনি।

বুড়ি নিগ্রো ব্যাগ থেকে একটা জামা বের করল, সেইসাথে মাটিতে খসে পড়ল একটা এমারেল্ড রিং! আংটিটি নিশ্চয় নাটালি কানিংহামের। ভিডার ময়লা কাপড়ের মধ্যে ওটা গেল কী করে যদি সে নিজে আংটিটি লুকিয়ে না রাখে? ভিডা কি শয়তানী, নাকি কারও হাতের নিষ্পাপ খেলার পুতুল? জিনি এবার বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটি মোজা, ওটা ধরে ঝাঁকি দিতেই গড়িয়ে পড়ল অনেকগুলো আংটি, ব্রুচ, ব্রেসলেট, চেইন। আমি জুয়েলারির দোকান ছাড়া এত গহনা একসাথে অন্য কোথাও দেখিনি। গহনাগুলোর মধ্যে আংটিটি রাখল সে এবং ওটার দিকে তাকিয়ে রইল স্থিরচোখে। কিছুক্ষণ বাদে ওটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল। তারপর বিবর্ণ কুটিরের নোংরা মেঝেতে পায়চারি শুরু করল।

পায়চারি করার সময় বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল সে। মাঝে মাঝে হাত মোচড়াল। তার দু-একটা কথা শুনতে পেলাম আমি।

'আমার সোনা ভিডা— আমার ছোট্ট মিসি! আমাকে ক্ষমা করো, মিসি। তোমার বাবার অপরাধের দায় তোমাকে বইতেই হবে। আমি তাকে মাফ করব না!'

হঠাৎ উনানের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, প্রকাণ্ড একটা বেড়ালের মতো লাগল তাকে, জ্বলন্ত কাঠকয়লার দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। টানা দুটো ঘণ্টা ওভাবেই থাকল মহিলা, আমার মন চাইছিল ওখান থেকে কেটে পড়ি। তার সত্তার মধ্যে অশুভ কিছু একটার ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মানসিক শক্তি সৃষ্টি করছে সে, যেন সত্যিকারের একটা ডাইনি। খুবই অস্বস্তিকর একটা অবস্থার মধ্যে ছিলাম আমি, তবু নড়াচড়ার সাহস পাচ্ছিলাম না।

ওই বুড়ি, কচ্ছপ-খোলা বেড়াল আর ভিডার মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলে যে সন্দেহ আমার ছিল তা ক্রমে ঘনীভূত হচ্ছে। আলথিয়াকে আমার সন্দেহের কথা বলতে হবে। ওর সাহায্য দরকার।

...আমার পরিকল্পনায় চমৎকার কাজ হয়েছে। ভিডা বেড়াল-চেইন পেয়ে খুবই খুশি, বলল সে এটা কখনও গলা থেকে খুলবে না। আমি কাল রাতে নিগ্রো বুড়ির উপরে নজর রেখেছি আর আলথিয়া— আমার অনুরোধে লক্ষ রেখেছে ভিডাকে। বুড়ি জাদুমন্ত্র পড়ে ঘেমে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। ভিডা ওই সময়টাতে শান্তিতে ঘুমাচ্ছিল।

...আমি ঠিক সন্দেহই করেছি। আলথিয়া বলল জিনি বুড়ি অ্যাকাডেমিতে এসে ভিডাকে হুকুম করে বলল বেড়াল-চেইন খুলে ফেলতে। রাজি হয়নি ভিডা। জিনি বলছে চেইনটাতে নাকি 'খারাপ জাদু' আছে। কিন্তু বুড়ির কথায় কান দেয়নি ভিডা। বুড়ি এমন রেগে গেছে দুপদাপ পা ফেলে চলে যাবার সময় মাথা নুইয়ে 'বো' পর্যন্ত করেনি ভিডাকে। ভিডা তার চাকরানির এহেন আচরণে স্বভাবতই বিস্মিত।

...আলথিয়া সতর্কতার সাথে আমার নির্দেশ মেনে চলছে। সে ভিডার চোখ এড়িয়ে চেইনের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছে। ভিডা আমাকে চেইনটা মেরামত করে দিতে বলেছে। আলথিয়াই ওকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। আজ রাতে চেইনের নিরাপত্তা-বেষ্টনী থাকবে না ভিডাকে ঘিরে। আমি আলথিয়াকে বলে দিয়েছি আগের মতোই ভিডার উপর নজর রাখতে। বুড়িটা যে সত্যি ডাইনি এ-ব্যাপারে আমার আর সন্দেহ নেই।

...কাল সারারাত মন্ত্র নিয়ে মেতে থেকেছে জিনি। এবারে সফল হয়েছে সে। আলথিয়া আমাকে বলেছে কী ঘটেছে।

আলথিয়া দেখেছে বেড়ালটা ভিডার বিছানা থেকে জানালা গলে বেরিয়ে গেছে, ফিরে এসেছে মুখে একটা ব্রেসলেট নিয়ে। ভিডার লন্ড্রি-ব্যাগের মধ্যে ওটা ফেলে দিয়েছে। তারপর বেড়ালটা লাফিয়ে ওঠে ভিডার বিছানায়, আর— আলথিয়া দেখতে পায় ওখানে ঘুমিয়ে আছে ভিডা। বাকি রাত যে আর দুচোখের পাতা এক

করতে পারেনি মেয়েটা, বলাবাহুল্য।

এক মেয়ে বলল তার ব্রেসলেট হারিয়েছে। আলথিয়া ওটা আগেই ব্যাগ থেকে তুলে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। জানাল ব্রেসলেটটি সে হলঘরে পেয়েছে।

এসবের একটা সমাপ্তি ঘটানো দরকার। এ অবশ্যই জাদু। বুড়ি নিগ্রোর যা-ই উদ্দেশ্য থাকুক, সে নিষ্পাপ মেয়েগুলোকে এভাবে ঝামেলায় ফেলতে পারে না। আমি এ ঘটনার সমাপ্তি না টানতে পারলে ভিডাকে আসল ঘটনা বলে দেব। ওর কাকে এড়িয়ে চলতে হবে জানাব। ভয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য কবজ পরিয়ে দেব হাতে।

কাল রাতে দারুণ রোমাঞ্চকর একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি বুড়ো পিটারকে জিনির কুটিরে পাঠিয়েছিলাম গোয়েন্দাগিরি করার জন্য। বুড়ি কী করছে তার পূর্ণ বৃত্তান্ত চাই। আমি, মিস অ্যানেটের সাহায্যে একটি শক্ত দড়ির মই ঝুলিয়ে দিই আলথিয়ার জানালায়। ওইসময় দুই রুমমেটই ব্যস্ত ছিল ব্যায়ামাগারে। মই যাতে কারও চোখে না পড়ে সেজন্য উপরের অংশটা ঢেকে দিই বালিশ দিয়ে।

রাত দেড়টার দিকে প্রকাণ্ড একটা বেড়াল বেরিয়ে এল আলথিয়ার জানালা দিয়ে, সরু কার্নিশ বেয়ে হাঁটতে লাগল। (ওটা যদি পা ফস্কে পড়ে যায়? ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। ভাবতে এখনও কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে গা)। আরেকটা খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল জানোয়ার। আমি চট করে চলে এলাম জানালার নিচে, আলথিয়াকে ডেকে বললাম বেড়ালটা পাঁচ নম্বর জানালায় গেছে। আলথিয়া তক্ষুনি ওর ঘরের জানালা বন্ধ করে দিল, চলল বেল ব্রাগের ঘরে। ওই ঘরেই ঢুকেছে বেড়াল।

দুটি মেয়েই বেড়ালটাকে দেখল জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে। বেল তার ড্রেসিং টেবিলে তাকিয়ে দেখে হাতঘড়িটি অদৃশ্য। আলথিয়া বলল কোনো মেয়ে হয়তো ঘড়িটি নিয়ে গেছে, কাল সকালে ফেরত পাওয়া যাবে। বেল তার জানালা বন্ধ করল আর আলথিয়া ফিরে এল নিজের ঘরে। এদিকে আমি মই বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এসেছি আলথিয়ার জানালার নিচে। ওখানে, জানালার কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বেড়াল এসে দেখল জানালা বন্ধ। সে সামনের থাবা দিয়ে খামোকাই বন্ধ শার্সি খামচাল। খুলল না জানালা। আমি মেরামত-করা বেড়াল-চেইনটা ছুড়ে দিলাম বেড়ালটার গলা লক্ষ্য করে। কী ঘটবে মোটামুটি একটা ধারণা থাকলেও চোখের পলকে বেড়ালটাকে ভিডা ডি মনেসেরোতে রূপান্তরিত হতে দেখে ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম। অচেতন ভিডাকে চট করে ধরে ফেললাম হাত বাড়িয়ে।

জানালা খুলল আলথিয়া। দুজনে মিলে অজ্ঞান শরীরটাকে টেনে তুললাম, শুইয়ে দিলাম বিছানায়। আলথিয়াকে কোনো কথা বলতে নিষেধ করে বুড়ো

পিটারের কাছে ছুটলাম খবরের আশায়।

কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলেছিলাম পিটারকে। বুড়োকে নির্ধারিত জায়গায় দেখতে না-পেয়ে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। জানালার খড়খড়ি দিয়ে তাকালাম ভিতরে। দেখলাম বুড়ো পিটার উনুনের সামনে, মেঝেতে উবু হয়ে বসেছে, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে বুড়ি ডাইনিকে, মাথা তার কাঁধের উপরে!

শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। প্রচণ্ড জোরে দরজার কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে দিল পিটার। বুড়ো হারামজাদা আমাকে দেখে কোথায় লজ্জা পাবে আর সিঁটিয়ে যাবে ভয়ে, তা না, বরং ধবধবে শাদা দাঁত বের করে আকর্ণ হাসল। অবাক হয়ে দেখি বুড়ি জিনিও সিধে হয়েছে শিরদাঁড়া টানটান করে, পিটারের মতো তারও মুখে চওড়া হাসি।

আমি রীতিমতো হতভম্ব। তবু এরকম আচরণের ব্যাখ্যা চাইলাম। ওরা কতটুকু সত্যি বলেছে তা বোঝা মুশকিল তবে কাহিনী বেশ দীর্ঘ এবং এর সূত্রপাত বুড়ি নিগ্রোর যৌবনকালে।

বুড়ি এবং পিটার দুজনেই ভিডার দাদার ক্রীতদাস ছিল। একটি মূল্যবান আংটি হারিয়ে গেলে বৃদ্ধ পিটারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনেন এবং তাকে দূরের এক রাজ্যে বিক্রি করে দেন যেখান থেকে স্ত্রীর সঙ্গে আবার মিলিত হবার কোনো আশাই ছিল না বেচারার। জিনি আসল ঘটনা জানত। কিন্তু বলে কী লাভ? উল্টো তাকে বেত খেতে হত। সে জানত আংটিটি তার তরুণ প্রভু এক শ্বেতাঙ্গিনীকে দিয়েছেন, যার সঙ্গে তিনি গোপনে প্রেম করেন।

জিনি তরুণ প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করে। কিন্তু তিনি দয়া দেখাননি। সে তখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। তবে মনের ঘৃণা বুকে চেপে রেখে সে ভিডার দায়িত্ব নিতে চায়। ভিডার মা সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মারা গিয়েছিলেন।

ওই সময় থেকে জিনি তার পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে থাকে। ভুডু বা অপবিদ্যা জানত সে। এবং এটাই সে কাজে লাগায়। ভিডার ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু ছিল না। তাকে সম্পূর্ণ চালাত জিনি। তবে এই আশ্চর্য ঘটনা কীভাবে ঘটাত সে সম্পর্কে মুখ খোলেনি জিনি। সে ভিডাকে দিয়ে চুরি করাত। ভাবত এতে 'তরুণ প্রভু'র গায়ে বেশ ভালো কাদা ছিটানো যাচ্ছে। কালো জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিককে কাজে লাগিয়ে এ কাজ সে কতদিন চালিয়ে যেত কে জানে। হয়তো এভাবে ভিডার ধ্বংস ডেকে আনত সে।

বুড়ো পিটারকে বহুদিন আগে আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। তারপর সে বিশ্বস্ততার সাথে আমার সেবা করে আসছিল। পিটারকে নিয়ে জ্যামাইকাতেও

গিয়েছিলাম আমি। ওখান থেকে কিনে নেয়া হয়েছিল পিটার আর জিনিকে। তবে ওখানে জিনির দেখা মেলেনি। জিনির সাথে তার সাক্ষাৎ হয় সম্ভবত এখানে এসে। তবে ওরা এখন থেকে ভিডার কাছে আর ঘেঁষতে পারবে না।

তবে এর মানে এই নয় যে ভিডা নিরাপত্তাহীন থাকবে। আমি ওর বাবার কাছে থেকে অনুমতি নিয়েছি। এখন থেকে ভিডার সকল নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। তবে আমার বিশ্বাস হয় না জিনি আর কোনোদিন তার শয়তানি শক্তি ব্যবহার করে মানুষ ভিডাকে বেড়াল-মানবীতে রূপান্তর ঘটাতে পারবে।

মূল : গ্রে লা স্পিনা'র 'দ্য টরটয়েজ-শেল ক্যাট'

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

ড্রাকুলা

এক

জায়গাটা সাভার বাজার থেকে সামান্য দূরে। আমার বন্ধু রবার্টের বাড়ি। ওর বাবা একটা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও-র বড় কর্মকর্তা। ঢাকায় অফিস। কিন্তু শহরের কোলাহল থেকে দূরে থাকবার জন্যই বোধহয় বহু টাকা খরচ করে এরকম নিরিবিলি জায়গায় বাড়ি করেছেন। রবার্ট সাভার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে যাতায়াত করে। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ক্লাস থ্রি থেকে। ভার্সিটিতে ঢুকবার পর দুজনের ডিপার্টমেন্ট আলাদা হয়ে যাওয়াতে দেখা-সাক্ষাৎ কম হয়। অবশ্য এতে বন্ধুত্বে কোনোরকম ভাটা পড়েনি। প্রতিদিন দেখা না হলেও অবশ্যই টেলিফোনে অন্তত একবার কথা হওয়া চাই। কিন্তু কিছুদিন থেকে এই রবার্টের ব্যবহারে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ করছি। ইদানীং ক্লাস শেষ হওয়ার পর ও আমাকে দেখতে পেলেই কেন জানি না এড়িয়ে যেতে চায়। চেহারাতে কেমন হিমশীতল এক উদাস দৃষ্টি! ওর চোখের দিকে চাইলে মাঝেমধ্যে নিজের অজান্তেই গা শিউরে ওঠে। এর মাঝে একদিন ফোন করলাম রবার্টকে। কিন্তু ফোন ধরলেন ওর মা; জানালেন ও বাসায় নেই। ফোনে গলা চিনতে না-পারায় পরিচয় দিলাম, 'আন্টি, আমি শাহেদ বলছি...।' পরিচয় পেয়েই ফুঁপিয়ে উঠলেন আন্টি। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বাবা, তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে। তুমি কি আজ অথবা কাল এখানে আসতে পারবে, সম্ভব হলে বেড়িয়ে যাও না দু-একদিন?'

বললাম, 'আন্টি, আজ তো মঙ্গলবার, আমি বৃহস্পতিবার বিকেলবেলায় আপনাদের ওখানে পৌঁছে যাব।' ছেড়ে দিলাম ফোন।

দুই

বৃহস্পতিবার একটু আগেভাগেই গোসল, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সেরে নিলাম। ইচ্ছে আছে শুক্রবারটা ওখানে কাটিয়ে শনিবার সকালের বাসে ফিরে আসব। বেশ কিছুদিন কোথাও বেড়াতে যাওয়া হচ্ছিল না, আন্টির আমন্ত্রণে এবারে সে সুযোগ পাওয়া গেল। মাত্র দু-একদিনের ব্যাপার; তাই ছোট একটা সুটকেসে অল্পকিছু কাপড় আর শেভ করার সরঞ্জাম ইত্যাদি ভরে নিলাম। গার্লিক ক্যাপসুলের শিশিটাও নিতে ভুললাম না। ডাক্তারের নির্দেশে প্রতিদিন একটা করে ওই ক্যাপসুল খেতে হচ্ছে। আন্টির কথা শুনে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আরও একটা কারণে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, কী জানি কেন আংকেল তাঁকে সহ্য করতে পারেন না। এ ব্যাপারে রবার্টও হয়েছে তার বাবার মতো। মায়ের কোনো উপদেশ সে সহ্য করতে পারে না। স্বামী এবং একমাত্র সন্তানের এরকম আচরণের জন্যই সম্ভবত তিনি নিজেকে সবসময় গুটিয়ে রাখেন। সবধরনের অন্যায়ও মুখ বুজে সহ্য করেন। কে জানে, হয়তো আন্টির প্রতি ওদের দুর্ব্যবহারের মাত্রা চরমে উঠেছে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাইরে এসে বাসস্ট্যান্ডে যাবার জন্য রিকশায় চড়ে বসলাম।

গুলিস্তান থেকে ননস্টপ বাসেও ঝাড়া দেড়ঘণ্টা লেগে গেল। ওদের বাসায় যখন পৌছালাম বেলা তখন তিনটে। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে সোফায় বসালেন আন্টি। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। কুশলাদি শেষ হবার পর চা-নাস্তা খেয়ে যুত হয়ে বসলাম। এরপর আন্টি যে রোমহর্ষক কাহিনী শোনালেন তা হুবহু তুলে ধরছি :

"ওই দিন বিকেল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। মেয়েটিকে রাতটা এখানেই থেকে যেতে বললাম। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্প হল। তারপর গেস্টরুমে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়লাম। সেদিন কী জানি কেন, ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর হয়তো একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল, কিন্তু খুটখাট শব্দে একসময় তন্দ্রাভাবটাও কেটে গেল। উঠে বেসিনে গিয়ে চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিলাম। হঠাৎ মনে হল, পাশের রুমে মেয়েটা ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে কিনা কে জানে। গেস্টরুমের দরজায় মৃদু টোকা দিলাম। দরজাটা ভিতর থেকে ভেজানো ছিল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। এক বিস্ময়কর দৃশ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। রুমের মেঝেতে বসে রয়েছে সিনথিয়া। ওকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকা। বৃত্তের ভিতরে কী যেন সব আঁকিবুকি। আমার দিকে পেছন ফিরে থাকাতে এতক্ষণ ওর চেহারা নজরে পড়েনি। এবারে ডাক দিতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকা অবস্থাতেই আমার দিকে ঘুরে তাকাল ও। এরপর যা দেখলাম তা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। মেয়েটির চোখদুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। চেহারায় কেমন যেন একটা শয়তানি ভাব খেলা করছে। আমার দিকে চেয়ে অশরীরী প্রেতাত্মার

মত হেসে উঠল ও। এবারে চড়া গলায় ধমকে উঠলাম। কাজ হল এতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল ও। চেহারাতে আগের সেই হিংস্রতা নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত রাতে মেঝেতে বসে কী করছিলে তুমি?'

'আমার ইনসোমনিয়ার দোষ আছে, তাই ঘুমাতে যাবার আগে হালকা যোগাসন করছিলাম। এতে ঘুমটা ভালো হয়।'

আর কথা না বাড়িয়ে রুমে এসে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা সিনেমার কথা। ড্রাকুলার কাহিনী। এক প্রেতসাধক একটা আঁকা বৃত্তে বসে ঠিক এভাবেই ধ্যান করত, আজ সিনথিয়াকে যেভাবে করতে দেখলাম।

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে মেয়েটিকে দেখলাম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রবার্টও টেবিলে বসা। একমনে নাস্তা খাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন উদাস ভাব। সাড়ে নয়টার দিকে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হল ওরা। ওইদিন থেকে রবার্টের আচরণে পরিবর্তন শুরু হল। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস থেকে ফিরে এসে অন্যান্যদের সাথে হাসিঠাট্টায় সরগরম করে রাখত বাড়িটা। ওই দিনের পর থেকে কী হল কে জানে, বাড়ি ফিরে সোজা ওর রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। সেই দরজা খুলত রাতে ভাত খাওয়ার মিনিট-পাঁচেক আগে। খেয়েদেয়েই আবার সোজা চলে যেত ওর রুমে। এভাবে কেটে গেল চার-পাঁচ দিন।

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ক্লাস থেকে ফিরে এল রবার্ট, সঙ্গে সিনথিয়া। মেয়েটিকে দেখে কেন যেন আগের মতো খুশি হতে পারলাম না। তবু মুখে ভদ্রতা বজায় রাখতে ত্রুটি করলাম না, কারণ তা না হলে রবার্ট হয়তো আমার উপর খাপ্পা হয়ে উঠতে পারে। বৈকালিক চায়ের আসরটা খুব একটা জমল না। রবার্ট আর সিনথিয়া গল্পগুজবে এতবেশি মগ্ন হয়ে পড়ল যে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওখান থেকে উঠে আসতে হল। আমি উঠে আসার পর ওরাও টেবিল ছেড়ে যে যার রুমে চলে গেল। এরপর সন্ধ্যায় টিভিতে খবরের সময় দেখতে পেয়েছিলাম মেয়েটিকে। রাতে খাওয়ার সময় সামান্য দুচারটের বেশি আর অগ্রসর হল না কথাবার্তা। আমরা যে যার রুমে চলে এলাম।

ওইদিন ছিল পূর্ণিমা। শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে চাঁদের অপরূপ সৌন্দর্য দেখছি। এমন সময় বেশ জোরে দরজা খোলার শব্দ হল। উঠে গিয়ে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে বাইরে তাকালাম। দেখি, গেস্টরুম থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে সিনথিয়া। ড্রইংরুমে ঢুকে কয়েকবার এদিক-ওদিক চাইল। কেউ অনুসরণ করছে না, এটা নিশ্চিত হয়ে নিয়ে রবার্টের রুমের দিকে হাঁটা ধরল ও। গাঢ় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে আমি তার পিছু নিলাম। দরজাটা ভেজানো ছিল। কোনো শব্দ না করে আস্তে আস্তে রুমে ঢুকল মেয়েটি। উঁকি দিয়ে দেখি বিছানায় ঘুমিয়ে আছে রবার্ট। মেয়েটি রবার্টের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেহারায় সেই আগের শয়তানি; নিরাপদ দূরত্বে থেকে সবকিছু স্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটি ধীরে ধীরে মাথা ঝুঁকিয়ে ওর মুখটা রবার্টের গলার কাছে নামিয়ে আনল। তারপর আচমকা গলার একপাশে কামড় বসাল। আচমকা চোখ মেলে চাইল রবার্ট। দূর থেকে বুঝতে পারছি কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে ও। ততক্ষণে ওর গলা থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়েছে সিনথিয়া। দেখলাম, মেয়েটির ঠোঁটে এবং রবার্টের গলার একপাশে ছোপ ছোপ রক্ত! ওই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবু মনকে শক্ত রাখলাম। কারণ ব্যাপারটা যদি নিছক কৌতুক হয় তা হলে এতে নাক গলাতে গিয়ে ছেলের কাছেই বকুনি খেতে হবে আমাকে। তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দেখতে লাগলাম কী হয়। এরপর মেয়েটি রুমের দরজা দিয়ে বের না হয়ে জানালা দিয়ে লাফ দিল— এতটাই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে, দেখলে মনে হবে কোনো সার্কাসদলের দড়াবাজ।

যাক, এতকিছুর পরেও উপস্থিত বুদ্ধি কিন্তু হারাইনি। ড্রইংরুমের দরজা খুলে অনুসরণ করলাম মেয়েটিকে। বেশকিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছে সিনথিয়া। বড় রাস্তা ছেড়ে এবারে বাজার সংলগ্ন কাঁচা রাস্তা ধরল ও। কাঁচা রাস্তাটা খ্রিস্টান গোরস্তানে গিয়ে শেষ হয়েছে। গেট দিয়ে ও ঢুকে পড়ল ভিতরে। একটা পুরনো কবরের সামনে দাঁড়াল। একটু দূরে অন্য একটা কবরের আড়াল থেকে আমি ওর কার্যকলাপ লক্ষ করে চলেছি। মেয়েটি একবার শুধু পেছন ফিরে তাকাল, তারপর ঝুঁকে পড়ল কবরটার উপর। কোনো এক জাদুমন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর দেহ। এসব দেখে আমার তখন মূর্ছা যাবার উপক্রম। যা হোক, মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ঠায় দাঁড়িয়েই রইলাম। দেখি, একটু পর অশরীরী প্রেতাত্মার মতো আবার উদয় হয়েছে মেয়েটি। চোখেমুখে সাপের হিংস্রতা খেলা করছে। ঠোঁটের দুধার বেয়ে তরল কী যেন গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার থাকায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে কবরস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলাম।

বাসায় ফিরে সোজা গেস্টরুমের সাথে অ্যাটাচড বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সে। আর দেরি না করে হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি মেয়েটি একদম স্বাভাবিক। রাতের কর্মকাণ্ডের কোনো চিহ্নই খুঁজে পেলাম না ওর চেহারায়। নাস্তা সেরে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ও। এর পরেও বেশ কয়েকবার এ বাসায় এসেছে ও, কিন্তু ওই দিনের পর থেকে কিছুতেই আর ওকে সহ্য হয় না আমার। অথচ ছেলের মেজাজ-মর্জির কথা ভেবে ওকে এখানে আসতে নিষেধও করতে পারি না। বাবা, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, মেয়েটার আজ আসার কথা। হয়তো সন্ধ্যার আগেই এসে যাবে।"

একনাগাড়ে এতক্ষণ কথা বলে থামলেন আন্টি।

সন্ধ্যার একটু আগেই সিনথিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ঢুকল রবার্ট। মেয়েটিকে এই প্রথম

দেখলাম। স্বীকার করতে বাধা নেই, এরকম সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। আমাকে এখানে দেখে রবার্ট যে মোটেই খুশি হয়নি তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সে যাই হোক, শুকনো মুখে আমার সাথে দুই-একটা সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর নিজের রুমে চলে গেল ও। সিনথিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। একটু পরে সে-ও উঠে চলে গেল গেস্টরুমে বিশ্রাম নিতে।

ভাবছি, এ কোথায় এলাম। রবার্টের এ কী অধঃপতন হয়েছে যে ছেলেবেলার বন্ধুকে অস্বীকার করতে চায়! অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আন্টি এরমধ্যে ড্রইংরুমের পাশের রুমটাতে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এর আগে বহুবার এ বাড়িতে এসে থেকেছি; কিন্তু এই প্রথম আমি রবার্টকে ছাড়া আলাদা রুমে থাকছি।

রাতে খাওয়াদাওয়ার সময় দুজনের সঙ্গেই দেখা হল; কিন্তু সন্ধ্যাবেলার নির্লিপ্ততা এখনও পীড়া দিচ্ছে মনকে। সেজন্যই বোধহয়, আলাপ খুব একটা জমল না।

রাতে শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি। দেহমনে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভিড় জমিয়েছে; কিন্তু কেন জানি না চোখে ঘুম আসছে না। ঘড়ি দেখলাম— রাত প্রায় দেড়টা।

একটু পর ভারী কিছু পতনের আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলে বাইরে এলাম। দেখি, আওয়াজ শুনে আন্টিও ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, 'ওই ডাইনিটা নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটিয়েছে।'

পা টিপে টিপে গেস্টরুমের দিকে এগুলাম। দরজাটা আগে থেকেই ভেজানো ছিল। আস্তে ধাক্কা দিলাম। দেখি, মেঝেতে বসে ধ্যানে মগ্ন সিনথিয়া, আমি যে পেছন থেকে দেখছি সেটা একেবারেই টের পায়নি। মেঝেতে রক্ত করে একটা বৃত্ত আঁকা। বৃত্তের ভিতরে কী সব সাংকেতিক চিহ্ন! একটু পর যেন হুঁশ হল মেয়েটির। চট করে রুমের বাইরে চলে এলাম। নিরাপদ দূরত্বে থেকে সবকিছু লক্ষ করছি।

ধীরপায়ে গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে এল ও। ড্রইংরুম পেরিয়ে রবার্টের রুমে প্রবেশ করে পা টিপে টিপে বিছানার কাছে দাঁড়াল। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ রবার্টের কণ্ঠনালিতে কামড় বসাল মেয়েটি। এ দৃশ্য দেখে আন্টি চিৎকার করে ওঠার আগেই আমি হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরলাম। ইশারায় বললাম, কী হয় চুপচাপ দেখে যেতে। একটু পর আবার উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। ওর ঠোঁটের দুধার বেয়ে রক্ত ঝরছে। চোখে মুখে যেন শয়তানি খেলা করছে। রক্তমাখা মুখ নিয়ে বেসিনে গিয়ে মুখহাত ধুতে লেগে গেল সে। আন্টিকে রুমে যেতে বলে আমিও শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটা।

পরদিন সকাল সকাল বিছানা ছাড়লাম। আন্টি অবশ্য ভোরে উঠে নাস্তার আয়োজন শুরু করেছেন। একটু পর সবাইকে নাস্তার টেবিলে যেতে বললেন তিনি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন আন্টি। এদিকে রবার্ট আর সিনথিয়াও এসে যোগ দিয়েছে। একটু পরে এলেন আংকেল, মানে রবার্টের বাবা মি. এলবার্ট সরকার।

অফিসের কাজে কাল রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরায় আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন তিনি।

আংকেলের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুঠাম শরীর। দেখে মনে হয় বয়স চল্লিশেরও কম। বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিতে পারলেন না তিনি। শুক্রবার যদিও বন্ধের দিন, কিন্তু জরুরি কাজ থাকায় ঢাকায় যেতে হচ্ছে তাঁকে। উঠে পড়লেন তিনি।

একটু পর রবার্ট আর সিনথিয়াও উঠে চলে গেল। সকাল দশটার দিকে ওরা একসঙ্গে বাইরে গেল। ওদের এরকম কার্যকলাপে আন্টি যে ভিতর ভিতর বিরক্ত হচ্ছেন তা বেশ বুঝতে পারছি। রবার্টের পরিবর্তন দেখে আমিও কম অবাক হইনি। যে রবার্ট আমাকে না দেখে একদণ্ডও থাকতে পারত না, সেই এখন এড়িয়ে চলে আমাকে। ভাবছি আজই ঢাকায় ফিরে যাব কিনা। কিন্তু না, এর শেষ না দেখে এখান থেকে নড়ব না।

রবার্ট আর সিনথিয়া বাইরে চলে যাওয়ার পর আন্টির সঙ্গে আলাপে বসলাম। দুজনে মিলে কাল রাতের ঘটনাটা পর্যালোচনা করলাম। আমি বললাম, 'মেয়েটির উপর নিশ্চয়ই কোনো অশুভ প্রেতাত্মা ভর করেছে।'

আমার কথার সঙ্গে একমত হয়ে আন্টি বললেন, 'এখন তা হলে কী করা উচিত আমাদের?'

'শুনেছি ধর্মযাজকরা নাকি মানুষকে এসব অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।'

আন্টির কাছ থেকে জানা গেল, বাজারের কাছেই একটা গির্জা আছে। গির্জার ফাদার এলাকার মানুষদের নানারকম সমস্যার সমাধানের পথ বাতলে দেন। এলাকায় তিনি ফাদার দ্যত্তিয়েন নামে সুপরিচিত। ঠিক হল, বিকেল গড়ানোর আগেই যখন সিনথিয়া আর রবার্ট বাড়িতে থাকবে, সেসময় আমি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব তাঁকে।

দুপুর দেড়টার দিকে ফিরে এল ওরা। বেলা দুটোয় সবাইকে খেতে ডাকলেন আন্টি। খাওয়ার টেবিলে দুজনকে বেশ স্বাভাবিক লাগছে এখন। আমার সঙ্গেও ওরা নানান বিষয়ে কথা বলছে। রবার্টের গলার দিকে নজর যেতেই অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সিনথিয়ার কাল রাতের কামড় বসানোর দাগ কোনো জাদুমন্ত্রবলে যেন উধাও হয়ে গেছে!

যাক, খাওয়াদাওয়ার পর ওরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসল, আর আমি নিজের রুমে ফিরে এলাম। ওদের উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। ভাবছি দুটোতে জুড়ি বাঁধলে খুব বেমানান হবে না। তবে মেয়েটার উপর যেরকম খেপে আছেন আন্টি, এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতি পাওয়াও কঠিন হবে। আরেকটা কথা। মেয়েটার উপর সত্যি সত্যি কোনো অশুভ প্রেতাত্মা ভর করেছে কিনা সেটাও যাচাই করে দেখতে হবে। এখন ফাদারকে ডেকে আনতে পারলে হয়। তিনি হয়তো

ব্যাপারটার একটা সমাধান দিতে পারবেন।

বেলা সাড়ে চারটার দিকে গির্জার ফাদারের সাথে দেখা করার জন্য তৈরি হচ্ছি। দরজায় টোকা পড়ল। দেখি, রবার্ট আর সিনথিয়া দাঁড়িয়ে। ভিতরে ঢুকে খাটেই বসে পড়ল দুজন। এই প্রথম মেয়েটির সঙ্গে খোলামেলা আলাপ হল। বেশ আলাপি মেয়ে সিনথিয়া। আধঘন্টা আলাপের পর ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ মনে পড়ল, ওষুধ খেতে হবে। ব্যাগ থেকে গারলিক ক্যাপসুলের শিশিটা বের করে একটা ক্যাপসুল মুখে দিলাম। সিনথিয়া হাত থেকে শিশিটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। শিশির মুখ খুলে কয়েকবার গন্ধ শুঁকে ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। ওরা চলে গেল। আমিও আর দেরি না করে গির্জার উদ্দেশে হাঁটা ধরলাম।

বাসা থেকে বাজার সাত-আট মিনিটের রাস্তা। বাজারের পেছনদিকে গির্জা। গির্জার মূল ফটকে পৌঁছে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম ফাদারের কথা। দারোয়ান আমাকে গেটে দাঁড় করিয়ে রেখে খবর দিতে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার। লম্বা-চওড়া গড়ন। চেহারায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের বদলে বিলাসিতার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করলাম। আন্টির নির্দেশ অনুযায়ী ফাদারকে সব কথা খুলে বললাম। সবকিছু শোনার পর তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলেন।

গির্জা থেকে রবার্টের বাড়ি রিকশা করে আসতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগল না। বাসায় তখন রবার্ট ও সিনথিয়া আন্টির সঙ্গে কথা বলছিল। ফাদারকে হঠাৎ এ সময়ে এখানে দেখে ওরা দুজন কিছুটা যেন অবাকই হলো। সবার সাথে দুচারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর আন্টি তাঁকে একপাশে ডেকে নিলেন। একটু পর উঠে দাঁড়ালেন ফাদার। হাতে পবিত্র বাইবেল। লক্ষ করলাম এসময় সিনথিয়া কেবলই ফাদারকে পাশ কাটিয়ে চলছে। পবিত্র বাইবেল থেকে শ্লোক আউড়ে চলেছেন ফাদার। একসময় থামলেন তিনি। বললেন, 'বাড়িতে অশুভ প্রেতাত্মার কুদৃষ্টি পড়েছে। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। বাড়ির চারদিক "বন্ধ" করে দিয়েছি। এখন আর প্রেতাত্মা সহজে ঢুকতে পারবে না এ বাড়িতে।' একটু পর চলে গেলেন ফাদার। এর পরপরই রবার্ট আর সিনথিয়াও বেড়াতে বের হল।

সন্ধ্যার বেশ পরে ওরা দুজন ফিরে এল। লক্ষ করলাম, বিকেলে ফাদার আসার পর থেকে বাড়িতে কেমন যেন থমথমে ভাব বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ পর সবাইকে খেতে ডাকলেন আন্টি। একটু পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আংকেল। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। এই ছুটির দিনেও অফিসের কাজ সেরে মাত্র কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন তিনি। খাওয়া শেষ করে আমি আর আন্টি একসঙ্গে উঠে পড়লাম। রবার্টও উঠে এল পেছন পেছন।

রুমে এসে ভাবছি, রহস্যের তেমন কিছু বোধহয় আর অবশিষ্ট নেই। অশুভ প্রেতাত্মাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ফাদার। এখন থেকে রবার্ট নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আচরণ

করবে। সুতরাং আন্টির দুশ্চিন্তারও তেমন কিছু নেই। ঠিক করলাম, কাল সকালেই ঢাকা ফিরে যাব। বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে বোধহয়। আমি আর দেরি না করে নিশ্চিত মনে শুয়ে পড়লাম।

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। সর্বাঙ্গ ঘেমে একাকার। উঠে এক গ্লাস পানি খেলাম। ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। ভাবছি কাউকে ডাকব কিনা। বিছানা ছেড়ে ড্রইংরুমে এলাম। আন্টিকে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। একটু ধাতস্থ হয়ে ফিরে এলাম রুমে।

হ্যাঁ, এবারে সেই দুঃস্বপ্নের কথা বলি। দেখি, সিনথিয়া হঠাৎ যেন মানুষ থেকে ধীরে ধীরে পিশাচিনীতে পরিণত হচ্ছে। চোখদুটো কোটর থেকে যেন ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে। মুখের দুপাশের দুটো দাঁত ঠোঁটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দেখছি, ধীরে ধীরে রুম থেকে বের হয়ে আসছে ও। মনে হচ্ছে মাটিতে পা না ফেলে উড়ে চলেছে মেয়েটি। ধীরে ধীরে আন্টির রুমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। আন্টির মাথার কাছে গিয়ে একবার পেছন ফিরে চাইল। তারপর হঠাৎ ধারালো দাঁত দিয়ে গলায় কামড় বসিয়ে দিল...। এর পরপরই ঘুম ভেঙে যায় আমার। যাক, দুঃস্বপ্ন-দুঃস্বপ্নই। নিশ্চিত মনে আবার শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে না-পড়লেই ভালো করতাম।

তিন

ভোরে লোকজনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। হৈচৈ আর চিৎকারের পাশাপাশি কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠেই চলে এলাম ড্রইংরুমে। বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে রবার্ট; কাঁদছে সিনথিয়াও। সোফায় বসে রুমালে চোখ মুছছেন আংকেল। দুঃসংবাদটি যেন আমার কলজেটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়ে গেল। কাল বালিশের নিচে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে। তাতে নিজ হাতে লিখে গিয়েছেন : আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

বেলা একটু বাড়লে স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টর মি. নিজামউদ্দীন দলবল সহ হাজির হলেন। রুমে ঢুকলেন তিনি। পেছন পেছন আমিও ঢুকে পড়লাম। ইতিমধ্যে লাশ চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। জানা গেল, ভোরে কাজের বুয়া ঘুম থেকে উঠে দেখে আন্টির রুমের দরজা খোলা। খুব ভোরে বিছানা ছাড়া তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। রুমের দরজা খোলা দেখে বুয়া ডাকতে যায় তাঁকে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর কোনো উত্তর না পেয়ে ভড়কে যায় সে। শেষে ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখে দেহ পুরোপুরি ঠাণ্ডা। বুয়ার হৈচৈ শুনে বাড়ির সবাই জেগে ওঠে।

ইন্সপেক্টর চাদরের এক অংশ সরালেন। আন্টির চেহারায় কোনো ভয়ভীতির চিহ্ন নেই, যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন তিনি। তাঁর নিজ হাতে লেখা চিরকুটটা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পকেটে ঢোকালেন ইন্সপেক্টর। ঘুমের বড়ির শিশিটাও পাওয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর শুরু হল রুটিনমাফিক জিজ্ঞাসাবাদের পালা। জিজ্ঞাসাবাদ থেকে এমন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না যাতে ঘটনাটা আত্মহত্যা ছাড়া অন্যকিছু বলে মনে হতে পারে। অবশ্য জানা গেল, মাঝেমধ্যে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুতেন তিনি— কিন্তু ভোরবেলায়ই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। কোনোরকম শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে কখনোই এর অন্যথা হত না।

ব্যাপারটা আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা কেবল পুলিশি তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে। ইন্সপেক্টরের নির্দেশে লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। একটু পর দলবল নিয়ে চলে গেলেন ইন্সপেক্টর সাহেব। যাবার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, উপস্থিত কেউ যেন প্রাথমিক তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এই বাড়ি ত্যাগ না করে।

পরের দুইদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবার্টদের বাড়িতে থাকতে হল আমাকে। তৃতীয় দিন সকালবেলা ইন্সপেক্টর এলেন। পুরো ঘটনার সাময়িক ইতি টেনে তিনি বললেন, 'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এমন কিছু পাওয়া যায়নি। ঘটনাটা সম্ভবত আত্মহত্যাই হচ্ছে। তবে আমরা আরও তদন্ত চালাব।' এরপর তিনি আমার এবং সিনথিয়ার ঢাকার ঠিকানা নিয়ে বললেন, 'আপনারা ইচ্ছে করলে ঢাকায় ফিরে যেতে পারেন, তবে তদন্তের স্বার্থে যে-কোনো সময় আপনাদের প্রয়োজন পড়তে পারে।' চলে গেলেন ইন্সপেক্টর।

ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। হঠাৎ মনে হল গির্জার ফাদারের কথা। ভাবলাম, ফাদারকে সব কথা খুলে বলি। তিনি হয়তো অতিলৌকিক শক্তির বলে বুঝতে পারবেন

আসল ঘটনাটা কী। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম গির্জায়। গির্জায় পৌঁছে শুনলাম ফাদার কী কাজে যেন বাইরে গেছেন। তাঁর দেখা পেতে হলে আমাকে আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশ তাই সই।

আধঘণ্টা পর দেখা পেলাম ফাদারের। বাজারের দিক থেকেই রিকশা নিয়ে এদিকে আসছেন। তাঁর মুখ থেকে জানলাম, এইমাত্র রবার্টদের বাড়ি থেকে ফিরছেন তিনি। আংকেল খবর দিয়েছিলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে আজ বেলা চারটেয়। আন্টির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তিনি চমকপ্রদ কথা বললেন, 'আসলে মিসেস সরকারের মৃত্যুটা আত্মহত্যা নয়। এ হচ্ছে অশুভ প্রেতাত্মার কাজ। ওই দিন আমি পুরো বাড়ি ঘুরে "বন্ধ" করে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা কোনো কাজে আসেনি। এই অশুভ প্রেতাত্মাটার শক্তি সম্বন্ধে আমার আগে কোনো ধারণা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে প্রেতাত্মাটা অনেক বেশি শক্তি রাখে। এ ছাড়া আরও একটা কথা। প্রেতাত্মাটা হয়তো বুঝে গেছে আমি এখানে ভবিষ্যতেও আসব। আর তাই শিকারের উপর হামলা চালাতে মোটেও দেরি করেনি। তুমি আর মিসেস সরকার সিনথিয়াকে প্রেতাত্মা-ভর-করা অবস্থায় দেখেছিলে। খুব সম্ভবত ওই প্রেতাত্মা চাচ্ছিল সিনথিয়াকে দিয়ে এই কাজটা করাতে। কিন্তু ওইদিন আমি সময়মতো হাজির হওয়াতে সেটি আর সফল হয়নি। যাক, আজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে যাওয়ার পর কয়েকদিন একটানা ঝাড়ফুঁক করব। আমার ভয় হচ্ছে। প্রেতাত্মাটা একজনকে খুন করেই হয়তো ক্ষান্ত হবে না।'

ফাদারের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে ফিরে এলাম। বিকেলবেলায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল। এরপর সবাই আমরা ফিরে এলাম বাসায়। ফাদার দ্যতিয়েন বাড়ির চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে বাইবেলের শ্লোক আউড়ে চললেন। কাজ শেষে চলে যাবার সময় তিনি বললেন, 'এখন থেকে সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে বহুদিনের পুরনো এক অশুভ প্রেতাত্মার কুদৃষ্টি পড়েছে। বলা যায় না, যদিও আমি যথেষ্ট ঝাড়ফুঁক করে দিয়েছি, প্রেতাত্মাটা হয়তো আগামীতে অন্য কারও উপর আক্রমণ করে বসতে পারে।' চলে গেলেন ফাদার।

রাতে খেতে বসে কারও সাথেই তেমন কোনো কথা হল না। আংকেলকে বললাম, 'কাল ঢাকায় যাচ্ছি।' তিনি নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। ঠিক করেছি ভোরবেলার প্রথম বাসটাই ধরব। এখানে আর একদণ্ড থাকতে মন সায় দিচ্ছে না। ভোরবেলা হয়তো কারও সঙ্গে দেখা হবে না। তাই রবার্ট আর সিনথিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। ওরা দুজনেই যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে কথা বলল।

ভোরবেলা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি, দূরে রবার্ট আর সিনথিয়াকে দেখলাম হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে— প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে বোধহয়। কে জানে, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো শুনতে পাব ওদের বাগদানের খবর...! বাস এসে গেছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লাম।

চার

সাভারের সেই ভয়ংকর স্মৃতি দু-এক দিন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও, কয়েকদিন পরেই পড়াশোনার চপ ও অন্যান্য ব্যস্ততার জন্য ওসব নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তার আর অবকাশ মিলল না। একসময় ঘটনাটা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। ঠিক মাস দেড়েকের মাথায় একদিন শুনলাম চরম দুঃসংবাদ। ভোরবেলা সাভার থেকে আংকেলের ফোন পেলাম। সিলিং ফ্যানের আংটায় রশিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে রবার্ট। খবরটা শুনে মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। হাত থেকে খসে পড়ল রিসিভার। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সাভার যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম।

সকাল সাড়ে দশটার দিকে পৌঁছে গেলাম রবার্টদের বাড়িতে। গেটে দাঁড়ানো একজন কনস্টেবলকে নিজের পরিচয় দিলাম। কী মনে করে বেশি ঘাঁটাল না আমাকে। ঢুকতে দিল বাড়ির ভিতর। ভিতরে গিয়ে দেখি, বাচ্চাছেলের মতো ফোঁপাচ্ছেন আংকেল। সিনথিয়াকেও দেখতে পেলাম। রুমের এককোণে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছে। পুলিশের লোকজন লাশ ততক্ষণে নামিয়ে খাটে শুইয়ে দিয়েছে। মৃতুদেহটা চাদর দিয়ে ঢাকা। দড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করলে নাকি চেহারা ভয়ংকর দেখতে হয়। সেজন্য লাশ কাউকে দেখানো হচ্ছে না। ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীনকে দেখা গেল, তাৎক্ষণিক জবানবন্দি নিতে ব্যস্ত। কারুরই জবানবন্দিতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। এদিকে রবার্টের শার্টের বুকপকেটে পাওয়া গেছে একটা চিরকুট। তাতে লেখা— আমার মৃত্যুর জন্য আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। অবশ্য পোস্টমর্টেম হলেই বোঝা যাবে, ঘটনাটা আত্মহত্যা, নাকি খুন।

একটু পরেই পুলিশের হেফাজতে পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে লাশ। রিপোর্ট পাওয়া যাবে দিনদুয়েক পর। নিজের ইচ্ছেতেই দিনদুয়েক থাকব বলে মন স্থির করলাম। আংকেলও খুব জোরাজুরি করতে লাগলেন।

দুদিন পরের কথা। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট নিয়ে হাজির হয়েছেন ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীন। রিপোর্টে পরিষ্কার আত্মহত্যার কথাই উল্লেখ আছে। অর্থাৎ আপাতত তদন্তের আর তেমন কিছু অবশিষ্ট রইল না।

তিনদিন পর ফিরে এলাম ঢাকায়। স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম কয়েকদিন ঠিকমতো ঘুম হত না। কী এক দুঃস্বপ্ন যেন তাড়া করে ফিরত আমাকে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মই এমন যে চরম দুঃখবোধও একসময় সয়ে যায়। আমিও রবার্টকে হারানোর শোক থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সারিয়ে তুলতে লাগলাম।

প্রায় দুমাস পরের কথা। বিকেলবেলা বেড়াতে গিয়ে শাকিলের সঙ্গে দেখা। ভার্সিটিতে রবার্টের পর যদি আর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম করতে হয় তা হলে প্রথমেই ওর কথা বলতে হবে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে পুরো ফ্যাকাল্টিতেই ওর নাম ডাক। পড়াশোনার

পাশাপাশি শখের গোয়েন্দাগিরিতেও ইদানীং যথেষ্ট নাম করেছে ও। রবার্টের সঙ্গে পরিচয় ছিল ওর। কথায় কথায় জানাল, দুটো আত্মহত্যার ঘটনাই ও খবরের কাগজে পড়েছে, কিন্তু বিস্তারিত কিছু জানে না। আমি দুবারই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম শুনে বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলতে বলল আমাকে।

একটা রেস্টুরেন্টের কেবিনে গিয়ে বসলাম আমরা। প্রায় ঘন্টাদেড়েক একনাগাড়ে ঘটনার আগাগোড়া বর্ণনা করলাম। একেবারে অনাবশ্যক খুঁটিনাটিও বাদ দিলাম না। লক্ষ করলাম, পুরো ঘটনা শোনার পর এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে শাকিল। তৃতীয়বারের মতো চা দিয়ে গেল বেয়ারা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ও বলল, 'তুই যাই বলিস না কেন, দুটো আত্মহত্যার ঘটনাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। পুলিশ কোনো সূত্র পাক বা নাই পাক, দুটো মৃত্যুই আমার কাছে ঠাণ্ডা মাথার খুন বলে মনে হচ্ছে।'

'মিছেই সন্দেহ করছিস তুই। দুটো মৃত্যুর ব্যাপারে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী বলেছে জানিস? নির্ভেজাল আত্মহত্যা!'

আমার কথায় আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়তে লাগল ও। 'দুটো ঘটনাতেই মৃতের হাতের লেখা চিরকুট পাওয়া গেছে এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টও আত্মহত্যার পক্ষে রায় দিচ্ছে, তবু ঘটনা দুটোকে কিছুতেই আমি আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি নিজে খানিকটা খোঁজখবর করতে চাই। যদি নতুন কিছু জানতে পারি তা হলে ফোনে তোকে জানাব।'

প্রায় দিন-বিশেক পর দেখা পেলাম শাকিলের। কথা ছিল, ঘটনার ব্যাপারে নতুন কোনো তথ্য পেলে ফোন করে জানাবে। কিন্তু ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এমন কিছু গরম খবর জানতে পেরেছে, যেজন্য ফোন না করে নিজেই চলে এসেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওর পেট থেকে একটা কথাও বের করা গেল না। শুধু বলল, 'আমি এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যা প্রমাণের ওপর দাঁড় করাতে পারলে পুরো ঘটনাটাই ওলটপালট হয়ে যাবে।' চলে গেল ও।

মাস তিনেক পরের কথা। একটা অদ্ভুত খবর শুনে রীতিমতো অবাক হলাম। বিয়ে করেছে সিনথিয়া। এলবার্ট সরকার, মানে রবার্টের বাবাকে! রাগে, দুঃখে ও ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল। ভাবছি একদিন সাভারে গিয়ে দুজনকে একচোট কিছু শুনিয়ে দিয়ে আসব কিনা। ফোন করতে পারি, কিন্তু ফোনে গায়ের জ্বালা জুড়াবে না।

এরই মাঝে একদিন শাকিল এসে হাজির। চেহরায় একটা পরিতৃপ্তির ভাব। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, 'সাভারে ওই দুটো মৃত্যুর ব্যাপারে বেশ অনেকটাই গুছিয়ে এনেছি। আমি যা ভেবেছিলাম তাই-ই ঠিক। দুজনকেই অত্যন্ত কৌশলে খুন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীনের সাথে কথাবার্তা

হয়েছে। তিনি আমার সঙ্গে একমত, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ধরা যাচ্ছে না আততায়ীকে। পুরো ঘটনাটা পানির মতো পরিষ্কার, কিন্তু ওই যে বললাম, কোনো প্রমাণ নেই।'

'এবারে তা হলে বলে ফেলো তো, খুনি কে?'

'কে আবার, সুন্দরী সিনথিয়া! ঘটনা দুটো ও কীভাবে ঘটাল এবারে সেকথাই বলছি। তবে মূল ঘটনায় যাবার আগে ঘটনার নেপথ্যের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আগে বর্ণনা করছি :

'সিনথিয়ার বাবা-মার সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। মেয়েটির যখন ষোলো বছর, বাবা-মা'র মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে সে-সময়। সিনথিয়া রয়ে যায় বাবার সঙ্গে। এ ঘটনার বছর দুয়েক পর ওর বাবা আবার বিয়ে করে। ঘটনাটা কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি মেয়েটি। সম্ভবত তখন থেকেই গোটা পুরুষজাতির প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশ জন্মায় তার। আর্থিক টানাপড়েনও শুরু হয় তখন থেকেই। মেয়েটি কিন্তু পড়ালেখায় বরাবরই মেধাবী ছিল। যা হোক, জীবিকার প্রয়োজনে এক অদ্ভুত পেশার সঙ্গে জড়িয়ে গেল ও। জাদুকর মেঘদূতের সহকারিণী হিসাবে তিনবছর কাজ করেছিল। ওই সময় একটা বিদ্যা রপ্ত করে সে— সম্মোহন!

'মেঘদূতের সহকারিণীর চাকরি ছেড়ে এক সাহায্যসংস্থায় চাকরি নেয় সিনথিয়া। পাশাপাশি চলতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা। এদিকে অফিসের অনেকেই ওর রূপে পাগলপ্রায়। এরমধ্যে একজন হচ্ছেন রবার্টের বাবা। ও, হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, একই সংস্থায় চাকরি করে রবার্টের বাবা ও সিনথিয়া। সেখান থেকে দুজনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, পরবর্তী সময়ে বিয়ে।

'একটু আগে যেটা বলছিলাম। মেয়েটি মেঘদূতের ওখানে সম্মোহন বিদ্যেটা ভালোই শিখেছিল। আর এ দিয়েই শুরু হল ওর সর্বনাশা খেলার হাতের খড়ি। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলব রবার্ট ও ওর মাকে সিনথিয়াই সম্মোহনের মাধ্যমে খুন করেছে, দৃশ্যত যেটা আত্মহত্যা।'

'কিন্তু ওদের দুজনকে খুন করে সিনথিয়ার কী লাভ?'

'লাভ অবশ্যই আছে। পথের কাঁটা দূর হয়ে গেলে মি. সরকারের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হবে সিনথিয়া। আর এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে প্রৌঢ় মি. সরকারের ঘরণী হয়েই কাটিয়ে দেবে সে সারাজীবন...।'

'তবে, তোর কি মনে হয় মেয়েটি ডিভোর্স করবে রবার্টের বাবাকে?'

'পাগল! সিনথিয়া অত বোকা মেয়ে নয়। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তা হলে খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা অঘটন ঘটবে ওই বাড়িতে। কিন্তু করার কিছু নেই। এমন কোনো অকাট্য প্রমাণও হাতে নেই যা দিয়ে পুলিশের বড়কর্তাদের কথাটা বিশ্বাস করাব।'

পাঁচ

এরপর বেশ কিছুদিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। একদিন সকালবেলা নাস্তা সেরে চায়ে চুমুক দিচ্ছি, কাজের ছেলে খবরের কাগজটা দিয়ে গেল। হ্যাঁ, শাকিলের অনুমানই সত্যি হল শেষপর্যন্ত। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছেপেছে খবরটা 'উচ্চপদস্থ এনজিও কর্মকর্তার আত্মহত্যা।'

খবরে যেটুকু ছেপেছে তার সারমর্ম হচ্ছে কাল রাত আনুমানিক এগারোটার দিকে দাড়ি কামানোর ক্ষুর দিয়ে মি. এলবার্ট সরকার আত্মহত্যা করেছেন। এই মর্মে তিনি নিজহাতে একটি চিরকুট লিখে রেখে গেছেন। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে...।

ভার্সিটিতে একটা জরুরি কাজ ছিল; আপাতত তা বাদ দিয়ে সাভার যাব বলে ঠিক করলাম। বেবিট্যাক্সিতেও ঝাড়া দুঘণ্টা লেগে গেল।

ওই বাড়িতে পৌছে দেখতে পেলাম শাকিলকে— ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীনের সাথে নিচুস্বরে আলাপ করছে। এরপর ইন্সপেক্টর প্রথামাফিক বাড়ির সবাইকে জেরা করলেন। কিন্তু তাদের কারও কাছ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে আত্মহত্যাই। ক্ষুরের হাতলে মি. সরকারের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। চিরকুটটাও তাঁর নিজের হাতেরই লেখা।'

সিনথিয়ার সঙ্গে দেখা হল না। দোতলার বেডরুমে দরজা বন্ধ করে সেই সকালবেলা থেকেই শুয়ে রয়েছে। কয়েকবার নাকি মূর্ছা গেছে ও। ইন্সপেক্টরের অনুমতি নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হলাম— সঙ্গে শাকিল।

এক্সপ্রেস বাস ছুটে চলেছে। জানালা দিয়ে চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে রয়েছি। কী যেন একমনে ভাবছে শাকিল, তাই আর বিরক্ত করছি না ওকে। একসময় মুখ খুলল শাকিল। 'মি. সরকারের উইলে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা কীভাবে করা হয়েছে তা জানতে হবে। সেইসাথে জানতে হবে, এই উইল থেকে সিনথিয়া কতটুকু লাভবান হচ্ছে!'

'তুই রবার্টের বাবার আত্মহত্যাকেও হত্যাকাণ্ড বলে মনে করছিস নাকি?'

'এতে মনে করাকরির কিছু নেই। এটাও আগের দুটোর মতো ঠাণ্ডা মাথায় আরেকটা খুন,' বলল শাকিল। 'আর হ্যাঁ, অন্য দুটো খুনের মতো এক্ষেত্রেও সেই একটা জিনিসের অভাব— প্রমাণ!'

বাস এসে থামল গুলিস্তানে। যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

দিন সাতেক পর একদিন টেলিফোন পেলাম শাকিলের। আগামী শুক্রবার বেলা চারটেয় আমাকে হাজির থাকতে বলেছে রবার্টের বাড়িতে। আমি যেন অবশ্যই ঠিক সময়মতো ওখানে পৌছে যাই।

শুক্রবার। সকাল থেকে অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছি। তাড়াতাড়ি অল্পকয়টা ভাত নাকে-মুখে গুঁজে তৈরি হয়ে নিলাম। বেলা একটার আগেই একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলাম।

বেলা আড়াইটার একটু পরে রবার্টদের বাড়ি পৌঁছে গেল স্কুটার। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই কাজের লোকজনের চেঁচামেচি কানে এল। সিনথিয়াকে দেখলাম উত্তেজিত অবস্থায় কাজের লোকজনকে বকাঝকা করছে। জানা গেল কাল রাতে বাড়িতে নাকি চোর ঢুকেছিল। সিনথিয়ার বেডরুমে ঢুকে ড্রেসিং টেবিল লণ্ডভণ্ড করেছে, তবে কিছুই খোয়া যায়নি। যাক, আমাকে দেখতে পেয়ে স্বাগত জানাল মেয়েটি।

বেলা তিনটের দিকে একটা প্রাইভেট কার থেকে নামল শাকিল, সঙ্গে বয়স্ক একজন লোক। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল সে। লোকটার সঙ্গে পরিচয় হল। কাপড়ের ব্যবসায়ী। তাকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি। আজকের এই আসরে তার কী ভূমিকা, সেটা কিছুতেই মাথায় আসছে না।

বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীন দলবল নিয়ে হাজির হলেন। এর একটু পর কালো কোট-টাই-পরা এক ভদ্রলোক এলেন। জানলাম, ইনিই মি. সরকারের উকিল, নাম জোসেফ হালদার।

সবার জন্য ড্রইংরুমে বসার ব্যবস্থা করা হল। ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীন মি. হালদারকে ইশারা করতেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মনে হচ্ছে মি. সরকারের উইল পড়ে শোনাতে যাচ্ছেন তিনি। হ্যাঁ, ঠিক তাই। একটু কেশে নিয়ে শুরু করলেন ভদ্রলোক 'আপনারা সবাই জানেন কিছুদিন আগে আমার মক্কেল মি. সরকার আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। তদন্তের স্বার্থে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তাঁর উইলটি পড়ে শোনাচ্ছি,' এই বলে তিনি উইলটি পড়ে শোনাতে লাগলেন।

'আমি এলবার্ট সরকার, পিতা পিটার সরকার, আমার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই উইলপত্রের মাধ্যমে প্রদান করিতেছি, যা আমার মৃত্যুর পর (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচাদি মেটানোর পর) কার্যকর হইবে। আমার সাভারস্থ বসতবাড়িখানা, ব্যাংকে গচ্ছিত ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং ঢাকার খিলগাঁওয়ে পাঁচ কাঠা জমি আমার পত্নী সিনথিয়া সরকারের নামে প্রদান করিলাম। এ ছাড়া অপরাপর যাহা কিছু আছে তাহা বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রদান করিলাম... ।'

এরপর তিনি যা পড়ে শোনালেন সেসব কথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। উইল পড়া শেষ হলে, লক্ষ করলাম, সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল সিনথিয়ার চেহারায়।

এবারে মুখ খুললেন ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীন 'অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে এ বাড়িতে পর পর তিনটে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশি তদন্তেও ওগুলো আত্মহত্যার ঘটনা হিসাবেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে আজ এখানে সবাইকে উপস্থিত

হতে বলা হয়েছে তরুণ শখের গোয়েন্দা শাকিল আহমেদের অনুরোধে,' এই বলে শাকিলের দিকে ইঙ্গিত করতেই উঠে দাঁড়াল সে।

"একটু আগে ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছেন যে কিছুদিন আগে এ বাড়িতে পর পর তিনটে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এখানে এই "আত্মহত্যা" কথাটায় আমার আপত্তি আছে। একজনের মৃত্যুকে আমরা তখনই আত্মহনন বলতে পারি যখন কেউ অন্য কোনোকিছুর মাধ্যমে প্রভাবিত কিংবা প্ররোচিত অথবা ভীত না হয়ে স্বেচ্ছায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু এখানে তিনটি ক্ষেত্রেই আত্মহত্যাকারীকে বিশেষ উপায়ে প্রভাবিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার আগে অন্য একটা ব্যাপারে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে-ক'জন আত্মহত্যা করেছেন তাঁদের সবারই অতীত ঘেঁটে দেখেছি, এরা কেউ মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না। অথচ সাধারণভাবে আমরা দেখে থাকি, আত্মহননকারীরা অঘটন ঘটনের কিছু আগে থেকেই অপ্রকৃতিস্থ থাকেন।

এবারে অন্য কথায় আসছি। কারও কারও মুখে শুনেছি এ বাড়িতে নাকি অশুভ প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এগুলো নেহাতই বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও, এখানে আমার বন্ধু শাহেদ উপস্থিত আছে; তার এবং রবার্টের মা, দুজনেরই এ ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল...।' এই বলে শাকিল আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করল।

'এখানে দেখা যাচ্ছে যে সিনথিয়ার উপরই কেবল প্রেতাত্মা ভর করেছিল। এবারে আসুন প্রেতাত্মা বিষয়ক পুরো ঘটনাটা বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমত, রবার্টের মায়ের অভিজ্ঞতাটাই পর্যালোচনা করে দেখি। ঘটনার দিন তিনি সিনথিয়ার রুমে গিয়ে দেখতে পান যে দরজার ভেতর থেকে ভেজানো। অথচ একজন যুবতী মেয়ের শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। এরপর তিনি দেখতে পান সিনথিয়া রবার্টের রুমে ঢুকছে এবং ঢুকে রবার্টের কণ্ঠনালিতে কামড় বসিয়েছে। সিনথিয়ার ঠোঁটের দুধার বেয়ে বয়ে যাচ্ছে তাজা রক্তের ধারা। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন, ওই ঘটনার পর রবার্টের গলায় কেউ কোনো কামড়ের দাগ দেখেনি। এটার দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। রবার্টের গলায় আদৌ কোনো কামড় বসানো হয়নি, কিংবা মিসেস সরকার আর শাহেদ দেখতে ভুল করেছে। আমি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা বাদ দিচ্ছি— কারণ রক্তমাখা মুখ নিয়ে ওরা দুজনেই সিনথিয়াকে বেসিনে মুখ ধুতে দেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, রবার্টের গলায় কামড় দেয়ায় কোনো দাগের সৃষ্টি না হলে ধরে নিতে হয় যে, আদৌ কামড় বসানো হয়নি। সেক্ষেত্রে রক্ত আসবে কোত্থেকে? এরপর আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো; সিনথিয়া গোরস্থানের কোনো একটা কবরে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এ আঁধারে অন্ধকারে কেউ কবরের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেও মনে হবে, বুঝিবা সে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ ব্যাপারটা কয়েক দিন আগে ইন্সপেক্টর সাহেবকে নিয়ে পরীক্ষা করে তবেই শিওর হয়েছি। এ

ছাড়া আরও একটা কথা। একদিন সিনথিয়া শাহেদের কাছ থেকে একটা গারলিক ক্যাপসুলের শিশি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিল এবং শিশিটা খুলে ভেতরের গন্ধও শুঁকেছিল। যাঁরা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন তাঁরা জানেন অশুভ শক্তিতে ভর করলে কেউ রসুনের ছায়াও মাড়াতে চায় না— গন্ধ শোঁকা তো দূরের কথা। আরও কথা আছে। গির্জার ফাদারকে এখানে আনা হল। তিনি পুরো বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তারপর নিশ্চিত হয়ে বললেন এ-বাড়িতে অশুভ প্রেতাত্মার নজর পড়েছে। এখন আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, তিনটি খুনের পেছনে কার হাত— মানুষ নাকি অশুভ প্রেতাত্মার। আর এজন্য আমরা আবার ঘটনার গোড়ায় ফিরে যাই।

'এ বাড়ির ড্রেসিংরুম থেকে আমি চারটে খালি আলতার শিশি খুঁজে পেয়েছি। শিশিগুলোর গায়ের ফিংগারপ্রিন্ট আর সিনথিয়ার হাতের ছাপ কৌশলে মিলিয়ে দেখা হয়েছে— একদম এক। ওর মতো ধনী কেউ প্রসাধনে আলতা ব্যবহার করবে— এ হতেই পারে না। তা হলে কীজন্য এই আলতা? চট করে মাথায় খেলে গেল সম্ভাবনাটা। হ্যাঁ, তাই, সিনথিয়া বেসিনে রক্তমাখা মুখ ধুত না, ধুত আলতামাখা মুখ। এখন নিশ্চয় বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয় যে, সিনথিয়ার ওপর অশুভ প্রেতাত্মা ভর করার ব্যাপারটা একটা সাজানো নাটক। আর এই নাটকে ফাদারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মিথ্যে একটা বিষয়কে সত্যি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

'এবারে ওই তিনটি আত্মহত্যার কথা আলোচনা করব। প্রথম ঘটনাটি ঘটল মিসেস সরকারকে নিয়ে। বরাবরই তিনি ধীরস্থির স্বভাবের। পারিবারিক জীবনে সম্প্রতি তাঁর ছেলেকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিলেন, তবে তা নেহাতই মামুলি ব্যাপার। এজন্য কেউ নিশ্চয় আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

এরপর রবার্টের কথায় আসি। তার উপর অশুভ নজর পড়েছিল প্রেতাত্মার, এরকম একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও আমরা জানি, এই প্রেতাত্মা-সংক্রান্ত ব্যাপারটা সাজিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাকে।

এবারে আসা যাক মি. সরকারের কথায়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার মানুষ ছিলেন এই সরকার সাহেব। তিনিও, কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে আত্মহত্যা করে বসলেন!

আপনারা শুনলে অবাক হবেন, ওই তিনটি মৃত্যুর সপক্ষে আত্মহত্যার সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ওগুলো আত্মহত্যা নয় একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। কেমন করে খুনগুলো করা হলো এবারে আমি সে কথাতেই যাচ্ছি।

আপনারা অনেকেই "সম্মোহন" শব্দটির সঙ্গে কমবেশি পরিচিত। হ্যাঁ, এই তিনটি খুনের সাথে সম্মোহনের ব্যাপারটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আর এই খুনগুলো যে করেছে

সে একজন ভালো সম্মোহনবিদ। সম্মোহনের মাধ্যমেই সে মিসেস সরকারকে অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেতে বাধ্য করেছিল। একই উপায়ে রবার্টের হাত দিয়েই সে পরিয়েছিল দড়ির ফাঁস। মি. সরকারও সম্মোহনের প্রভাবে বশীভূত হয়ে নিজের গলায় নিজেই ক্ষুর চালিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, খুনগুলো করে কার লাভ? এর সোজাসাপটা উত্তর কিন্তু আমাদের সামনে একটাই— সিনথিয়া! এ বাড়িতে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সেসব কিছুরই হোতা তিনি। সাহায্যকারী হিসেবে সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন ফাদার।' একটানা এতক্ষণ কথা বলার পর থামল শাকিল।

সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল সিনথিয়া। 'বাহ্! এতক্ষণ চমৎকার এক গাঁজাখুরি গল্প শুনলাম আমরা,' শাকিলের দিকে তর্জনী তুলে বলল, 'জানেন, আমাকে জড়িয়ে আমার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে যে-সমস্ত উক্তি আপনি করেছেন সেজন্যে আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা করতে পারি?'

'না, পারেন না,' গর্জে উঠল শাকিল। 'আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, জাদুকর মেঘদূতের দলে কাজ করার সময় আপনি সম্মোহন বিদ্যা শেখেননি?'

'তাতে কী হয়েছে,' সমান তেজে উত্তর দিল সিনথিয়া, 'সম্মোহন বিদ্যা শিখলেই সে তা দিয়ে মানুষকে খুন করবে, একথা কে বলল আপনাকে?'

মৃদু হাসল শাকিল। 'জানি, সহজে আপনি অপরাধ স্বীকার করবেন না। আর সেজন্যে আমি ছোট একটা এক্সপেরিমেন্টের ব্যবস্থা করেছি।' এখানে আসার পর যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ও আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, এবারে তাঁর দিকে চেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল শাকিল, 'এঁর নাম এ.আর. তলোয়ারী, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্মোহনবিদদের একজন। ঘটনার তদন্তে তাঁর এই বিদ্যেটা বিশেষ কাজে লাগবে আমাদের।'

ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীনের নির্দেশে দুটো চেয়ার এনে মুখোমুখি রাখা হল। একটাতে মি. তলোয়ারী আসন গ্রহণ করলেও অন্য চেয়ারটাতে বসতে রাজি হচ্ছে না সিনথিয়া। শেষে ইন্সপেক্টর কড়া গলায় ধমক লাগালেন। কাজ হল এতে। মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্য চেয়ারটাতে গিয়ে বসল সে।

মি. তলোয়ারীর চোখদুটো যেন হঠাৎ ভাঁটার মতো জ্বলে উঠল। সরাসরি মেয়েটির দুচোখে দৃষ্টি রাখলেন তিনি। সম্মোহনী জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল তাঁর দিকে। বুঝতে পারছি, স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে দুজন। দরদর করে ঘামছেন মি. তলোয়ারী; সিনথিয়া শক্তি মেয়েটির উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ কী যেন হল সিনথিয়ার। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন মি. তলোয়ারী। এদিকে একটা মিনি টেপরেকর্ডার আগেই আনা হয়েছিল। এবারে সেটার রেকর্ড বাটনে পুশ করলেন তিনি।

তারপর গমগমে গলায় তিনি সিনথিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

'আপনার নাম কী?'

ক্লান্তি জড়ানো কণ্ঠে উত্তর এল, 'সিনথিয়া গোমেজ।'

'এ বাড়িতে পর পর তিনটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ওগুলোতে কি আপনার কোনো ভূমিকা আছে?'

'হ্যাঁ। ওই তিনটি মৃত্যুর ঘটনাই আমি ঘটিয়েছি। সম্মোহনের মাধ্যমে প্ররোচিত করেছি ওদেরকে আত্মহত্যা করতে।'

'তার মানে ওদের তিনজনকেই পরোক্ষভাবে আপনি খুন করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এবারে একে একে ওই তিনটি খুনের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিন।'

'মিসেস সরকারকে খুন করা নিয়ে বেশি ভাবতে হয়নি। ব্যাপারটা ছিল খুবই সহজ। রাতের খাবার পর তার রুমে প্রবেশ করি। ওই সময় একটা ম্যাগাজিন পড়ছিরেন তিনি। রুমে ঢুকেই এটা-ওটা নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিই। একটু পর সম্মোহিত হয়ে পড়লে তার হাত দিয়েই শিশির সবকয়টা ট্যাবরেট খেতে বলি তাঁকে। তিনি আমার কথামতো শিশির ট্যাবলেটগুলো একটা একটা করে পানি দিয়ে গিলে ফেললেন। মিনিট দশেকের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি। আমিও নিশ্চিত মনে রুম থেকে বের হয়ে এলাম।

'রবার্টকেও নিজের তৈরি ফাঁসে ঝোলাতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। একদিন গল্পগুজব করতে করতে রাত প্রায় দেড়টা বেজে গেল। ভাবলাম, আজই সুবর্ণ সুযোগ। ওকে সম্মোহিত করতে মাত্র মিনিট-দেড়েক লাগল। হুকুম করতেই ফ্যানের আংটার সঙ্গে ফাঁসের দড়িটা ও নিজেই ঝুলিয়ে নিল। তারপর সুবোধ বালকের মতো একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে দড়িটা গলায় গলিয়ে নিল। তারপর নির্দেশ দিতেই লাথি দিয়ে নিজেই সরিয়ে দিল চেয়ারটা। এই সময় কোনোরকম গোঙানির আওয়াজ যাতে বাইরে থেকে শোনা না যায় সেজন্যে ওর রুমের ক্যাসেটপ্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়েছিলাম। একটু পর সব শেষ হয়ে গেলে ক্যাসেটপ্লেয়ারটা বন্ধ করে চলে এলাম রুমে।

'মি. সরকার, মানে আমার প্রয়াত স্বামীকে কীভাবে খুন করলাম এবারে সে কথা বরছি। একদিন রাতের বেলায় কারেন্ট চলে যাওয়াতে তিনি বাথরুমে ইমার্জেন্সি ল্যাম্পটা নিয়ে যেতে বললেন। ওই সময় তিনি রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করছিলেন। বাথরুমে ল্যাম্পটা তার হাতে ধরিয়ে দিতে গিয়ে নজর গেল ধারালো ক্ষুরটার দিকে। ব্যস্। চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আজই শেষ করতে হবে একে। সম্মোহন করতে মাত্র লাগল কয়েক মিনিট। গলায় নিজের হাতে ক্ষুর চালানোর ব্যাপারটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। প্রতিটি খুনের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটানোর আগে তাদের দিয়ে চিরকুট লিখিয়ে নিতে কিন্তু ভুল করিনি।'

'আমরা জানি, রবার্টকে ভালোবাসতেন আপনি, কিন্তু তাকে বিয়ে না করে তার বাবাকে বিয়ে করতে গেলেন কেন?'

'রবার্টকে আমি কখনোই ভালোবাসতাম না; কিন্তু ভালোবাসার অভিনয় করেছিলাম, যাতে এ-বাড়িতে আমার যাতায়াতটা সহজ হয়। এতে দুটো সুবিধে, প্রথমত, প্রেতাত্মার বিষয়টি আমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে; দ্বিতীয়ত, গির্জার ফাদারের সঙ্গে পরিকল্পনা এঁটে পথের কাঁটা দূর করাও সহজ হবে।'

'মি. সরকারের মতো প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কী করতাম। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। হ্যাঁ, আমি বিত্তের লোভেই তাকে বিয়ে করেছিলাম। তার দিক থেকে আমার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও আমি কিন্তু সবসময় ভালোবাসার অভিনয়ই করে গেছি।'

'এসবের সঙ্গে গির্জার ফাদারকে জড়ালেন কীভাবে?'

'ফাদারের সম্পর্কে খোঁজখবর করে জানতে পারি, লোকটা অর্থপিশাচ। আমার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে এমন একজন লোকেরই দরকার ছিল, যার কথা সাধারণ লোকরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে। ফাদারকে মোটা টাকার লোভ দেখাতেই রাজি হয়ে গেল। তাকে দিয়েই প্রতিষ্ঠা করালাম প্রেতাত্মার বিষয়টি।'

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হল। তলোয়ারী সাহেব সিনথিয়াকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। এরপর রেকর্ডকৃত জবানবন্দি বাজিয়ে শোনানো হল ওকে। হিংস্র বাঘিনীর মতো ফুঁসে উঠল মেয়েটি। বলল, 'এসবের এক বর্ণও সত্যি নয়। ইচ্ছে করলে আমিও যে-কারও মুখ দিয়ে এসব কথা বলাতে পারি।'

মেয়েটির চিৎকার-চেঁচামেচিতে কর্ণপাত করলেন না ইন্সপেক্টর। সন্দেহজনক জবানবন্দির ভিত্তিতে তাকে আর ফাদারকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল।

কিন্তু না। বিচারে বিজ্ঞ বিচারক বেকসুর খালাস দিলেন সিনথিয়াকে। সেইসঙ্গে ফাদারও ছাড়া পেলেন। আদালত যুক্তি দেখাল, কারও সম্মোহিত অবস্থায় দেয়া জবানবন্দি আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়। জবানবন্দি অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থায় ও সজ্ঞানে দিতে হবে। এ ছাড়া ওই তিনটি মৃত্যুই যে আত্মহত্যা, তার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এরপর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। একদিন পত্রিকায় দেখতে পেলাম দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতির বিষপানে আত্মহত্যা। খবরটা এরকম 'বিশিষ্ট শিল্পপতি জেমন পি রড্রিকস গতকাল বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সিনথিয়া রড্রিককে রেখে গেছেন...।'

বিদ্যুৎচমকের মতো সম্ভাবনাটা উদয় হল। এ কি সেই সিনথিয়া, নাকি অন্য কেউ? কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য ঠিকানা দেখে হাজির হলাম গুলশানে। বাড়িতে লোকের ভিড়। ড্রইংরুমের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লাম। একটু পর রুমে প্রবেশ

করল এক নারীমূর্তি— আমাদের অতিপরিচিত সিনথিয়া! কুশল বিনিময়ের পর বললাম, 'পত্রিকায় খবরটা দেখেই চলে এসেছি।' প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জানাল ও। এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল ওর সঙ্গে। চলে আসার সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'এবারের এই আত্মহত্যা কি ইতিপূর্বের তিনটে আত্মহত্যার মতই আরেকটা আত্মহত্যা?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন,' সংক্ষেপে জবাব দিল সিনথিয়া। চোখে-মুখে ক্রূর হাসি খেলা করছে।

কয়েকদিন পর এ নিয়ে কথা হল শাকিলের সঙ্গে। পুলিশ নাকি আত্মহত্যার স্বপক্ষেই কিছু আলামত পেয়েছে। সুতরাং পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা এ নিয়ে সিনথিয়াকে কোনোরকম হয়রানি করতে চান না, যদিও ইন্সপেক্টর নিজামউদ্দীন ভিন্নমত পোষণ করেন। যা হোক, ঘটনাটা কয়েকদিন পর চাপা পড়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে শুনেছিলাম সিনথিয়া নাকি ধর্মান্তরিত হয়ে সালমা খান নাম নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে এক ধনকুবেরকে বিয়ে করে দুবাইতে বসবাস করছে।

প্রিয় পাঠক, কল্পনার ড্রাকুলা কিংবা অশুভ প্রেতাত্মার চাইতে বাস্তবের পিশাচিনী এই সিনথিয়ারা অনেক বেশি শক্তিশালী। তারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে যখন-তখন। নিজের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত না-লাগিয়ে তারা ঘটাতে পারে নানান অঘটন। ভবিষ্যতে এই সিনথিয়াই যে আর কোনো অঘটন ঘটাবে না তাই বা কে বলতে পারে।

সুতরাং সাবধান!

কাজী সারওয়ার হোসেন

১৯৩৫ সালের ঘটনা। যদিও সমাজে তখন এখনকার মতো এত সন্ত্রাসী অপরাধ সংঘটিত হত না, তবুও এখানকার চেয়ে থানার সংখ্যা কম ছিল না। বরং সে-সময়কার অনেক থানা বর্তমানে আর নেই অর্থাৎ থানার অফিস পরবর্তীকালে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে; এমনই এক থানা যার নাম নন্দনালী থানা, যা ছিল রাজশাহী জেলার অন্তর্গত; আর আমি ছিলাম সে থানার বড় দারোগা। পুলিশের চাকুরি; সাধারণ মানুষের ধারণা— চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানির আসামিদের নিয়ে কারবার, বড়ই থ্রিলভরা জীবন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেরকম কোনো উত্তেজনাময় ঘটনা ঘটত না। প্রতিদিন অফিসে যেতাম; মাঝে মাঝে ২/৪টি সাধারণ চুরির কেস আসত। আমার জুনিয়র নওশাদই সবসময় যেচে পড়ে সব তদন্তের ভার নিত। ফলে ফাইল প্রস্তুত করা, তা পরীক্ষা করা আর অফিসের পাশ দিয়ে বহমান আত্রাই নদীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় অতিবাহিত করা ছাড়া আমার আর করার কিছু ছিল না।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমি অফিসে বসে স্বাভাবিক কাজকর্ম করছি; এমন সময় এক সেপাই এসে জানাল— স্যার থানার ঘাটে এক লাশ আটকে পড়েছে, মানুষ খুব ভিড় করছে, কী করব? আমি বললাম— কেউ যদি লাশটাকে না চেনে তবে ভাসিয়ে দাও। সেসময় কলেরা দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন অনেক মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। তাদেরই দুই-একটা লাশ ভেসে যায় মাঝে মাঝে। কারও অভিযোগ না পেলে লাওয়ারিশ কোনো মৃতদেহ নিয়ে আমরা অযথা মাথা ঘামাতে যাই না। এই কারণে লাশটিকে ভাসিয়ে দিতে বললাম। পরদিন যথারীতি অফিসে বসেছি ঠিক তখনি সেই সেপাইটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল এবং চোখ বড় বড় করে জানাল— কী আশ্চর্য! গতকালের লাশটাই আবার ঘাটে লেগেছে। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। কেন যেন তাকে পাগল-পাগল মনে হল। কিন্তু মুখে সে-ভাব প্রকাশ করলাম না। বরং চেহারায় আরও গাম্ভীর্য টেনে এনে বললাম— কালকের মতো আবার ওটাকে ভাসিয়ে দাও।

আর কোনো খোঁজ নিলাম না। পরদিন সকাল সকাল অফিসে গেলাম। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে সময় ছিল না। তাই কী আর করা! বসে বসে আমার স্ত্রীর জন্য

কলকাতা থেকে ভি.পি. যোগে পাঠানো শরৎ চ্যাটার্জীর একটা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। বইটা গতকাল এসেছে, কিন্তু ভুলবশত অফিসে ফেলে গিয়েছিলাম। এমন সময় সেই সেপাই আবার আসল এবং বলল— এক অদ্ভুত ঘটনা, স্যার! ঐ লাশটা আরার ঘাটে এসে ঠেকে আছে। আমি তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালাম। বললাম— চলো, লাশটাকে আমি দেখতে চাই।

ঘাটে গেলাম। দেখি— উপুড় হয়ে পানির মাঝে আধডোবা এক মৃতদেহ। ওপরে কোনো ক্ষত দেখতে পেলাম না। পরনে পাতলা শাদা কাপড়ের পাঞ্জাবি, একই রঙের ধুতি। পানিতে বেশ কিছুক্ষণ আগে লাশটা পড়েছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তিন-চার দিনের পুরনো লাশ বলে মনে হল না। তাকে বললাম— তুমি বোধহয় ভুল দেখেছ। কিন্তু কিছুতেই সে তা স্বীকার করতে চাইল না। আমি বললাম— একই রকম পোশাক দেখেছ বলেই বোধহয় তোমার এই ভুল হয়েছে। তারপর আমি নিজে উপস্থিত থেকে লাশটাকে একেবারে নদীর মাঝখানে ভাসানোর ব্যবস্থা করলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ, যতক্ষণ-না লাশটা দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে গেল। তবে একথা আজ স্বীকার করছি যে, লাশটা দেখার পর আমার মনের মাঝে অনেক চিন্তাই এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, কিন্তু একথা আমি মানতে পারছিলাম না যে, এ মৃতদেহ মহামারীতে আক্রান্ত কোনো মানুষের।

পরদিন আবার অফিসে বসেই খবর পেলাম এক লাশ ঘাটে এসে ঠেকেছে। এবার আর সেই সেপাইটা খবর নিয়ে আসেনি। খবর নিয়ে এসেছে আমার সহকারী নওশাদ। সে নিজের চোখে লাশটা দেখেছে। নতুন চাকুরিতে ঢুকেছে। তদন্তের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সে এই লাশ নিয়ে তদন্ত করতে চায়। তবে প্রথমে আমার একটু থাকা দরকার। যদি কোনো পয়েন্ট ভুলক্রমে ছেড়ে আসে— তা ধরিয়ে দেবার জন্য। তার উৎসাহে আমি বাধ্য হয়ে ঘটনাস্থলে গেলাম, কিন্তু সাথে সাথে আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কী করে গতকাল যে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছি তা আবার স্রোতের বিপরীতে এসে ঘাটে ঠেকে! আমি সেই সেপাইটাকে ডাকলাম। সে আসল এবং জানাল— স্যার, আজও আমি লাশ দেখেছি। কিন্তু কিছু বলিনি। কারণ এ লাশের সাথে ভূত জড়িয়ে আছে, স্যার। আপনারাও কিছু করতে যাবেন না। এই লাশ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করলে ভূতরা অখুশি হবে, তাতে খুব ক্ষতি হবে, স্যার।

সব শোনার পর নওশাদ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, একটি মৃতদেহ নিজে একই জায়গায় বারবার চলে আসছে। কিন্তু আমার দুইদিনের ঘটনা যখন ব্যাখ্যা করলাম, তখন বিশ্বাস করল। সাথে সাথে সেই সেপাই, যার নাম বিপুল সাহা, তাকে জেরা করা হল। নওশাদের জেরার মুখে বিপুলকে ভড়কে যেতে দেখলাম। আমি নওশাদকে থামতে নির্দেশ দিলাম। আর বিপুলকে বললাম— লাশ উঠিয়ে

চারদিকে কাপড়ের ঘেরা দেবার ব্যবস্থা করো। আর দেখিস পাবলিক যেন ভিড় না করতে পারে।

অফিসে আসলাম। তারপর নওশাদের সাথে আলোচনায় বসলাম। নওশাদ বলল— বিপুলই পরপর তিনদিন আপনার কাছে ঐ লাশের খবর এনেছে। লাশের ব্যাপারে ওর একটা আগ্রহ আছে দেখছি। কিন্তু যখন আমরা লাশটা উঠিয়ে তদন্ত করতে যাচ্ছি তখন ও ভূতের ভয় দেখিয়ে তদন্ত করতে নিষেধ করছে। আমার মনে হয় ওকে চাপ দিলে আরও কিছু বেরুবে। আমি বললাম— তুমি ঠিকই বলেছ— বিপুলকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। কিন্তু সে-সময় এখনও আসেনি। আমাদের জানা দরকার— এটা যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয় অথবা যদি খুন হয় তাহলে খুনের মোটিভটা কী? আর সেই কারণে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা দরকার। নওশাদ বলল— তাহলে কী করব, স্যার? আমি বললাম— চৌকিদার, দফাদারদের খবর দাও। তারা লাশটাকে চিনতে পারে কি না দেখা দরকার। ও অফিস থেকে বেরিয়ে গেলে আমি লাশের কাছে গেলাম। পোশাক— পাঞ্জাবি, ধুতি আর গেঞ্জি। ধুতির তলে হাফপ্যান্টমতো এলাস্টিকের কোমরওয়ালা শাদা শর্টস। কোমরে মোটা কালো সুতো বেল্টের মতো করে রয়েছে। আর সেই সুতোর সাথে ধুতিটা খুব কায়দা করে পরা বলেই কোমর থেকে ধুতি খসে যেতে পারেনি। তবে পোশাক ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। সারা গায়ে শুধু বালি আর বালি। পেটের কাছে পোশাকটা ছেঁড়া। আর সেখানে বেশ বড় গর্তমতো এক ক্ষত। ছেঁড়া কাপড় আর ক্ষতটা দেখে মনে হল ধারালো জিনিস দিয়ে বেশ জোরের সাথে আঘাত করা হয়েছে। মাথার কাছে কপালে এক কালসিটে দাগ দেখলাম।

এক চৌকিদার লাশটাকে চিনতে পারল। সে জানাল, মৃত লোকটির নাম রথীন্দ্রনাথ সাহা। তার নিজের গ্রামের বাসিন্দা সে। গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। চৌকিদার আরও জানাল, রথীন্দ্রনাথ পাঁচদিন থেকে নিখোঁজ, তার স্ত্রী-সন্তানরা তার খোঁজ করেছিল। কিন্তু তারা খুব উদ্বিগ্ন হয়নি; কারণ লোকটি ছিল শিল্পীমনা এক যাত্রাপাগল মানুষ। যাত্রাদলে অভিনয় করত। সেই কারণে মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে সে উধাও হয়ে যেত। আবার হয়তো দুই-এক মাস পর বাড়ি ফিরে আসত। এটা স্ত্রী-সন্তানের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত জমিজমাতে তার সংসার ভালোই চলত। খুব নিরীহ ও গোবেচারা টাইপের মানুষ ছিল সে। কোনো সময়ই কারও সাতেও থাকত না পাঁচেও থাকত না। এরকম নির্বিবাদী লোক কারও হাতে খুন হতে পারে ভাবাও যায় না। তার গ্রামটি থানা থেকে দশ মাইল পুবদিকে।

তার স্ত্রী-সন্তানদের খবর দেয়া হল। তারা এসে লাশটাকে শনাক্ত করল। তারপর ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট আর চালান প্রস্তুত করে মহকুমা সদরে ময়না তদন্তের জন্য লাশটিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম।

রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী জানাল, নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন তার খুড়তুত ভাই-এর সঙ্গে রথীনের খুব ঝগড়া হয়েছে। কারণ রথীনের খুড়তুত ভাইটা পাঁড় মাতাল, অকর্মণ্য লোক। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে বেড়ায় আর সারাদিন মদের আড্ডায় সময় কাটায়। সংসার যে তার কিভাবে চলছে— এ খবর সে কোনোদিনই নিত না। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ নিজের সংসারের ব্যাপারে অমনোযোগী হলেও তার ভাই-এর সংসারের ব্যাপারে খোঁজখবর নিত এবং যথাসাধ্য সাহায্যও করত। এ নিয়ে অবশ্য অন্য কারও মাথাব্যথা না থাকলেও দুষ্ট লোকেরা তার ভাই-এর সুন্দরী বউয়ের দিকে ইঙ্গিত করে হাসাহাসি করত। কিন্তু কোনো সময়ই মানুষ স্পষ্ট কোনো প্রমাণ আজতক পায়নি।

ঘটনার দিনটি ছিল রথীন্দ্রনাথের নিখোঁজ হবার আগের দিন। হাটবার। লক্ষ্মীপুরের হাট কেবলই জমতে শুরু করেছে। এসময় মদ খেয়ে তার ভাই বোতল হাতে করে বেরিয়েছে। ঠিক তখনই রথীন্দ্রনাথের মুখোমুখি। নেশাখোর মানুষ বলে টাকার অভাব তার লেগেই থাকে। তাই বোধহয় সে টলতে টলতে রথীন্দ্রনাথের কাছে টাকা চায়। মাতাল অবস্থায় এমনভাবে টাকা চাওয়াতে রথীন্দ্রনাথের মেজাজ যায় চড়ে। সে খুব জোরগলায় বলে উঠে— এত লোকের সামনে মাতাল হয়ে টাকা চাইতে লজ্জা করে না তোর!

সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো গলায় উত্তর দেয় ভাই— আরে, রাখ তোর লজ্জা! অমন খাসা একখান জিনিস দিয়ে রেখেছি, আর তুই টাকা দিবি না!

হৈচৈ শুনে হাটের অনেক লোক জমা হয়ে গিয়েছিল। এত লোকের সামনে লজ্জায় রাগে রথীন্দ্রনাথের চেহারা লাল হয়ে যায়। এবং সেও প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে তার ভাইয়ের গালে এক থাপ্পড় মেরে বসে। এতে তার ভাই বোতলটি ভেঙে রথীনকে আঘাত করতে এগিয়ে আসে। লোকজন তাকে ধরে ফেলে। রথীন্দ্রনাথ সরে যায়, আর তার ভাই চিৎকার করতে থাকে— তোকে আমি দেখে নেব রে শালা, এ মদের বোতল দিয়েই তোকে খুন করব। তুই আমার ঘরে আগুন লাগিয়েছিস।

রথীন্দ্রনাথের স্ত্রীর কাছে জানবার পর, চৌকিদারের মুখ থেকেও ঘটনাটি শুনলাম। একই রকম ঘটনা শুনে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে নিলাম। নওশাদ বলল— স্যার, এখনই লক্ষ্মীপুর যাওয়া দরকার। রথীনের ভাইকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আর একজন সাক্ষী পেলেই আমরা তার অপরাধ কোর্টে প্রমাণ করতে পারব।

আমি বললাম— যাও, তবে ওকে বোধহয় আর ধরতে পারবে না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম— আমিও তোমার সাথে যাব।

সে বলল— কেন, স্যার? আমি একাই ওকে ধরতে পারব।

আমি বললাম— আমার যাওয়া দরকার। কয়েকজনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে

চাই। খুনের মোটিভটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

সে বলল— এখানে তো কোনো রহস্য নেই, স্যার! রথীনের ভাইকে ধরতে পারলেই সব জট খুলে যাবে। তখন শুধু দরকার হবে একজন সাক্ষীর।

আমি বললাম— তাকে ধরা জরুরি, তবে আমার মনে হয় তাতে সমস্যার সমাধান হবে না।

আমি আর আমার জুনিয়র ঘোড়ায় চেপে রওনা হলাম। দ্রুত যেতে পারলাম না। কারণ একজন সেপাই আর চৌকিদার আমাদের ঘোড়ার সামনে হাঁটছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। গ্রামের মাতব্বরসহ বেশ কজন লোক আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। তারা বলতে লাগল— বাবু, রথীনকে খুন করেছে তার ভাই। ও সব পারে। যেই বললাম— তোমরা কেউ সাক্ষী হবে? অমনি সবাই আমতা আমতা করতে লাগল—আমরা তো দেখিনি বাবু, শুধু শুনেছি। আমি বললাম, তাহলে কে দেখেছে, তাকে ডাকো। ওরা বলল— কালু ডোমের ছেলে যতীন দেখেছে, বাবু।

সবাই ওরা প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে আসল যতীনকে। হালকা পাতলা গড়ন, নিরীহ চেহারা যতীনের, বয়স হবে বছর পঁচিশেক। সবাই তাকে চেপে ধরেছে বলার জন্য যে রথীনের ভাই-ই রথীনকে খুন করেছে। সে ভয়ে তখন কাঁপছিল।

আমি বললাম— তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি সাক্ষী হও।

অনেক অনুরোধের পর সে মুখ খুলল এবং বলল, সে খুব ভালো বাঁশি বাজাতে পারে। আর রথীন্দ্রনাথই তাকে যাত্রাদলে সুযোগ করে দেয়। এই কারণে সে রথীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল, তাকে শ্রদ্ধা করত। প্রায় সাথে সাথেই থাকত। ভাই-এর সাথে ঝগড়ার দিনও সে রথীন্দ্রনাথের সাথেই ছিল। সেও রথীনের ভাইকে রুখতে এগিয়ে যায় সেদিন। ফলে রথীনের ভাই তাকেও খুব শাসিয়েছিল। সে বলল—এর বেশি আমি কিছু জানি না, বাবু।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। যতীন ও অন্যান্য লোকের সহায়তায় আমরা রথীন্দ্রনাথের ভাই-এর বাড়ির দিকে এগুতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল— ঐ যে রণেশ যাচ্ছে। রণেশ রথীন্দ্রনাথের সেই ভাই-এর নাম। সুতরাং আমি থামার জন্য তাকে আদেশ করলাম। পুলিশ দেখে সে বেশ হকচকিয়ে গেছে। সেটা মুহূর্তমাত্র, তারপর একটুও দেরি না করে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। নওশাদ আর সেপাইটা পিছু নিল তার। টর্চ নিয়ে এগুতে এগুতে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে জানালা— রণেশ লোকটা বড়ই ঘুঘু, স্যার, নদী সাঁতরে পালিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসে গেল। ডাক্তার মত দিয়েছেন যে,

সর্বপ্রথম কোনো ভারী শক্ত জিনিস দিয়ে কপালে আঘাত করা হয়েছে। এতে করে মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। আর পেটে কাঁচ জাতীয় ধারালো জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, যার কারণে পেটের মাংসপেশি ও ইনটেসটাইনে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণই মৃত্যুর কারণ। লাশের ক্ষতস্থানে ছোট ছোট কাঁচের টুকরা পাওয়া গেছে। কেমিকেল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে— ইনটেসটাইনে অ্যালকোহল জাতীয় কোনো দ্রব্য নেই, তবে কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়ামের উপস্থিতি রয়েছে।

একমাস গত হয়ে গেছে। রণেশকে ধরতে পারিনি। তাই সিদ্ধান্তও নিতে পারছিলাম না যে কী করে মদের বোতলে কেরোসিন এল।

এর মধ্যে নওশাদ একদিন খবর নিয়ে এল, বিপুল সাহার সঙ্গে রণেশের পরিচয় ছিল। সে তার বাড়িতে বেড়াতেও গেছে।

আমি বিপুলকে ডেকে পাঠালাম। চাকুরির ভয় দেখিয়ে, প্রমোশনের লোভ দেখিয়ে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম। সে তো পা ধরে কান্না শুরু করে দিল। তার একই কথা— রণেশের বউ আমার দূরসম্পর্কের মাসি হয়; তার বাড়িতে আমি জীবনে একবারই গেছি। রণেশের পরিচয় থাকলেও, তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না, স্যার। আর রথীন্দ্রনাথকে আমি জীবনেও দেখিনি।

হঠাৎ একদিন এক মহিলা থানায় এসে উপস্থিত। কথাবার্তায় তাকে বেশ সভ্য শিক্ষিতই মনে হল। মহিলাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখলাম। সে জানাল— আমি যতীনের স্ত্রী, আমার স্বামী সাতদিন থেকে নিখোঁজ।

নওশাদকে ডায়েরি করিয়ে নিতে বললাম। খুব চিন্তার মধ্যে পড়লাম। নওশাদ বারবার বলতে লাগল— রণেশকে ধরতে পারলে যতীন আর নিখোঁজ হত না।

পরের দিন খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যতীনের স্ত্রীর লাশ নাকি ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে গেলাম, দেখলাম সুইসাইডের সব আলামতই আছে, সঙ্গে সংক্ষিপ্ত হ্যান্ডনোট— আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। সব ব্যাপারগুলো একসঙ্গে কেমন জট পাকিয়ে গেল।

অনেক গুপ্তচর লাগালাম— কড়া নির্দেশ দিলাম যে করেই হোক রণেশকে খুঁজে বের করো। তার সাথে যতীনকেও খুঁজে বের করতে বললাম। আমার বিশ্বাস ছিল— যতীন মারা যায়নি। কারণ যতীন যদি সত্যি সত্যি মারা যেত তাহলে অবশ্যই তার লাশ কোথাও-না-কোথাও পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা তা পাইনি।

হঠাৎ এক রাতে বিপুল নিখোঁজ হল। আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু পরদিন ভোরে এসে আমার ঘুম ভাঙাল সে। জানাল রণেশের বাড়ি গিয়েছিল, কৌশলে তার খোঁজ নিতে। খোঁজ নিয়েও এসেছে। তার কথামতো নওশাদকে পাঠালাম। সে

বান্দাইখাড়া জেলেপাড়া থেকে রণেশকে সত্যি সত্যি ধরে আনল। কিন্তু কিছুতেই সে স্বীকার করল না যে সে রথীনকে খুন করেছে। তার কথা— বাবু, আমার ভাইকে আমি খুন করিনি। আমার ভাই খুব ভালো লোক। আমি রাগলে ঐরকম খুন তো অনেককেই করতে চাই। কিন্তু জীবনে কাউকে খুন করিনি। যতীনের ব্যাপারেও সে কিছুই স্বীকার করল না। মহাভাবনায় পড়ে গেলাম। কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারছিলাম না।

কয়েকদিন পর এক চৌকিদার খবর আনল যে, হামিদপুরের হাটে সে নিজের চোখে যতীনকে দেখেছে। আমার জুনিয়র তখন থানায় ছিল না। আমি রাতের বেলায়ই কয়েকজন সেপাইসহ হামিদপুরে উপস্থিত হলাম। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই তারা জানাল বাগদীপাড়ায় গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে। আমাদেরকে দেখে হাউমাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠল এবং পা জড়িয়ে ধরে বলল— বাবু, আমাকে ফাঁসি দিন। আমিই রথীনদাকে খুন করেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— কেন এ কাজ করতে গেলে?

সে বলল— আমি মূর্খ মানুষ। বাঁশি বাজাতাম। যাত্রাদলে ঢুকতে খুব ইচ্ছে করত। কিন্তু কোনো সুযোগ পেতাম না। সবাই বলত যে, রথীনদাকে ধরলে সে সুযোগ করে দিতে পারবে। আমি রথীনদাকে বলতেই সে বলল, আমি যদি পদ্মকে বিয়ে করি তাহলে সে সুযোগ করে দেবে। পদ্ম শিক্ষিতা মেয়ে, আমি তার যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু যাত্রায় সুযোগ পাওয়ার লোভে অত চিন্তা না করে বিয়ে করে ফেললাম। কিন্তু আমি খুব অসুখী ছিলাম। কারণ পদ্ম ভালোবাসত রথীনদাকে। আমি তা জানতাম না। ঘটনার দিন আমি বাড়ি গিয়ে দেখি পদ্ম খুব সেজেছে। আমাকে দেখে খুব হকচকিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম— কার জন্য সেজেছ সুন্দরী? সে খুব রেগে গেল। মূর্খ, মাতাল, লম্পট ইত্যাদি বলে গালি দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক চড় বসিয়ে দিই। কাঁদতে কাঁদতে সে চিৎকার করতে থাকে : যাকে ভালবাসলাম সে বউ ছেলে আছে বলে বিয়ে করল না, আর এক মূর্খের হাতে আমাকে গছিয়ে দিল, তাকেও ভালোবাসতে পারলাম না।

একথা শোনার সাথে সাথে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পদ্মর বাবা যাত্রাদলের মালিক ছিলেন, হঠাৎ তিনি মারা যান। তারপর পদ্মরা খুব অভাবে পড়ে। তখন রথীনদা যাত্রাদল কিনে নিয়ে মালিক হয়ে যান। কিন্তু তিনি পদ্মদের সংসারের ভারও নেন। সে সময় পদ্মর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু দুর্নামের ভয়ে তিনি তাকে বিয়ে না করে বিয়ে দেন আমার সঙ্গে। ঝগড়ার পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে মদের দোকানে যাই এবং প্রচুর মদ খাই। সেখানে রণেশ আমাকে শাসিয়ে দেয়— তোর রথীনদাকে সাবধানে থাকতে বলিস। তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলি, রথীনদাকে আমিই খুন করে ফেলব। তারপর বাড়ি ফিরছিলাম। তখন সাঁঝ পেরিয়ে

গেছে। নদীর ধারে রথীনদার সাথে দেখা। তিনি হাতে এক বোতল কেরোসিন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। আমার মাতাল অবস্থা দেখে বকাবকি করতে লাগলেন। আমিও রেগে যাই। হঠাৎ তার হাত থেকে বোতল কেড়ে নিয়ে মাথায় আঘাত করি। সে অচেতন হয়ে পড়ে। তারপর ঐ বোতল দিয়ে তাকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিই। পরে যখন সবাই রণেশকে সন্দেহ করতে লাগল, আমিও বাঁচার একটা পথ পেয়ে সবার মতো বললাম সে-ই খুন করেছে। কিন্তু পরে আমার খুব খারাপ লাগছিল বলে পালিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রীও বুঝতে পেরেছিল যে রথীনদাকে আমিই খুন করেছি। সেও আত্মহত্যা করে।

আবার সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে— বাবু, আমায় ফাঁসির হুকুম দিন। যার জন্য খুন করলাম সে তো আর নেই।

অতঃপর তাকে কোর্টে চালান করি। কিন্তু আজও আমি এ রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারিনি— কিভাবে স্রোতের বিপরীত দিকে এসে লাশটা বারবার থানার ঘাটে এসে ঠেকছিল। তাহলে কি ধরে নেব যে, রথীন্দ্রনাথের অতৃপ্ত আত্মা তার হত্যার বিচারের জন্যই লাশটাকে বারবার থানার ঘাটে নিয়ে আসছিল!

মোহসীন রেজা বায়রন

কুহক

এক

মুঠোফোনটা বিরামহীন জানান দিচ্ছে একটা ফোনকলের অস্থির উপস্থিতি। অদ্ভুত একটা ফোনকল। কারণ মোবাইল ফোনটার ডিসপ্লেতে কোনও নাম কিংবা নম্বরের বদলে ভেসে উঠছে একটি মাত্র শব্দ—'Withheld'।

বিছানার এককোণে পড়ে আছে ফোনসেটটা। ভরা জোছনার আলোয় চকচক করছে রুপালি শরীর। ডিসপ্লেতে হালকা নীল আলো। একদৃষ্টিতে সেটাই শুধু দেখছিল নবনী। কলটা রিসিভ করার ইচ্ছাটুকু মনে জড়ো করতে পারছে না।

অবশ্য ঢাকা থেকে আসার পর কল রিসিভ করা একদম ছেড়ে দিয়েছে সে। কারণ প্রায় সময়ই অপরপ্রান্তে থাকে কোনো কৌতূহলী সহপাঠীর কণ্ঠ, যারা জানতে চায় শুধুমাত্র রাহাতের গল্প। ভার্সিটিতে বোধহয় নবনী-রাহাতের কাহিনীটার চাইতে মুখরোচক খবর বিগত একবছরে আর পাওয়া যায়নি।

কী হল? কেন রাহাত তোকে ফিরিয়ে দিল? সবার সামনে অমন দুর্ব্যবহারই বা কেন করল? তোরা না বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলি? আগেই তো বলেছিলাম...অমন হ্যান্ডসাম ছেলেরা কখনও কারও হয় না! তোরই তো দোষ, কেন গেলি ভালোবাসতে?... ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন আর মন্তব্যকে পাশ কাটাবার জন্যই রীতিমতো পালিয়ে আসা দাদাজানের কাছে। নতুবা বাইশ বছরের জীবনে বাবা-মাকে ছেড়ে একটা রাতও অন্য কোথাও থাকেনি সে।

গত একসপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিনই লজ্জায়, অপমানে মরে যেতে ইচ্ছা হয়েছে নবনীর। রাহাতের সেদিনকার আচরণ মনে করে করে চোখের জলে রাত পার করেছে। দু দুটো বছর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু থেকেছে ওরা। পুরো দিনটা একসাথে কাটাবার পরও সন্ধ্যার সময় কোনো-না-কোনো বাহানা দিয়ে রাহাত চলে আসত নবনীর বাড়ি। যেদিন আসতে পারত না, ফোন করাটা ছিল অনিবার্য। তাও পুরো একটা ঘণ্টা।

সেই মানুষটাই কী করে 'ভালোবাসি' শব্দটা শোনার পর অমন বদলে গেল? ঠিক আছে, নবনীকে সে ভালোবাসে না। তাই বলে ক্লাসের সবার সামনে ওভাবে অপমান করবে? বন্ধুত্বটার সামান্যতম মর্যাদাও কি রাখতে নেই?

নবনী জানে, নবনী বোঝে যে, রাহাত কেন ওকে ফিরিয়ে দিল। সে যে চোখ ধাঁধানো কোনো রূপসী নয়! ডল পুতুলের মতো সেজেগুজে রাহাতের মন ভোলানোর ক্ষমতা যে তার নেই! তার মতো অতিসাধারণ একটা মেয়ে হয়তো কখনোই রাহাতের মতো রূপবান-গুণবান ছেলের ভালোবাসা পাবার যোগ্য নয়। এবং হতেও পারবে না।

মোবাইল ফোনটা এখনও বেজে চলেছে। অবিরাম। অজানা অচেনা একটি নম্বরের অপরপ্রান্তে কেউ একজন তীব্র আগ্রহে ফোন করেই যাচ্ছে। না জানি কী প্রয়োজনে!

ফোনের সেটটা হাতে নিয়ে দীর্ঘ অনেকগুলো মুহূর্ত স্থির বসে থাকে নবনী। তারপর একসময় চাপ দেয় সবুজ বোতামে। কল রিসিভের জন্য।

নবনীর জানা ছিল না যে একটি ফোনকল তার পুরো পৃথিবীটাকে আজীবনের জন্য বদলে দিল!

দুই

'ফোন কেন ধরিস না?'

রাহাত!! ফোনের অপরপ্রান্তে রাহাতের কণ্ঠ। অবিশ্বাস্য ঘটনাটির চমকে হৃৎপিণ্ড যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে যায় নবনীর। অনেক কষ্টে হৃদয়-ভেঙে-আসা কান্নাকে সামলে প্রশ্ন করে,' মোবাইল কিনেছিস বুঝি?'

'না কিনে উপায় আছে? তুই তো গিয়ে দাদার রাজপ্রাসাদে বসে আছিস। এখানে আমি বেচারার কী অবস্থা চিন্তা কর্!'

'আমি চলে গেলে তোর কী? ক্লাসে তো সেদিন অপমানের কিছু বাদ রাখিসনি। আজ আবার কী বলবি?'

পুরুষকণ্ঠের কোমল একটা হাসির ধারা সোজা গিয়ে আঘাত করে নবনীর মনের অভিমানের দেয়ালটিতে। সাথে রাহাতের বলা বাক্যগুলোও।

'আমার নবনীটা কি রাগ করে আছে? খুব বেশি রাগ করে আছে?'

'আমি তোর সাথে কথা বলতে চাই না!'

'উফ! মেরে ফেলবি নাকি? তুই রাগ করলে আমার কী হবে?'

'ঢঙের কথা বলবি না, রাহাত। এসব কী হচ্ছে? বন্ধুদের সাথে বাজি ধরেছিস যে আমার রাগ ভাঙিয়ে দেখাবি?'

'যাকে ভালোবাসিস, তার সম্পর্কে এই ধারণা?'

'কেন? অন্যরকম হওয়া উচিত?'

দীর্ঘ অনেকটা সময় চুপ করে থাকে পুরুষকণ্ঠটি। তারপর একসময় বলে। 'ভালবাসিস এই রাহাতকে?'

কী যে হয় নবনীর। নিজের অজান্তেই বলে ফেলে, 'হ্যাঁ। বাসি।'

'তা হলে চোখ বন্ধ করে আমাকে মনে কর্, নবনী! তোর মনে যতটুকু ভালোবাসা আছে, তার পুরোটা দিয়ে মনে কর্! আমি ঠিক ঠিক তোর কাছে চলে আসব।'

নারীমনটা বুঝতে পারে যে পুরোটাই হয়তো খুব রূঢ় একটা রসিকতা। এই ফোনকল, নরম নরম বাক্য— সবই হয়তো আরও একবার তাকে অপমান করবার, হেয় করবার সূক্ষ্ম চাল। তবুও চোখ বন্ধ করে ভালোবাসার মানুষটিকে মনে করে নবনী। আসলে রাহাতের একটি কথাকেও অবহেলা করার সাধ্য তার নেই।

'হল না, নবনী! আমার জন্য তোর ভালোবাসার প্রতিটি বিন্দুকে জড়ো কর্! এক এক বিন্দু আবেগ আমাকে তোর কাছে নিয়ে আসবে। আমি তোর সামনে চলে আসব।'

কেন যেন কোনো প্রশ্ন জাগে না নবনীর বুকে। অদ্ভুত এক ঘোরের মাঝে সে একাগ্রমনে শুধু কামনা করতে থাকে রাহাতের উপস্থিতি। রাহাত! তার ভালোবাসার

রাহাত।

এবং মাঝখানে পার হয়ে যায় না জানি কত দীর্ঘ সময়। অনেক অনেকক্ষণ পর যখন পরিচিত গন্ধটা নাকে আসে, আলতো একটা স্পর্শ অনুভূত হয় গালে, তখন চোখ মেলে নবনী।

হ্যাঁ, রাহাতই! লম্বা ঋজু দেহটা ঝুঁকে আসে ওর ওপর, ফর্সা গালে শেভ-পরবর্তী নীলচে আভা, জোছনার তীব্র আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। দারুণ অবাক হয়ে নবনী এটা লক্ষ করে যে মানুষটার চোখের মণিদুটো ধূসর-সবুজ। আশ্চর্য! আগে খেয়াল করেনি কেন?

'আমি এসেছি, নবনী! তোর ডাকে আমি এসেছি!' ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে স্বপ্নপুরুষ। আর সেইসাথে নবনীকে নিয়ে যায় তার স্বপ্নের সেই পৃথিবীতে— যা নবনী প্রতি মুহূর্তে কামনা করেছে। বাড়ির শাসন, কেউ দেখে ফেলবার ভয়, রাহাতের আগমনের রহস্য— সব চোখের পলকে কোথায় উবে যায় সেই রাতে। এবং তার পরের আরও অনেকগুলো রাতেও।

অবশ্য সকালগুলোতে ঘুম ভাঙার পর নবনী সবসময় নিজেকে নিঃসঙ্গই আবিষ্কার করত।

তিন

কীভাবে যে মানুষটা সকালে চলে যায়। দীর্ঘ দুটো সপ্তাহেও বোঝা হয়নি নবনীর। এমনকি কখন যায়— সেটাও না। সেই রোজ রাতে ঢাকা থেকে দুঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসে, আবার সকালে ফিরেও যায়। নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয় মানুষটার।

সারাদিন তো আর তাকে ফোনে পাওয়া যায় না। বলে— 'ব্যস্ত থাকি!' অবশ্য রাত হলে নিজেই ফোন করে এবং তারপর তো দেখাই করে। নবনী কয়েকবার ভেবেছে ঢাকায় ফেরার কথা। কিন্তু রাহাত বাধা দিয়েছে। শীতকালীন ছুটিটা শেষ হবার কথা বলে। ঢাকায় ফিরে গেলে তো আর এভাবে সারারাত একসাথে থাকা হবে না।

নবনী বুঝতে পারে যে আসলে ভালো-মন্দ বিচার বোধগুলো ক্রমশ লোপ পাচ্ছে ওর মন থেকে। প্রতিদিনই ভেবে রাখে রাহাতকে বলবে এমন অন্যায়ভাবে দেখা করাটা বন্ধ করবার জন্য। কিন্তু যখন দেখা হয়...তখন যে কী হয়, নবনী নিজেও বুঝতে পারে না। ওসব কথা ঘুণাক্ষরেও আসে না মনে। সদ্য প্রেম পাবার সুখে ভাসতে ভাসতে নবনী চলে যায় অন্য কোনও জগতে।

ঘড়ি দেখে অস্থির প্রেমিকা। এগারোটা চল্লিশ। এই প্রাসাদসম বাড়ির একপ্রান্তে দাদাজান এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে পড়েছে চাকরবাকরেরাও। সবচেয়ে বড় কথা রাহাত আসবার সময় প্রায় হয়ে এল।

মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেতে ভেসে উঠেছে শব্দটি— 'Withheld' রিসিভ করেও চুপ করে থাকে নবনী। কারণ রাহাতকে সে ফোনের অপরপ্রান্তে চায় না। চায় একান্তে নিজের করে পেতে। সকাল থেকেই কেমন অদ্ভুত শরীর খারাপ লাগছে, তবুও প্রতিদিনের মতো আজও নিজেকে সাজিয়েছে সে। রাহাতের মনের মতো করে...শুধুমাত্র রাহাতের জন্য।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হয়। একজোড়া বলিষ্ঠ বাহু পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে নবনীকে। ভেজানো দরজাটা ঠেলে কখন যেন ভেতরে চলে এসেছে রাহাত। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তোমার দেখছি শরীর খারাপ করছে। এখন থেকে আমি একদিন পর পর আসব। কেমন?'

চার

পার হয়ে গেছে আরও চারটা সপ্তাহ। রাহাত আজকাল একদিন/দুদিন নয়, চারদিন পর পর আসে। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে বলে নয়। নবনী অসুস্থ বলে। আর এ কারণে নিজের ওপরই ভীষণ রাগ হয় নবনীর।

কী যে হয়েছে শরীরটার। প্রায় সারাদিনই জ্বর থাকে গায়ে। ওজন কমে গিয়ে চেহারা হয়েছে জ্যান্ত কঙ্কালের মতো। চোখের কোলে মোটা কালো রেখা। চুলগুলো সূক্ষ্ম, খসখসে। অথচ এতসব টেস্ট-ফেস্ট করেও ডাক্তাররা নাকি কিছুই পাচ্ছে না। আবার রোগীর শরীর এত দুর্বল যে মাত্র দুঘণ্টার জার্নি করে ঢাকা যাওয়াও বারণ। বাবা-মা বরং ঢাকা থেকে নামকরা ডাক্তার ধরে ধরে আনছে।

সারাদিন জড়পদার্থের মতো শুয়ে থাকা। এত খারাপ লাগে নবনীর! মা তো আছেই, তবুও সর্বক্ষণ কাছে থাকার জন্য এ-বাড়ির সবচাইতে পুরনো ঝি রমিজা খালাকে নিযুক্ত করেছেন দাদাজান। উপায় না-দেখে তার সাথেই গল্প করে নবনী। সময় কাটায়।

'ডাকতর দেখাই কুনো লাভ হইবো না, আফা।' আঙুলের ডগা থেকে একটুখানি চুন মুখে দিয়ে বলে রমিজা খালা। বরাবরের মতো পা ছড়িয়ে বসে আছে মেঝেতে। ধূসর চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দেয়া।

মৃদু হাসে নবনী, 'লাভ হবে না কেন? ডাক্তার দেখিয়ে লাভ হবে না তো কবিরাজ ডাকব? নাকি ঝাড়ফুঁক লাগবে?'

রসিকতাটুকু ধরতে পারে না রমিজা খালা। বলে, 'ঝাড়ফুঁকই লাগব, আফা। আমি নিচ্চিত। আফনেরে নিশিতে পাইছে গো, আফা। না হইলে ওরম চান্দের লাহান চিহারার এই হাল হয়? নিশিতে পাইলে এইরকম অসুখ লাগে। ডাক্তর দেখাই কুনো লাভ হয় না।'

আজ তবে ভূতপ্রেতের প্রসঙ্গ? বেশ মজাই লাগে নবনীর।

'এই নিশি বস্তুটা কী, রমিজা খালা?'

'নিশি হইলো মায়া। যারে ধরে, তার মনে হয় যে কুনো মানুষ তারে ডাকতাছে। পিরিয়ো মানুষের রূপ ধইরে আসে। ওইসব জিনিসেরা মানুষেরে কাছে ডাকে। তারপর বাঁচার শক্তি চুইষে খায়। ঠেকাইতে না পারলে মরণ নিচ্চিত।'

'যাহ্! কী যে বলো। আমাকে নিশিতে ধরবে কেন?'

'নিশির কি বাছবিচার আছে নাকি, আফা? আমাগো গেরামের আলমগীররে ধরছিল। কেমনে আসতো জানেন? অর তালাক দেয়া বউয়ের রূপ ধইরে। দরজার বাইরে দাঁড়াই চিকন সুরে ডাক পারতো, যেন আলমগীর তারে ঘরে ডাকে। ডাক না দিলে এরা আসতে পারে না। কেমনে যেন অরা টের পাইছিল যে বউয়ের জইন্যে আলমগীরের কইলজা পুরতেছে।'

রাহাত তবে নিশি? ভাবতেও হাসি পেয়ে যায় নবনীর। এসব গ্রাম-গঞ্জের মানুষেরা যে এখনও কী সব কুসংস্কারে বিশ্বাস করে! অবশ্য রাহাতের নামটা মনে পড়তে মনটা বিষণ্ণও হয়ে আসে। খুব ইচ্ছা হয় একনজর দেখতে। একবার কথা বলতে। কিন্তু উপায় নেই। 'Withheld' লেখা ফোনকলগুলোতে নাম্বার পাওয়া যায় না বলে কল ব্যাক করা সম্ভব নয়।

ব্যবস্থা অবশ্য একটা করা যায়। সোনিয়াকে ফোন করবে কি? ফোন করে বলবে রাহাতকে একটা কল দিতে বলার জন্য। অবশ্য রাহাত যদি রেগে যায়? বন্ধুদেরকে ব্যাপারটা জানাতে যে মানা করেছিল।

কিন্তু অবশেষে জয় হয় বিষণ্ণতারই। একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সোনিয়াকে ঠিকই ফোন করে নবনী।

'আরে, নবনী?' ওপাশে উচ্ছ্বসিত সোনিয়া। 'কতদিন ক্লাসে আসিস না! কী হয়েছে রে তোর?'

'একটা কাজে ফোন করেছি তোকে। করে দিবি, দোস্ত?'

'কী কাজ? নোটগুলো পাঠাতে হবে?'

'আরে না! তুই শুধু রাহাতকে বল্ ওর মোবাইল থেকে আমাকে একটা ফোন দিতে। দুদিন কথা হয় না।'

'মোবাইল?' কেন যেন বিব্রত শোনায় সোনিয়ার কণ্ঠস্বর। 'রাহাতের তো কোনও মোবাইল নেই!'

'কে বলেছে নেই?' হাসে নবনী। 'সেদিনও তো আমি দেখলাম।'

'তুই দেখলি? কবে?'

'এই তো, দুদিন আগে। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল।'

'কী বলিস আবোল-তাবোল, নবনী? রাহাত তো একমাস হল আমেরিকা গেছে বাবা-মায়ের সাথে।'

আমেরিকা গেছে? তা-ও একমাস আগে? তা কী করে সম্ভব? মাথাটা এলোমেলো লাগে নবনীর...

তবুও কেন যেন প্রশ্ন করে সোনিয়াকে, 'একটা কথা বল্ তো! রাহাতের চোখের রঙ কী?'

'কী আবার, কালো!'

একবিন্দুও বিশ্বাস হয় না নবনীর। ফোন রেখে তড়িঘড়ি খুঁজে বের করায় ছবির অ্যালবামটা। তবে যা দেখে, তাকেও এতটুকুও সত্যি ভাবতে পারে না।

কালো! কালো! কালো!

প্রত্যেকটা ছবিতে রাহাতের চোখের রঙ কালো। কী করে সম্ভব? সে তো নিজের চোখে প্রতিদিন সবুজই দেখছে!

মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো এবার বের করে নবনী। সবগুলোতে চোখের রঙ সবুজ। অবশ্য প্রথম দুটো সপ্তাহে তোলা একটা ছবিও নেই। সব অন্ধকার। পরের দিককার ছবিগুলো যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। সবচাইতে ঝকঝকে দুদিন আগে তোলা ছবিটা। এত জীবন্ত যেন এখনই কথা বলে উঠবে।

নবনীর চিন্তাধারাগুলো ক্রমশ এলোমেলো হয়ে আসতে থাকে। শুনতে চেষ্টা করে রমিজা খালার কথা, তবে বুঝতে পারে না কিছুই।

'...এরার চউখ কিন্তুক হয় সবুজ রঙ্গের, আফা। সবুজ চউখ দেইখে সাবধান থাকতে হয়। তয় ভরসার কথা হইলো, না ডাকলে এরা আসতে পারবো না। কিচ্ছুতেই না...।'

পাঁচ

নবনী বুঝতে পারছিল না কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা ভ্রম। কোথায় আলো, কোথায় অন্ধকার। কে ভালোবাসা, কে কুহক! আসলে এতসব বিশ্লেষণের মতো মানসিক কিংবা শারীরিক জোর তখন আর বেচারির মাঝে অবশিষ্টই ছিল না। প্রচণ্ড জ্বরে প্রলাপ বকতে বকতেই পার হয়ে গেল দুটো দিন। এবং চতুর্থ রাতে...

নিজের সবটুকু মানসিক জোর একত্রিত করে মনকে জাগিয়ে রেখেছিল নবনী। কিছুতেই হারাতে দিচ্ছিল না ঘোরের মাঝে। ঠিক প্রথমদিনকার মতোই বসে ছিল বিছানার এককোণে। তীব্র জোছনার আলোয় চকচক করছিল মোবাইল সেটটার রুপালি শরীর। ডিসপ্লের নীলাভ আলো ব্যাকুল হয়ে জানান দিচ্ছিল 'Withheld' লেখা একটা ফোনকলের উপস্থিতি। রাহাতের উপস্থিতি!

সত্যি কি রাহাত? অশ্রুবিন্দুগুলোকে আজ আর কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না নবনী। মস্তিষ্ক বারবার বলে— 'রাহাত নয়, মায়া! কুহকের ডাক। মোবাইল সেটটাকে চিরদিনের মতো ফেলে দাও, নবনী। জলদি করো। নতুবা আজই হয়তো তোমার শেষরাত!'

অথচ মনের যে কী হয়। হৃদয়টা নিশপিশ করে কল্ রিসিভ করার জন্য। অস্থির হয়ে ওঠে রাহাতের ডাকে সাড়া দিতে। হ্যাঁ, রাহাতই! নবনীর রাহাত। মায়া হোক, কুহক হোক...যাই হোক না কেন, এই রাহাতই নবনীকে কাছে টেনেছে। ভালোবেসেছে! এই রাহাতটা ছাড়া নবনীর যে আর কিছু নেই।

'রাহাত নয়, নবনী! কুহক!' সাবধান করে মস্তিষ্ক। 'তোমাকে বাঁচতে হবে, বোকা মেয়ে। জীবন কত সুন্দর!'

'না, সুন্দর নয়।' বাধা দেয় অবুঝ মন। 'রাহাতকে ছাড়া তোমার জীবনের কিছুই সুন্দর নয়। ডাকো রাহাতকে, নবনী! তোমার কাছে আসতে দাও। আজ যদি শেষ রাত হয়, তবুও।'

'না, নবনী। কিছুতেই না!'

'হ্যাঁ, নবনী।'

'এটা রাহাত নয়। তোমার মনের ভ্রম।'

'সে তোমার রাহাত! শুধু তোমার। তোমার অপেক্ষায় একটা একটা করে প্রহর গুনছে সে।'

একসময় পরাজিত হয় মস্তিষ্ক। জিতে যায় মন। খুব সহজভাবেই মোবাইলের কলটা রিসিভ করে নবনী।

অবশ্য সে তখন জানত যে আজকের রাতেই তার জীবনের শেষ অধ্যায়টার সমাপ্তি হবে।

পরিশিষ্ট

পরদিন সকালে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে অদ্ভুত একটা মানুষকে দেখেছিল সোনিয়া। একদম রাহাতের মতো। হুবহু! শুধুমাত্র চোখজোড়া সবুজ। আশ্চর্যরকম সবুজ!

সোনিয়ার রিকশা যখন মানুষটাকে পাশ কাটাচ্ছিল, তার মুখে ছিল অপার্থিব একটা হাসি। অবিশ্বাসীদের দিকে তাকিয়ে লোকে যেমন হাসি হেসে থাকে, ঠিক সেইরকম।

জানে না কেন, চোখজোড়া অদ্ভুত অস্বস্তিতে ফেলে সোনিয়াকে। চাপা একটা শিহরন ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেহে। এবং ক্রমশ মনেও।

তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে সোজা হয়ে বসে সোনিয়া। রিকশার হুডও তুলে দেয়। কী আশ্চর্য মিল লোকটার রাহাতের সাথে। কথাটা তবে সত্যি– 'পৃথিবীতে একই চেহারার দুজন মানুষ থাকে!'

মোবাইল বাজছে। অস্থির হয়ে।

তাড়াতাড়ি ফোনটার খোঁজে ব্যাগ হাতড়ায় সোনিয়া। তার জানা নেই যে এই ফোনকলটি তাকে নবনীর মৃত্যুসংবাদ দেবে!

রুমানা বৈশাখী

ভূতুড়ে ক্রিকেট ম্যাচ

সন্ধ্যার পর লং বারো-এর পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ক্রিকেট মাঠ হিসাবে লং বারো এককালে খুব বিখ্যাত ছিল। গ্রীষ্মকালে এখনও এখানে ক্রিকেট খেলা হয়। এখন শরৎ। দিনেরবেলায় এটা খালি পড়ে থাকে। রাতের বেলায় হালকা কুয়াশায় ঢাকা থাকে। এক পাশে গাছগাছালির পর আছে একটা ঝর্না। সেখান থেকে বাতাসে ভর করে ফিকে কুয়াশা এসে মাঠটাকে ঢেকে দেয়। মনটা কেন জানি বিষণ্ন হয়ে গেল।

এসব যখন ভাবছি, তখন গাড়ির ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে পড়ল এক বুড়োলোকের উপর। তিনি বসে আছেন কাঠের একটা টুলে। তাকিয়ে আছেন কুয়াশাচ্ছন্ন মাঠটার দিকে। ঠাণ্ডা বাতাসে হালকা কুয়াশার আবরণ নামছে, উঠছে, আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মাঠটার দিকে। বুড়োমানুষটার উপস্থিতি নীরবতাকে যেন আরও প্রকট করে তুলেছে। গাড়ির আলোটা তার উপর থেকে সরে গেল। কানে ভেসে এল হাততালির শব্দ। বুড়োলোকটা হাততালি দিচ্ছে। মাঠটাতে নিশ্চিতভাবে তিনি কিছু দেখছেন আর বাহবা দিচ্ছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ অস্বাভাবিক লাগল। তাই পরের দিন আমার এক বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম।

আমার বন্ধুটির নাম মেডলি। আমার কথা শুনে সে বলল, 'তুমি বোধহয় বুড়ো মোডজারের কথা বলছ। ওই মাঠের তদারকি করতেন তিনি। ক্রিকেট পিচটা তাঁর হাতেই বানানো। অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। এখন বয়স মনে হয় আশি হবে।'

'তা তো বুঝলাম,' বললাম আমি, 'সেদিন তিনি ওখানে কী করছিলেন?'

'সেটাই তো আসল সমস্যা,' বলল মেডলি। 'এই বুড়োবয়সে ঠাণ্ডায় ওখানে বসে থাকা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা তাঁকে থামাতে পারছি না।'

'থামাতে পারছ না মানে?'

'তার ধারণা, প্রতি রাতে সেখানে ক্রিকেট খেলা হয়। তিনি সেই খেলা দেখতেই ওখানে যান।'

'বলো কী!' অবাক হলাম আমি।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওখানে তিনি কাদের খেলা দেখেন?' প্রশ্ন করলাম।

'বিখ্যাত সব খেলোয়াড়, যাঁরা মাঠটাতে একসময় ক্রিকেট খেলেছেন। তাঁরা কেউ আর আজ বেঁচে নেই। আমরা চেষ্টা করেছি ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে যে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'তাতে কি তাকে থামানো যাবে? বা ব্যাপারটা তিনি মেনে নেবেন?'

'না, মেনে নেবেন না। তিনি ভূতের ক্রিকেট খেলা দেখতে চান। পাগল প্রমাণ করতে হলে দুজন ডাক্তারের মতামত লাগে। আমরা একজনের পেয়েছি। আরেকজন বলছে, ভূত যে আছে তিনি সেটা কীভাবে প্রমাণ করবেন? তাই মোডজারের কাছ থেকে দূরে আছেন তিনি।'

বন্ধুর কথা শুনে ঠিক করলাম, এই ধরনের পাগল লোকের কাছ থেকে আমারও দূরে থাকা উচিত। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

এক সপ্তাহ পর। শরৎ বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ঠাণ্ডা এবং কুয়াশা দুটোই বেড়েছে আগের চেয়ে। সন্ধ্যার পর সেই মাঠটার পাশ দিয়ে আজ আবার আমি যাচ্ছি। আগের মতোই বুড়োলোকটা টানাদৃষ্টিতে মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি পাগল, এই সার্টিফিকেট তারা যোগাড় করতে পারেনি। তাই তিনি বসে বসে ভূতের ক্রিকেট খেলা দেখছেন।

পরের দিন মেডলির কাছে আবার গেলাম। বললাম, 'তার সাথে খোলামেলা আলোচনা করলে হয় না?'

'এতে কোনো কাজ হবে না। ভূতের ক্রিকেট খেলা তিনি দেখবেনই, এ ব্যাপারে কারও কথা শুনবেন না।'

বুড়োলোকটার প্রতি কেমন জানি একটা মমতা অনুভব করলাম। হাজার হোক বুড়োমানুষ, এই ঠাণ্ডায় কষ্ট করবেন কেন। তাই বললাম, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব? ভদ্রলোক নিশ্চয় ঠাণ্ডায় মরতে চান না?'

'পাগলামি করে কেউ মরতে চায় না, আবার তারা পাগলামিটাও ছাড়তে চায় না। এই হচ্ছে আসল সমস্যা। বুড়ো মোডজারের অবস্থা এখন ঠিক তাই।'

'তারপরও একবার চেষ্টা করে দেখি,' বলে সেদিনের মতো মেডলির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরের রাতে বাসে করে আমি লং বারো ক্রিকেট মাঠে গেলাম। দেখি আগের মতোই তিনি টুলটাতে বসে আছে। খেলা দেখছেন। আমি অবশ্য কিছু দেখতে পেলাম না। তার পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি দ্রুত আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর তাকালেন মাঠের দিকে। সেখানে হালকা কুয়াশা। চারদিক নীরব। লোকালয় থেকে অনেক দূরে আমরা।

তিনিই প্রথম কথা বললেন। 'ওরা ব্যাট করতে নামছে,' বললেন তিনি। 'সবাই

বিখ্যাত খেলোয়াড়। আপনি ওদের চেনেন?'

'কয়েকজনকে চিনি,' উত্তর দিলাম আমি।

'ওরা প্রায়ই এখানে খেলতে আসে,' বললেন বুড়ো মোডজার।

'আর আপনি ওদের খেলা দেখতে আসেন?'

'হ্যাঁ। একটাও মিস করি না।'

'কুয়াশা আর ঠাণ্ডায় আপনার এখানে আসা কি ঠিক হচ্ছে?' মনের কথাটা বললাম।

'মুশকিল হল, ওরা তো দিনের বেলায় কখনও খেলে না,' তাঁর সোজা উত্তর।

'ঠাণ্ডায় কষ্ট পান না?'

'আমি গরম কাপড় পরে আসি,' বললেন বুড়ো। 'তা ছাড়া, আমি এখানে দু-ঘণ্টার বেশি থাকি না। খেলা জমে উঠলে অবশ্য সহজে উঠতে পারি না। তখন পুরো খেলাটা দেখতে হয়। তারপর বাড়িতে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।'

হঠাৎ তিনি হাততালি দিতে শুরু করলেন।

ভদ্রলোক যদি এখানে দু-ঘণ্টার বেশি না থাকেন এবং গরম কাপড় পরে আসেন, তা হলে চিন্তার তেমন কারণ আমি দেখছি না। শীতকাল এলে সেটা অন্য কথা। শীত আসতে এখনও অনেক দেরি।

আজকের খেলার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন তিনি আমাকে। এমনকি স্কোর পর্যন্ত।

তারপর মেডলিকে বোঝালাম, শীত না-আসা পর্যন্ত বুড়োলোকটাকে তাঁর মতো থাকতে দেয়াই উচিত। মনে হয় মেডলি ব্যাপারটা বুঝল।

কিন্তু শীত আসার আগেই বুড়োলোকটা মারা গেল।

লোকটার বয়স, মেডলি যা বলেছিল, তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল। তার স্ত্রীর কাছে শুনলাম, মৃত্যুর সময় মোডজারের বয়স হয়েছিল নব্বুই।

নব্বুইতম জন্মদিনে মোডজার স্ত্রীর সাথে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। হালকা কুয়াশা জানালা পর্যন্ত উঠে এসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁকে তখন খুব অস্থির মনে হয়েছিল। এরপর স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, লংবারোর মাঠের খেলোয়াড়রা তাঁকে তাদের টিমে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কারণ তাঁর বয়স এখন নব্বুই। তিনি খুব খুশি। কারণ তিনিই একমাত্র জীবিত মানুষ যাঁকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

এরপর ক্রিকেট ব্যাট হাতে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে থামাতে পারেননি।

'আমি মাঠে গিয়ে দেখি তিনি পিচে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন,' বললেন মিসেস মোডজার। 'ব্যাট করার জন্য প্রস্তুত। তারপর চালাতে লাগলেন ব্যাট।'

'তিনি দৌড়ে রান নিলেন?' জানতে চাইল মেডলি।

'আমার মনে হয় তিনি তখন চার কিংবা ছয় মারছিলেন,' উত্তর দিলেন মিসেস মোডজার। 'আমি সেখানে পুরো সময়টা ছিলাম। তাঁর খেলা দেখছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বাড়ি আনতে পারিনি। পিচের অন্যপাশের খেলোয়াড়ও মনে হয় বাউন্ডারি মারছিল। আমি অবশ্য আমার স্বামীকে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। এরপর তিনি দৌড়ে রান নিতে লাগলেন। আধঘন্টা পর তিনি টুপি খুলে চারদিক তাকালেন। ব্যাট উঁচু করে ধরলেন। মনে হয় তিনি শতরান পুরো করেছিলেন। তাঁকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল। তারপর ঘটল সেই দুর্ঘটনা। তিনি রান নিতে গিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। উঠতে পারলেন না আর। আমি গিয়ে দেখি তিনি মারা গেছেন।'

আমরা দুজনই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমরা জানি এতে তাঁর কষ্ট দূর হবে না। তাঁর বিষণ্নতার মাঝে যেন লুকিয়ে ছিল হালকা খুশির আমেজ। তিনি বললেন, 'তাঁকে আমরা কখনও আটকাতে পারিনি। ভালোই হল। তিনি এখন যখন খুশি ক্রিকেট খেলতে পারবেন তাঁর প্রিয় ক্রিকেটারদের সাথে। কারণ এখন তিনি তো মুক্ত!

এর কোনো উত্তর আমরা দিতে পারলাম না।

মূল : লর্ড ডানসেনি
রূপান্তর : সরোয়ার হোসেন

পৈশাচিক সম্মোহন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম কেনটাকির নদী আর বনবনানীর শ্যামলিমা আপনাকে নিয়ে যাবে অন্য জগতে। কিন্তু সারি সারি কবর আর গীর্জার পুরোহিতদের সতর্কাবস্থা অন্য এক অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিম পিশাচ যেন ওঁৎ পেতে আছে এক নতুন শিকারের আশায়।

জুলাই, ১৯৯৬-এর একটি ঘটনা। জেনেট হার্পার আমেরিকার পোস্টাল ডিপোর্টমেন্টের এক কর্মকর্তা। তাঁর স্বামী বিলও একই পেশায় রয়েছেন, তাঁর দুই সন্তান। ১৬ বছরের মেয়ে টেরি এবং ৫ বছরের কডি। কডির জন্য তিনি এক বেবিসিটার নিয়োগ করেন। বাসায় ফিরলেন জেনেট। তাঁর স্বামী আগে কাজ সেরে আসেন। ওইদিন ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন। সবকিছুই স্বাভাবিক। এমন সময় ন্যানি বললেন, 'কডি অস্থির আচরণ করছে।'

'মানে?' উদ্বিগ্ন হলেন মিসেস হার্পার।

ন্যানি বললেন, 'সে আজ আমাকে এমন কিছু কথা বলেছে—যা বলা উচিত নয়। আমাকে অশ্লীল কথা বলেছে।'

হায় হায় করে উঠলেন মিসে হার্পার।

'আবার সে একটা অদৃশ্য-কাল্পনিক বন্ধুও তৈরি করে ফেলেছে,' ন্যানির উক্তি।

'তা তো সব বয়সের বাচ্চাদের থাকে। তা কখন থেকে তার এই কাল্পনিক বন্ধুর নাম কী?'

'আমি পিছনের মাঠে বসে ছিলাম। কডি খেলা করছিল। হঠাৎ সে আপনাআপনি কথা বলা শুরু করল। আমি অবাক হলাম, কাউকে দেখলাম না, অসম্ভব ভয় পেয়ে ওকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলাম।'

'এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? বাচ্চাদের কল্পনাশক্তি এতে বৃদ্ধি পাবে,' মিসেস হার্পার এবার কডিকে বললেন, 'কডি তোমার বন্ধুর নাম কী?'

ছোট্ট কডি চুপ করে রইল। এরপর সহজ সরল গলায় বলল, 'আমার বন্ধুর নাম ম্যান (MAN)।'

'ম্যান? ও আচ্ছা। এখন ও কোথায়?'

'ও তো চলে গেছে।'

মিস্টার হার্পার বললেন, 'আরে, রাখো-রাখো। বাচ্চারা অনেক কথাই বলে। ওই তো আবার ম্যানের সাথে কথা বলছে।'

মিসেস হার্পার চমকে গেলেন। কড়ি একা একা কথা বলছে, শোনার চেষ্টা করলেন।

কড়ি তার কাল্পনিক বন্ধুকে বলছে : 'এই ম্যান, কখন এলে?'

'কেমন কাটালে ওখানে?'

'শুনে ভালো লাগল। কী খেয়েছ?'

... ...

'খাও না? কী বলো, আমি তো খাওয়া ছাড়া কিছুই বুঝি না।'

ছোট্ট কড়ির কথায় হেসে দিলেন মিসেস হার্পার। তারপর বললেন, 'কড়ি, খেতে আসো। ম্যানও খেতে পারত কিন্তু ও কি খায়?'

'শুনেছ তো, ও খায় না।' এই বলে কড়ি বলল, 'ম্যান এখন যাও। আমি খাব। কালকে কথা বলব।'

বদ্ধ ঘরের জানালার পর্দা কিছুটা নড়ে উঠল, সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়াল কড়ি। 'Bye Bye, Man.'

আর মিসেস হার্পার বললেন, 'কী কাকতালীয়!' কে জানত তাঁর মধ্যে কিছু ভীতি কাজ করছিল কি না!

সেই রাতে। টেরি ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ সে তার বিড়ালের গর্জানোর শব্দে জেগে উঠল। কী ব্যাপার, বিড়াল গর্জাবে কেন? টেরি হঠাৎ শুনল তার দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। আঁচড়াচ্ছে। একটা ক্ষীণ গর্জন শুনতে পেল সে। কী সেটা? যেন পাতাল থেকে উঠে আসা কোনও দানবের হুঙ্কার। ভয় পেয়ে সে দ্রুত পিছনের দরজা দিয়ে তার মায়ের ঘরে চলে গেল। মিসেস হার্পারও ভয় পেয়ে গেলেন। 'কী হল?'

টেরি তাকে খুলে বলল পুরো ঘটনা।

'ওটা তোমার মনে ভুল।' মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন তিনি। নিজেকে কিছুটা আশ্বস্ত করতেই কি কথাগুলো বলেছিলেন তিনি? পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙল মিসেস হার্পারের। শুরু হল নতুন দিন। তিনি গোসল করতে গেলেন। গোসল শেষে তিনি যখন কাপড় পরছেন, তখন বাথরুমের অস্বচ্ছ কাচের উল্টোপার্শ্বে দেখলেন এক ছোট্ট ছেলের ছায়া। নিশ্চয়ই কড়ি। দরজা খুলে দেখলেন কেউ তো নেই! কে ছিল? ছায়া এত দ্রুত সরে গেল কী করে? হঠাৎ মেঝেতে চোখ গেল। কার্পেটের উপর দুটো জুতোর কালো ছাপ। নিশ্চয়ই কড়ি...কিন্তু কীভাবে? কড়ির তো এরকম কোনও সোলওয়ালা জুতো নেই। ছুটে গেলেন কড়ির ঘরের দিকে। 'কী হল কড়ি...' বলতে গিয়ে থেমে গেলেন—কড়ি অঘোরে ঘুমাচ্ছে আর তার জুতোজোড়া নিচে পড়ে আছে। সেই জুতোর সোল—

অন্য জুতোর সোল খুঁজলেন—কিছুই নেই। কে ছিল সেই ছায়া? ম্যান নাকি? কীভাবে? সে তো কাল্পনিক!

'আচ্ছা এমন কি হতে পারে না কোনও মৃত ছেলের আত্মা বা আদিম পিশাচ আমার কডিকে ভর করেছে?' আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল মিসে হার্পারের— 'তা কী করে হয়, পৈশাচিক ব্যাপার কি বাস্তব হয়?' আবার মনের কালো দিকটা জেগে উঠে বলল, 'খ্রিস্টানধর্ম পিশাচে বিশ্বাস করে, পৈশাচিক প্রভাব বিতাড়নে রিচুয়ালের আয়োজন করে।' আর পোপ দ্বিতীয় জনপল তো নিজেই বলেন— 'তুমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো তা হলে পিশাচে বিশ্বাস করবে।' তা ছাড়া তিনি জীবনে দুটো পিশাচ বিতাড়নে অংশ নেন।

দোটানায় পড়ে গেলেন জেনেট। ভাবলেন, কর্ডিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কডি রাতের বেলা ম্যানের সাথে খেলছিল। মিসেস হার্পার তাকে খেতে ডাকলেন।

'না, আমি ম্যানের সাথে খেলব।'

'না, এখন খেতে আসো।'

অনেক চেষ্টার পর কডি খেতে এল। কডিকে মিসেস হার্পার বললেন, 'কডি, ম্যান সম্পর্কে কিছু বলো।'

কডি বলা শুরু করল 'ম্যান ছিল এক ছোট্ট ছেলে। একদিন শয়তান লোকরা অপহরণ করে তার মায়ের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়, অনেক খারাপ-খারাপ কাজ করে।' কডি এই বলে কাঁদতে লাগল।

মিসেস হার্পার জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যান কি মারা গেছে, কডি?'

কাঁদতে কাঁদতে কডি বলল, 'হ্যাঁ।'

মিসেস হার্পারের দুঃস্বপ্ন সত্য হল।

দিন যায়, মাস যায়—বছরও ফুরায়। ম্যান কডির সমস্ত সত্তা দখল করে নেয়। এরপর থেকে মিসেস হার্পার কেনটাকির আর্কাইভ খুঁজতে লাগলেন ম্যান নামের কোনো ছোট্ট ছেলের হত্যার খবর। বিস্ময়করভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে যে সময় (১৯৯৬) আর্কাইভ রাখা কোনো খবর পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে তিনি এক রেড ইন্ডিয়ান পাদরি সাথে দেখা করেন।

পাদরি বললেন, 'ওই মৃত ছেলের আত্মা আপনার ছেলের (কডির) ক্ষতি করতে পারে, তাই এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি একটি প্রাচীন রেডইন্ডিয়ান রিচুয়ালের ব্যবস্থা করতে পারেন। একটি পাত্রে জলপাই পাতার আগুন জ্বেলে সেই ধোঁয়া সারা বাসায় ছড়াবেন এবং প্রার্থনা করবেন ঈশ্বরের কাছে ওই মৃতছেলের আত্মার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তা ছাড়া জলপাইয়ের তেল দিয়ে সারা বাড়ির সীমানা বন্ধ করে দিতে হবে।'

সেই মতো রিচুয়ালের ব্যবস্থা করলেন মিসেস হার্পার। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন ভগবানের উদ্দেশে, যেন সেই মৃত ছেলের আত্মা চলে যায় সে যেখান থেকে

এসেছিল।

রিচুয়ালটি সম্ভবত সার্থক হল—অন্তত মিসেস হার্পার তাই ভেবেছিলেন। তা হলে ভালোই হত। কডি আগের মতো হয়ে গেল, মিস্টার ও মিসেস হার্পার ফিরে পেলেন সন্তানকে এবং টেরি ফিরে পেল ছোটভাইকে।

তিন মাস ভালোই গেল, কিন্তু...

১৯৯৭ সালের অক্টোবর। মিসেস হার্পার এক সকালে কাপড় গুছাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন কডি বসে খেলছে তার খেলনা দিয়ে, সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক। হঠাৎ কডি কথা বলা শুরু করল, 'Man, where have you been since thesr days? How are you?'

সে মুহূর্ত থেকে মিসেস হার্পার বুঝলেন, ম্যান ফিরে এসেছে এবং প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরবে না। তাঁর ধারণা সত্যে পরিণত হল। ম্যান কডির উপর চেপে বসল। কডি খাওয়াদাওয়া ভুলে গেল এবং শুধু ম্যানকে নিয়ে থাকল।

একদিন মিসেস হার্পার কডির ঘরে গেছেন গুছাতে। কডির কাপড়ের বোর্ড খুললেন। কটু গন্ধ বের হচ্ছে। সমস্ত কাপড় ভিজা, বুঝতে কষ্ট হল না মিসেস হার্পারের কী ঘটেছে। তিনি সাথে সাথে কডিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কডি তুমি ওখানে প্রস্রাব করলে কেন? তোমার তো বাথরুম ছিল।'

কডির সাথে সাথে উত্তর, 'ম্যান বলেছে।'

'ম্যান বলেছে দেখে তাই করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

মিসেস হার্পার অত্যন্ত ভীত হলেন। কডি এ কী বলছে!

কডি তার বেবিসিটারের সাথেও খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করল। একদিন কডি একটা ছবি নিয়ে বসে ছিল। ছবিটি দেখতে চাইলেন মিসেস হার্পার। কডি তাতে বাধা দিল। ধস্তাধস্তিতে মিসেস হার্পার জয়ী হলেন। ছবিতে দেখলেন এক মহিলা বসে আছেন আর তাঁর কোলে এক ছোট্ট ছেলে—

'কে এই ছবিটি তোমাকে দিয়েছে?'

'ম্যান,' কডির উত্তর।

সেইদিন থেকে কডি খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল। মিস্টার হার্পার ও মিসেস হার্পার যেন তার সৎ বাবা-মা, এমন আচরণ শুরু করল। ম্যান তার সমস্ত মন-প্রাণ-চৈতন্য দখল করে ফেলল। ম্যান কি আসলে কোনও ভূত-প্রেত, নাকি পিশাচ?

একদিন বেবিসিটারের সাথে কডি এমন খারাপ ব্যবহার করে ফেলল যে, তিনি চলে গেলেন রাগ করে। মিসেস হার্পার পড়লেন ভয়ংকর সমস্যাতে। তিনি তো চাকরি করেন। তা হলে দিনের বেলা কডিকে কে দেখে রাখবে? তিনি কডিকে তাঁর বোনের বাসায় রেখে আসবার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর বোনের মেয়ের সাথে খেলা করে সময় কেটে যাবে

কডির। চমৎকার আইডিয়া! সেই মতো তিনি রেখে এলেন। বোনটিও খুশি হলেন। সেই খুশি দীর্ঘস্থায়ী হত, যদি ম্যান সেখানে না যেত।

কডিকে রেখে অফিসে গিয়ে কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে কল পেয়ে বোনের বাসায় চলে এলেন মিসেস হার্পার। বোন ঢুকতেও দিলেন না। কডিকে তুলে দিলেন মিসেস হার্পারের কাছে। যেন তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে পারলে খুব খুশি হন। বিদায় করবার আগে যা বললেন তা শুনে মিসেস হার্পারের মাথা ঘুরে গেল। বোন বললেন যে, তিনি তাঁর মেয়েকে কডির সাথে খেলতে দিয়ে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দুটি ছেলেকণ্ঠের কথোপকথন শুনতে পান। প্রথমেই তিনি ভাবলেন, কডি হয়তো তার গলার স্বর পরিবর্তন করে কথা বলছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি ছিল অস্বাভাবিক ভরাট। তাই সন্দেহ হল, হঠাৎ তাঁর মেয়ে ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল। আর তিনি ছুটে গেলেন। দরজা খুলে তিনি যা দেখলেন তা কোনোদিনই ভুলবেন না। দেখলেন কডি ও তার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সমস্ত খেলনা শূন্যে ভাসছে। এ কীভাবে সম্ভব? হঠাৎ সমস্ত খেলনা মাটিতে পড়ল।

মিসেস হার্পার বুঝলেন, এ সব ম্যানের কাজ।

বাড়িতে এনে কডিকে খুব বকলেন। তারপর এক বেবিসিটিং এজেন্সির কাছে কডিকে রেখে এলেন। সকালে কডি সেখানে থাকে, রাতে বাসায় ফেরে।

১৯৯৮ সালের শেষদিকের এক রাতে কডি ম্যানের সাহচর্য আর চাইল না। সে তার মায়ের কাছে ফিরে এল। মিসেস হার্পার বুঝলেন, এই তার পুরনো ছেলে—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। ম্যানের কাছ থেকে কডি পালিয়ে এসেছে! সে তার ছোট্ট মাথা মায়ের বুকে গুঁজে বলে—mome, help me! man is distrubing me, মিসেস হার্পার তাঁর ছেলেকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন। প্রভু অবশেষে সদয় হয়েছেন।

এবার মিসেস হার্পারের মনে জেদ ঢুকল। তিনি ম্যানকে দেখতে চান মুখোমুখি। সেই পিশাচকে দেখতে চান, যে তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এতদিন। সে কে? তার রূপ তিনি দেখবেনই।

ম্যানকে দেখতে ওই রাতেই কডির ঘরে গেলেন মিসেস হার্পার। কে জানত তিনি ম্যানের দেখা পাবেন? কডির ঘরে তিনি ঢুকলেন। বিছানায় শুলেন। আশপাশে নিস্তব্ধ। কডি কীভাবে অন্ধকারে থাকে? তাঁর নিজেরই তো ভয় লাগছে। হঠাৎ কার পদশব্দ শুনতে পারলেন তিনি। কে আসছে? দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ছোট্ট ছায়া, কে এটা? নিশ্চয়ই কডি! মিসেস হার্পার বললেন, 'কডি, এ দিকে এসো। ছায়াটি এগিয়ে এল। মিসেস হার্পার তাকে জড়িয়ে আদর করতে লাগলেন। তারপর যা ঘটল, তা অভাবনীয়। কডির পা বড় হতে লাগল এবং তাতে পুঁজযুক্ত গহ্বরের সৃষ্টি হল—বড় নখের উৎপত্তি ঘটল। মিসে হার্পার অনুভব করলেন, তাঁর বাহুতে দুটো শক্ত নখরযুক্ত হাত চেপে ধরে আছে, তিনি ভয়ে সামনের দিকে তাকালেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য। সেই পিশাচের মুখ এক

দানবের মতো। আগুনের ভাটার মতো জ্বলন্ত দুটি চোখ, শ্বেতী রোগীর মতো চামড়া আর তার ভ্যাম্পায়ারের মতো দুটো দাঁত। মিসেস হার্পারকে ধরে ঝাঁকাতে লাগল সে। আর হাসতে লাগল।

মিসেস হার্পার চিৎকার করে উঠলেন। এই তা হলে ম্যানের আসল রূপ? তাঁর চিৎকারে তাঁর স্বামী মেয়ে আর কডি ছুটে এল। লাইট জ্বেলে দিলেন মিস্টার হার্পার। কিছু তো নেই! মিসেস হার্পার কাস্ট্রে ফোবিয়া রোগীদের মতো কাঁপছেন।

'কী হয়েছে?' উদ্বিগ্ন স্বামীর প্রশ্ন করলেন।

'আমি দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

মিস্টার হার্পার, টেরি নিজ ঘরে ফিরে গেলেন, কডিকে কাছে ডেকে মিসেস হার্পার বললেন।

'আমি ম্যানকে দেখেছি।' মিসেস হার্পার বুঝতে পারলেন কেন আগের রিচুয়াল কাজে লাগেনি। আগের রিচুয়ালে পড়া হয়েছিল মৃতছেলের আত্মা তাড়ানোর মন্ত্র, এখন পড়তে হবে পিশাচ তাড়ানোর মন্ত্র!

মিসেস হার্পার পরদিনই সেই রেড ইন্ডিয়ান পাদরি সাথে যোগাযোগ করলেন, পাদরি সাথে আলাপ করলেন। তারপর যে-সময় সবাই বাড়ির বাইরে চলে গেল, তিনি অলিভঅয়েল দিয়ে বাড়ির সীমানা ঘিরে আটকে দিলেন। সেইসাথে মন্ত্র পড়লেন, উঠান, বাগানে জলপাই পাতা পুড়িয়ে সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন। বাড়ির বাইরের রিচুয়াল সমাপ্ত, পিশাচ আটকে গেছে ভিতরে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভিতরে তিনি ঠাণ্ডা অনুভব করলেন। আরম্ভ করলেন মন্ত্র পড়া। আশপাশে তাকালেন। এই বুঝি ম্যান আক্রমণ করবে। তিনি রিচুয়াল শুরু করলেন। বাড়ির মৃদু গুঞ্জন শুরু হল চতুর্দিক থেকে। তারপর তা গর্জনে পরিণত হল। আর তার সাথে বাড়ি কাঁপতে শুরু করল। মিসেস হার্পারের মনে হল পিশাচ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে। তিনি ভয় না পেয়ে দ্বিগুণ জোরে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন।

অবশেষে গুঞ্জন-গর্জন সবই বন্ধ হল। একটা দমকা বাতাস জানালা খুলে বের হয়ে গেল। মিসেস হার্পার বুঝলেন, পিশাচ চলে গেছে। ঘরে নেই কোনো গুমোট ভাব। এরপর থেকে আর কোনো শব্দ শোনা যায়নি বলে জানা গেছে। কোনো অশুভ শক্তি আর আতংঙ্ক ছড়ায় না মিসেস হার্পারের মনে।

[তথ্যসূত্র : The true hauntings of the last century অবলম্বনে]

রজত দাশ গুপ্ত
